শ্রেষ্ঠ গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

বাংলাদেশের কথাশিল্পী —

সেলিনা হোসেন

কল্যাণীয়াসু

সূচি

দক্ষিণের জানালা এবং কাটা মুণ্ডুর গল্প

কাল রাতে বছরের প্রথম কালবোশেখি হানা দিয়েছিল। কৃপাসিন্ধু গিয়েছিল বেণীপুরে একটা বিবাদ মেটাতে। ফেরার পথে হঠাৎ ঝড়। ঝড়ের মধ্যে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসার জেদ ও ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ঢুকতে হয়েছিল দুনিগ্রামের বাউরি পাড়ায়। একে তো ওই প্রাকৃতিক হুলুস্থুল, তার মধ্যে দোগাছিয়ার খেপুবাবুর আবির্ভাব। ঘনা, মনা, ভ্যাঁটা, ঘোঁতন এইসব নামের গতরজীবী মানুষগুলোর তাড়ির নেশা কেটে খেপুবাবুকে কোথায় জায়গা দেয়, সে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ডাকাডাকি, লণ্ঠন জ্বালা, ডাকাত পড়ার ব্যাপার। শেষে কৃপাসিন্ধু ঘনার দাওয়ায় জায়গা পায়। মোটর সাইকেলটা দাওয়ার নিচে ভিজতে থাকে এবং বিদ্যুতের ঝিলিকে মুহুর্মুহু ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তখন ঘনা বুদ্ধি করে একটা চট চাপিয়ে দেয়। ঘনার বাড়ির মেয়েরা ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য খেপুবাবুকে দেখছিল।

মাঝরাত নাগাদ ঝড়টা থেমে যায়। টিপটিপিয়ে তারপরও কিছুক্ষণ বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি থামলে আধখানা চাঁদ ঝলমলিয়ে ওঠে। কৃপাসিন্ধুর মোটর সাইকেলের চাকা স্লিপ করছিল। পিচের চাঙড় ছেড়ে জায়গায়-জায়গায় গর্ত। আব্দুল কণ্ট্রাক্টর এই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বানিয়ে দোতলা বাড়ি তুলেছে। কৃপাসিন্ধু বাকি রাস্তা আব্দুলের বাড়িটা লক্ষ্য করে একটা স্টিমরোলার চালিয়ে নিয়ে আসছিল।

সকালে নিজের হাতে মোটর সাইকেলটা সাফ করছিল কৃপাসিন্ধু। টিউবওয়েল থেকে বালতি করে জল এনে ঢালছিল। কাঠি দিয়ে মাডগার্ড খোঁচাচ্ছিল। বারান্দা থেকে বড়দি রেবা বকাবকি করছিলেন, এভাবে কেন তুই রিস্ক নিস বল তো খেপু? তোর অত শত্রু শুনি। কার কী মনে থাকে।

রেবা শহরের বধূ। ভাইয়ের বাড়ি এসেছেন বেড়াতে। বাবা-মা বেঁচে নেই। থাকলে কৃপাসিন্ধুর এত গোঁয়ার্তুমি সাজত না বলে তাঁর ধারণা। বলছিলেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কী মানে হয়, তুই আমাকে বল খেপু! আর এখন পরিবেশ যা হয়েছে শুনতে পাই, তোর জন্য সবসময় অস্থির

থাকি। রোজ নাকি খুনোখুনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তোকে কবে থেকে বলছি, জমিজমা সব বেচে চলে আয় আমার ওখানে। বিজনেস কর।

থামের কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছিলেন পিসিমা চারুবালা। সুযোগ পেয়ে বললেন, আমিও তো একই কথা পইপই করে বলি। ও মাসে সাত বিঘে জমির ধান দিনদুপুরে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। কী হলো শেষ পর্যন্ত? মগের মুলুক পড়েছে আজকাল।

রেবা বাঁকা হেসে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি বড়ো লিডার হয়েছিস! পারিসনি ধানগুলো উদ্ধার করতে? তবে তুই কিসের লিডার খেপু?

কাজ শেষ করে মোটর সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে ছিল কৃপাসিন্ধু। আজ সকালে পৃথিবীর ঝলমলানির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে তার বাহনটা। রোদে ঝকমক করছে দুর্ধর্ষ গোঁয়ার যৌবন।

বড়দির সামনে এখনও ভদ্রতা করে সিগারেট খায় না কৃপাসিন্ধু। হাল্কা পায়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল সে। তারপর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

দক্ষিণের জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে আছে তার স্ত্রী রত্না আর ছোট বোন ছায়া। কৃপাসিন্ধুর পায়ের শব্দে রত্না একবার ঘুরল। কিন্তু কিছু বলল না। যা দেখছিল, আবার দেখতে থাকল। কৃপাসিন্ধু সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী?

ছায়া আস্তে বলল, ওখানে কী যেন হয়েছে দাদা! একগাদা লোক ভিড় করে কী দেখছে?

কোথায় রে?

বুড়োতলার নালার ধারে।

ছেড়ে দে। বলেও কৃপাসিন্ধু ওদের মাঝখান দিয়ে একবার দেখতে গেল।

এই জানালা থেকে বুড়োতলার নালা পরিষ্কার দেখা যায়। কয়েক টুকরো সব্জিক্ষেতের পর আগাছাভরা খানিকটা পোড়ো জমির কোনায় ফণিমনসার ঝোপের ভেতর বুড়োবাবার থান। তার পেছনে গভীর ওই নালাটা আসলে গ্রামের জলনিকাশী খাল। তার আঁকাবাঁকা গতি নিচু মাঠ পেরিয়ে নদী পর্যন্ত। বর্ষায় বানের জল আটকাতে ক'বছর আগে নদীর মুখে স্লুইস গেট বসানো হয়েছে। নালাটা অবরে-সবরে সেচের জলও মাঠকে যোগায়।

কৃপাসিন্ধু বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রত্না চাপা গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দেখে আসি।

রত্না ওর পেছন পেছন আসছিল। বলল, সবতাতেই তোমার যাওয়া চাই।

মিছিমিছি—

রেবা বললেন, কী হয়েছে খেপু? অমন করে যাচ্ছিস কোথায়?

কৃপাসিন্ধু খিড়কির দরজা জোরে খুলে বেরিয়ে গেল। রত্না বলল, কোনো মানে হয়?

রেবা বললেন, হয়েছেটা কী বলবে তো?

বুড়োতলার ওখানে কী যেন হয়েছে। একগাদা লোক ভিড় করে দেখছে।

রেবা মুখ টিপে হাসলেন। বুঝেছি। এ আর নতুন কী? বরাবর যা হয়, তাই। এইজন্য তো বলি, পৃথিবীটা দেখতে দেখতে কত বদলে গেল, আর এই দোগাছিয়া যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল।

চারুবালা হাসতে হাসতে বললেন, তা ঠিক নয়। তুমি ছোটবেলায় যেমন দেখেছ, তেমনটি কি আছে? আহা, আমিও তো তোমার মতো এ বাড়ির মেয়ে। বুড়োতলায় বাঘের ডাক শুনেছি, তখন তুমি কোথায়? তখন এত দালানকোঠাও ছিল না। ইলেকট্রিসিটি ছিল না। বাজার ছিল না। হাট বসত সপ্তায় দুটো দিন। আর এখন দেখ, দু'বেলা হাট বসছে চৌমাথায়। এদিকে সারাক্ষণ রাস্তায় ভিড়—ট্রাক, বাস, টেম্পো, রিকশো।

রেবা চোখ কটমটিয়ে বললেন, সে কথা নয়। আমি কী বলতে চাইছি, আর আপনি কী বলছেন!

দমে গিয়ে চারুবালা বললেন, বলো খুকু, শুনি।

চাপা গলায় রেবা বললেন, আজকাল তো আইন হয়েছে রে বাবা! অ্যাবর্সান যদি করাবি, টাউনে মাতৃসদনে যা। নয় তো হাজারটা নার্সিং হোম হয়েছে—পয়সা থাকলে। এখনও বুড়োতলার নালা? রেবা হাসতে লাগলেন।

লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে চারুবালা বললেন, ও। তাই?

বুড়োতলার নালার ধারে গ্রামের আঁতুড়ঘরের আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে। চারদিকে কাঁটামাদার কেয়াঝোপ আর ফণিমনসার জঙ্গল। কখনো-সখনো সেখানে মৃতজাতক পুঁতে দিয়ে আসে গ্রামের ধাইমারা। কখনো-সখনো দেখা গেছে কুমারী মায়ের নাড়িছেঁড়া একটুকরো ভ্রূণও। কাঠ-কুড়ুনি মেয়েদের নজর এড়ানো কঠিন। গ্রামে রটতে দেরি হয় না। আর একদল মানুষও আছে, যারা তারিয়ে তারিয়ে নোংরা দেখতে পছন্দ করে। চলে এসে ভিড় করে দেখতে থাকে। পুরুষ হলে গোঁফের ওপর হাত, স্ত্রীলোক হলে নাকে আঁচল এবং বারবার মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলার ঢঙ। তারপর কিছুদিন ধরে গোপন

গোয়েন্দাগিরি। কুমারী এবং বিধবার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত। চারুবালারও এই বাতিক আছে। কিন্তু রেবা এখন বিয়ের পর থেকে দজ্জাল মেয়ে। কৃপাসিন্ধু অকুস্থলে চলে গেল কোন আক্কেলে? এক ফাঁকে চারুবালা রত্না বউমার ঘরে ঢুকে পড়লেন। তখনও ছায়া জানালায় উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চারুবালা ভাইঝিকে ঠেলে বললেন, কই, সর তো দেখি, কী হয়েছে।···

কৃপাসিন্ধু হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল।

বুড়োতলার ওই নালা সম্পর্কে একটা বিভীষিকাময় অবচেতনা আছে দোগাছিয়ার। আজকাল আর কেউ ভূতপ্রেত মানে না। তবু ভূতের ভয়টা ওই অবচেতনাগত একটা বোধ। রাতে কখনো দক্ষিণের জানালা খুলে কৃপাসিন্ধুর মনে হয়েছে, যদি সত্যি কিছু থাকে! তখন যদি তাকে একা যেতে বলা হয় বুড়োতলার দিকে, সে বন্দুক নিয়েও পা বাড়াতে পারবে না। দিনদুপুরেও ছমছমে নির্জনতায় কেমন যেন দুর্জ্ঞেয় প্রাণীতে পরিণত হয় জায়গাটা। কাঁটা-মাদারের গাছগুলো, কেয়া আর ফণিমনসার ঝোপগুলো রহস্যময় অসংখ্য চোখে যেন তাকিয়ে থাকে তার দিকে। নদীর দিক থেকে নিচু মাঠের ওপর দিয়ে হঠাৎ একটা বাতাস আসে ঘুরপাক খেতে খেতে বুড়োতলায় ঢুকলেই তার হুলস্থূল যায় বেড়ে। খড়কুটো, ন্যাকড়াকানি, হলদে পাতার পোশাক পরে অশরীরীর নাচন। ফণিমনসার কাঁটায় সাপের খোলস পত পত করে ওড়ে। আসলে গ্রামের বহু জন্ম-মৃত্যু, রক্ত ও গোপন কান্নাকাটি, অতৃপ্ত বাসনা-কামনা এবং আত্মার অমরতা নিয়ে এই একটা ভূগোল।

ছেলেবেলায় কৃপাসিন্ধু বর্ষার সময় ওই নালার জলে একটা কাতলা মাছ ধরেছিল। ধরেছিল বলা ঠিক নয়, মাছটা হঠাৎ তার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়েছিল। বানের জল ঢুকছে নাকি দেখতে এসে এই অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু মাছটা খাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। ছ্যা ছ্যা, ফেলে দিয়ে আয় এক্ষুনি, এই বলে হাত নেড়ে মায়ের সে কী চিক্কুর! বুড়োতলার নালার মাছ ভদ্রলোকে খায় না। আঁতুড়ের আবর্জনাধোয়া জল। তার ওপর কত অসতীর ঘৃণ্য শরীরস্রাব।

অথচ কৃপাসিন্ধু দেখেছে, ওই নালার কলমি আর শুসনি শাক তুলে নিয়ে যায় গ্রামের কুড়ুনি গরিবগুরবো মেয়েরা। শীতে পাঁক ঘেঁটে মাছ ধরে। স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জমাদার চাঁদঘড়ির শুওরের পাল নরম মাটি খুঁড়ে শেকড়বাকড় খোঁজে। এই বসন্তে নালার বুকে দূর্বাঘাসের চাবড়া। কন্টিকারি, কুকুরশুঁকো, হাতিশুঁড়ো.

এইসব কতরকম গুল্ম। বদ্যিবুড়ি ঝুরন মেঝেন জড়িবুঁটির খোঁজে কাটারি হাতে কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায় নালার ভেতর। কখনো কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে হাড়কুড়োনি কোনো ধাঙড়কন্যা উদাস চাউনিতে নালার বুকের দিকে চোখ রেখে হেঁটে যায়।

কাল রাতে বাড়ি ফিরে কৃপাসিন্ধু দক্ষিণের জানালার কাছে বসে সিগারেট টানছিল। একটু গরম পড়েছে। রাতের ঝড়ের পর দোগাছিয়া জুড়ে অন্ধকার ছিল। লোডশেডিং নয়। ঝড়ে কোথায় হয়তো বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে। খুঁটি উপড়েছে। প্রতি বছর এমনটা হয়।

জানালার পর্দা সরিয়ে যেন বিভীষিকাকেই খুঁজছিল কৃপাসিন্ধু। রত্না ততক্ষণে আবার ঘুমে কাঠ। ঝলমলে জ্যোৎস্নায় ভিজে নিসর্গ বুড়োতলার সীমানা অব্দি রহস্যময় হাতছানির মতো, এবং হঠাৎ ওদিকে এক ঝলক আলো দেখে চমকে উঠেছিল কৃপাসিন্ধু। পরে ভেবেছিল ভুল দেখল নাকি। বুড়োতলার ওখানে আলো দেখার গল্প সে শুনে আসছে ছোটবেলা থেকে। এই হয়তো প্রথম সে দেখতে পেল। জানালাটা তক্ষুনি বন্ধ করে দিয়েছিল সে। ঠিক ভয় নয়, একটা অস্বস্তি। যদি অশরীরী আত্মা বলে কিছু সত্যিই থাকে?

সকালে মোটর সাইকেল মুতে মুতে কথাটা মনে পড়ায় তার হাসি পাচ্ছিল। সে সাহসী ও জেদী মানুষ বলে এ তল্লাটে বিখ্যাত। রাতবিরেতে সে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পায় না। অথচ নিজের ঘরে ফিরে ওই দক্ষিণের জানালায় দাঁড়ালেই সে ভিতু গোবেচারা হয়ে যায়।···

কৃপাসিন্ধুকে দেখে ভিড়টা নড়েচড়ে গেল। খেপু, এস! বয়স্করা ডাকছিলেন। খেপুদা, দেখুন তো কী ব্যাপার! কমবয়সীরা চেঁচিয়ে উঠল। কৃপাসিন্ধু বলল, কী হয়েছে! এমন করে কী দেখছ সব?

হিনু কৃপাসিন্ধুর হাত ধরে নালার পাড়ে ওঠালো। বলল, দেখুন তো খেপুদা, ওটা কী?

রাখহরি চক্কোত্তি নাক কুঁচকে বললেন, আমি বলছি ওটা একটা কাটা মুণ্ডু। তবু খালি তক্ক।

কৃপাসিন্ধু বলল, কই?

বিনু লাফ দিয়ে নালায় নেমে গেল। তারপর জিনিসটার কাছে গিয়ে বলল, দেখছেন খেপুদা?

কৃপাসিন্ধু এতক্ষণে দেখতে পেল। কন্টিকারির ঝাড়ের ভেতর চাঁদঘড়ির

শুওরেরা বেপরোয়া খুর চালিয়ে মাটি উদোম করে দিয়েছে। কাত হয়ে গেছে কিছু কণ্টিকারি এবং উপড়েও গেছে কয়েকটা। তার মাঝখানে নরম কাদামাটিতে মাখামাখি কী একটা পড়ে আছে। একরাশ চুলের গোছার মতো জিনিসটা। খানিকটা রক্তও মেখে গেছে কালো কাদায়।

কৃপাসিন্ধু অবাক হলো, এতক্ষণ ধরে এই সন্দেহজনক জিনিসটা এতগুলো লোক মিলে দেখছে এবং জল্পনা করছে। অথচ পরীক্ষা করার জন্য কেউ হাত লাগায়নি। সে পাশের ঝোপ থেকে একটা ডাল ভাঙতে গেল।

তাই দেখে হিনু ঝটপট পায়ের কাছ থেকে একটুকরো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে নিল। নালার পাড় থেকে তার দাদা জগন চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাই হিনে! ছুঁবি না বলছি!

খেপুদার চেলা হিনু। খেপুদাকে দেখে সে এখন বেপরোয়া। কাঠটা দিয়ে জিনিসটা উল্টে দেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কাদার মধ্যে আটকে গেছে ওটা। জোরে চাপ দিতে দিতে সে বলল, প্রথম আমারই চোখে পড়েছিল, খেপুদা! একটা কুকুর মুখ ঢুকিয়ে টানাটানি করছিল দেখে—ইশ! এগুলো রক্ত না কী? উরে ব্বাস!

জিনিসটা উল্টে দিয়ে সে আঁতকে দু'পা পিছিয়ে গেল। রাখহরি চক্কোত্তি দম-আটকানো গলায় বলে উঠলেন, বলেছিলাম কাটা মুণ্ডু!

ডাল ভেঙে কৃপাসিন্ধু নালায় নামল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার বুকের ভেতর ঠাণ্ডা হিম একটা ঢিল গড়িয়ে গেল। জিনিসটা যে সত্যিই মানুষের মাথা, তাতে কোনো ভুল নেই। মুখের চামড়া আর মাংস কামড়ে খেয়ে ফেলেছে কোনো জানোয়ার—হয়তো হিনুর দেখা কুকুরটাই। চোখ আর নাকের জায়গায় লাল গর্তে থলথলে জেলির মতো কী মেখে আছে। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, হুঁ।

নালার পাড় থেকে একজন-দু'জন করে সরে যাচ্ছে এবার। ব্যাপারটা গোলমেলে এবং থানা-পুলিশের এক্তিয়ারে এসে গেল টের পেয়েই কেটে পড়ছে একে-একে। রাখহরি চক্কোত্তি দোনামনা করছিলেন। বললেন, কী মনে হচ্ছে খেপু? মেল, না ফিমেল?

হিনু বলল, ফিমেল নয়। মেল। চুল দেখে বুঝতে পারছেন না?

জগন বলল, খুব হয়েছে। উঠে আসবি তো এবার?

হিনু গ্রাহ্য করল না। কাঠটা ফেলে দিয়ে বলল, খেপুদা, খুব মিসট্রিয়াস

ব্যাপার, না ?

কৃপাসিন্ধু ভারি শ্বাস ছেড়ে বলল, হিনু ! তুই একবার থানায় যা না ভাই। আমি থাকছি। যাবার পথে পূর্ণ চৌকিদারকে বলে যাস।

হিনু চলে গেলে কৃপাসিন্ধু পাড়ে উঠে এল। কাঁটামাদারের গাছে দুটো কাক ওত পেতে বসে আছে। নালার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে সেই কুকুরটাই জিভ চাটছে। কৃপাসিন্ধু ডালটা তুলে কুকুরটাকে শাসিয়ে বলল, যাঃ ! ভাগ ! কুকুরটা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তখন দুটো উৎসাহী ছেলে ঢিল কুড়িয়ে তাড়া করতে গেল তাকে। কৃপাসিন্ধু সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকল।

চক্কোত্তি ছাড়া সব প্রবীণই কেটে পড়েছেন। জগনও রাগী মুখে চলে গেল। জনাকতক তরুণ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা একবার কাটা মুণ্ডুটার দিকে একবার কৃপাসিন্ধুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। চক্কোত্তি কৃপাসিন্ধুর কাছ ঘেঁষে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, কিছু বুঝলে খেপু ?

কৃপাসিন্ধু একটু হাসল। কী বুঝব ? যা বোঝবার, পুলিশ এসে বুঝুক।

না—মানে আমি বলছি কী, চেনা-টেনা মনে হয় কী না ?

কৃপাসিন্ধু আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, না।

চক্কোত্তি থুথু ফেলে বললেন, খুঁজলে বডিটা পাওয়া যাবে। হয়তো নালাতেই কোথাও পুঁতে রেখেছে। শুধু একটাই মিসট্রি, মুণ্ডুটা পুঁতল না কেন ? একেবারে টাটকা মুণ্ডু লক্ষ্য করেছ ? হয়তো কাল রাত্তিরেই—

কৃপাসিন্ধু চমকে উঠে তাকাল চক্কোত্তির দিকে। কাল রাতে এখানেই কি একঝলক টর্চের আলো দেখেছিল ?

চক্কোত্তি কষ্ট করে একটু হাসলেন।···দোগাছিয়ারই কেউ হবে। কী বলো খেপু ?

বুড়োতলার থানের পেছন থেকে আবার একটা ভিড় আসছে। সামনে পূর্ণ চৌকিদার নীল উর্দিপরা। মাথায় পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে আসছে এবং বগলে আটকানো লাঠি।

কৃপাসিন্ধু বুঝতে পারছিল, পুলিশ এসে গেলে এই বুড়োতলা জুড়ে তখন মানুষের হাট বসে যাবে। যারা কেটে পড়েছে, তারাও আবার আসবে। দোগাছিয়ায় খুনখারাপি আজকাল প্রায়ই হয়। বুড়োতলার নালায় কাটা মুণ্ডু পড়ে থাকার ব্যাপারটাও নতুন হতো না, যদি ওটা কাচ্চাবাচ্চার মুণ্ডু হতো।···

রাখহরি চক্কোত্তি বহুদর্শী বিচক্ষণ মানুষ। তাঁর অনুমানই ঠিক হলো। বুড়ো-তলার নালা যেখানে নিচু মাঠে শেষ বাঁক নিয়েছে, সেখানে এক বাজপড়া অশ্বত্থ। নালার বুকে আঁকড়ে ধরে আছে গাছটার শেকড়বাকড়। তার কাছে দূর্বাঘাসের চাবড়া বসানো ছিল, কন্টিকারির ঝোপসুদ্ধ। এ তল্লাটে শেয়ালবংশ অনেকদিন আগেই লুপ্ত। তা না হলে তারা ঠিকই টের পেত। বডিটা যে রাতের ঝড়বৃষ্টির আগে পোঁতা হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। এ বসন্তকালে বাজপড়া অশ্বত্থও কচি চিকণ পাতায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে ছিল। রাতের ঝড়টা হিংস্র হাতে যথেচ্ছ পাতা ছিঁড়ে তাকে ছন্নছাড়া করতে চেয়েছিল। দূর্বার চাবড়ার ওপর লালচে রঙের একরাশ পাতা পড়ে ছিল। বডিটা টুকরো-টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে পুঁতে রেখেছিল। শুধু বোঝা যায় না, মুণ্ডুটা অত দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলল কেন? বংকু দারোগা খি খি করে হেসে বলছিলেন, কাউবে প্রেজেন্টেশান দিতে লইয়া যাইতেছিল। শ্যাষে সাহস হয় নাই। ফেলিয়া পলাইয়া গেছে।

চক্কোত্তির মতে, তাও হতে পারে। বুড়োতলার থানের কাছে এসে ভয়টয় পেয়ে কাটা মুণ্ডুটা দমাস করে ফেলে পালিয়ে গেছে। জায়গাটা তো চিরকাল ভূতের বাথান। এমনও হতে পারে, যার মুণ্ডু সেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সারাটা দিন বাজারে, বারোয়ারিতলায়, ভানু ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে, রিকশোর স্ট্যাণ্ডে এই রহস্য নিয়ে আলোচনা চলেছে। রাখহরি চক্কোত্তি সবখানে একবার করে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন। প্রাইমারি স্কুলের অবসরভোগী শিক্ষক। দুই মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে দুর্গাপুর কারখানায় চাকরি পেয়েছে। চিঠি কিংবা মানি অর্ডারের আশায় ডাকঘরে সকালবেলা গিয়ে বসে থাকেন। তারপর প্রায় সারাটা দিন এবং রাত দশটা অব্দি এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরির নেশা। সবতাতে নাক-গলানে মানুষ।

দোগাছিয়ার কেউ নিপাত্তা হয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না এত শিগগির। কত লোক কাজেকর্মে নানা জায়গায় গেছে। কেউ গেছে আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে। কিন্তু ভেতর-ভেতর উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তিতে সেইসব বাড়ির লোকেরা অস্থির।

কৃপাসিন্ধু গুম হয়ে আছে। এদিন তার কোনো কাজে মন নেই। পঞ্চায়েত অফিসেও যায়নি। সেক্রেটারি কাদের আলি এসে কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়ে গেল। বিকেলে সদ্‌গোপপাড়ায় একটা বিবাদ ফয়সালার কথা ছিল। সেটা আগামীকাল হবে, বলে পাঠিয়েছে। আজ সারাক্ষণ কৃপাসিন্ধু দক্ষিণের জানালা

খুলে সেখানে চেয়ার পেতে বসে আছে। সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছে। দুপুরে ভালো করে খেতে পারেনি। খালি গা ঘিনঘিনে ভাব। বমি করতে পারলে বেঁচে যেত।

রত্না বড়ো ননদের সঙ্গে কাদের বাড়ি গেছে। রেবা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেই এরকম। কৃপাসিন্ধু জানে, বড়দি গ্রামের বাড়ি-বাড়ি নাগরিক জেল্লা দেখাতে যায়। বাড়িটা আজ ভীষণ স্তব্ধ যেন। চারুবালার সাড়া নেই। ছায়া হয়তো বি ডি ও-র কোয়ার্টারে আড্ডা দিতে গেছে। বি ডি ও-র বউ কৃপাসিন্ধুর দূর সম্পর্কের বোন, এটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘটনা। তারপব থেকে ছায়াকে আর আটকানো চলে না। নইলে বোনের চলাফেরা সম্পর্কে কৃপাসিন্ধুর কড়াকড়ি ছিল এতদিন।

বুড়োতলার নালার দিকটায় তাকিয়ে সিগারেট টানছিল কৃপাসিন্ধু। রাতের ঝড়বৃষ্টির পর সারাদিন ঝলমলে রোদ। বৃষ্টিধোয়া নিসর্গ খুব প্রাণবন্ত। তার ওপর ঝড়ের নখের আঁচড়ের মতো বিভীষিকার ছায়া কুটিকুটি আভাস ফুটে বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। রোদ যত ক্ষয়ে যাচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে ওই বিভীষিকার শরীর।

রোদ একেবারে মুছে গেলে কৃপাসিন্ধু জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর মনে পড়ল, বিদ্যুৎ নেই। ট্রান্সমিটারে নাকি বাজ পড়েছিল। বিদ্যুৎ আসতে এক সপ্তার ধাক্কা। পিসিমা, আলো! বলে কৃপাসিন্ধু আবার বসে পড়ল। শরীরের ভেতর থেকে ধস ছাড়ার মতো অনেককিছু ধসে গেছে যেন। মাথার ভেতরটাও শূন্য লাগছে।

চারুবালা চুপচাপ লণ্ঠন রেখে গেলেন। তারপর বারান্দার তাক থেকে শাঁখটা নিয়ে ফুঁ দিলেন। গোয়ালঘরের দিকে রাখাল ছেলেটার চিৎকার শোনা গেল, গিন্নিমা! আলো!

কৃপাসিন্ধু একটা কাটা মুণ্ডুর কথা ভাবছিল। আজ সকালেরটা নয়, অন্য একটা। ছেলেবেলায় দোগাছিয়া স্কুলের পেছনের মাঠে সেবার ম্যাজিকের তাঁবুর ভেতর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁবুটা ছিল ছোট্ট। ভেতরে কোনো স্টেজ ছিল না। কালো প্যান্ট কোট আর সাদা শার্ট-পরা ম্যাজিশিয়ান এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। শেষ খেলাটা ছিল কাটা মুণ্ডুর কথা বলা।

কোনায় একটা কাঠের টব। দুজন সহকারী কালো কাপড়ে পর্দার মতো ঘিরে রেখেছিল টবটা। পেছনে ম্যাজিশিয়ান দাঁড়িয়ে। সে অনর্গল কথা বলছিল কাটা মুণ্ডু সম্পর্কে। তারপর পর্দা সরিয়ে নিয়ে সহকারীরা চলে যেতেই কৃপাসিন্ধু

অবাক। টবের ওপর সত্যি একটা মুণ্ডু। গলার কাছে চাপচাপ রক্ত। অথচ মুণ্ডুটা জীবন্ত। মুচকি হাসি তার ঠোঁটে। মাঝে মাঝে ভুরু তুলে চোখদুটোও নাচাচ্ছে।

ম্যাজিশিয়ান একটা শাদা হাড় মুণ্ডুটার মাথায় ঠেকিয়ে বলল, এবার কাটা মুণ্ডু কথা বলবে! মা-সকল, বাবা-সকল, ভাইভগ্নী-সকল, খোকাখুকুরা! একবার জোরসে হাততালি দাও—জোরসে!

হাততালির পর ম্যাজিশিয়ান বলল, কাটা মুণ্ডু! তোর নাম কী?

কৃপাসিন্ধুর এখনও স্পষ্ট মনে আছে কাটা মুণ্ডুটাকে, অবিকল কানে ঢুকে আছে তার কণ্ঠস্বরও। কেমন গোঙিয়ে ওঠা, ঘড়ঘড়ে এবং নাকি তার কণ্ঠস্বর। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল কৃপাসিন্ধুর। কাটা মুণ্ডু বলল, ঘঁংঘায়াম!

ম্যাজিশিয়ান দাঁত কিড়মিড় করে বলল, স্পষ্ট করে বল কাটা মুণ্ডু! কী নাম তোর?

কাটা মুণ্ডু আবার বলল, ঘঁংঘায়াম।

ম্যাজিশিয়ান হাসতে হাসতে বলল, বুঝলেন কিছু? কাটা মুণ্ডু বলছে তার নাম গঙ্গারাম। তো ওরে বাবা গঙ্গারাম, তোর দেশ কোথায়?

কাটা মুণ্ডু বলল, কাঁটিহাঁড়!

ভয় পাওয়ার ভঙ্গী করে ম্যাজিশিয়ান দু'পা পিছিয়ে বলল, ওরে বাবা! কাটি হাড় বলছে নাকি? শুনছেন আপনারা? হাড় কাটার কথা বলছে। ও বাবা গঙ্গারাম, কলকাতায় হাড়কাটার গলি আছে শুনেছি। এ আবার কেমন হাড় কাটাকাটি বাবা? কার হাড় কাটবে মানিক?

তাঁবুর ভেতর হাসির হল্লা। শুধু কৃপাসিন্ধু কাঠ হয়ে তাকিয়ে ছিল।

কাটা মুণ্ডু গোঙানো কণ্ঠস্বরে বলল ফের, কাঁটিহাঁড়! কাঁটিহাঁড়!

ম্যাজিশিয়ান চেঁচিয়ে উঠল, উরে ব্বাস! কাটিহার বলছে গো! বুঝতে পারছেন তো আপনারা? বিহার মুলুকের সেই কাটিহার। তো বাবা কাটিহারের শ্রীমান গঙ্গারাম, তোমার মুণ্ডুটি কাটল কে?

কাটা মুণ্ডু বলল, ঘঁডেশ ভোঁস।

ম্যাজিশিয়ান একটু ঝুকে শোনার ভঙ্গী করছিল। চমকে ওঠার ভান করে সোজা হয়ে চাপা গলায় বলল, সর্বনাশ! কী নাম বলল যেন—

কাটা মুণ্ডু বেজার মুখে ফের উচ্চারণ করল, ঘঁড়েশ ভোঁস।

ম্যাজিশিয়ান চোখ বড়ো করে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, ওরে বাবা! এ যে

গণেশ বোস বলছে। গণেশ বোস যে আমারই নাম। আমায় ফাঁসিতে চড়তে হবে যে! এক্ষুনি পুলিশবাবুরা যদি জানতে পারেন, প্রোফেসর গণেশ বোস কাটিহারের গঙ্গারামের মুণ্ডু কেটেছে, তাহলেই হয়েছে। কাজেই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা করে কাটা মুণ্ডুটা লুকিয়ে ফেলা যাক।

সহকারীরা দৌড়ে এসে কালো কাপড়টা ঘিরে ধরল কাটা মুণ্ডুর চারপাশে। তারপর খেলা শেষ।

এই খেলাটা মাঝে মাঝে খেলত নিজের সঙ্গে কৃপাসিন্ধু। বুড়োতলার থানে নির্জনে দাঁড়িয়ে প্রোফেসর গণেশ বোসের গলায় বলত, কাটা মুণ্ডু, তোর নাম কী?

ঘঁংঘায়াম।

তোর দেশ কোথায়?

কাঁটিহাঁড়।

কে তোর মুণ্ডু কাটল?

কৃপাসিন্ধু মুচকি হেসে বলত, খেঁপু। তারপর হি হি করে এমন হাসত সে হাফপেন্টুল খুলে যেত বোতাম ছিঁড়ে। নিজের ডাকনাম খেপুটা সে অবোধ বয়স থেকে শোনার ফলে সহজভাবেই নিয়েছিল। এ বয়সেও কেউ তাকে কৃপাসিন্ধু বলে ডাকলে অচেনা লাগে। খেপু আর কৃপাসিন্ধুকে সে কিছুতেই মেলাতে পারে না।···

সর্বাণী খিড়কির ঘাটের ধারে ঘাসের ওপর নকশাকাটা একটুকরো চটের আসন বিছিয়ে বই পড়ছিল। বিকেলবেলাটাতে এইটুকুই তার বিলাস। এটাকে পুকুর বলতে ইচ্ছে করে না, আয়তনে নেহাত ডোবাই। কিন্তু পুকুরের সব লক্ষণ এই জলটুকুর আছে। মধ্যিখানে একঝাঁক লাল শালুক আছে। কিছু সবুজ পানারিপাতা সাজানো আছে এখানে-ওখানে সরু সরু শাদা ফুলের ফুটকি নিয়ে। ওপারে কোনার দিকে একদঙ্গল কলমি শাক শরতে বেগুনি ছোপ লাগা সাদা ফুল দিতে শুরু করেছিল। এখন বসন্তেও কিছু টিকে আছে। বীরেশ্বরের হামলায় মাঝে মাঝে ফর্দাফাঁই হয়ে যায় কলমিলতার সৌন্দর্য। শাক খেতে খুব ভালবাসে সে। মাঝে মাঝে বলে, খানিকটা শুসনি শাকের লতা এনে ফেলে দেব। সর্বাণী শাসায়, বুড়োতলার নালা থেকে তো? এনেই দেখো না, কী করি। সর্বাণী দোগাছিয়ারই মেয়ে। সে বুড়োতলার নালার অনেক রহস্য জানে।

প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার বীরেশ্বরের পৈতৃক সম্পত্তি বলতে এই মাটির বাড়িটা আর পেছনের জলাটুকু। সর্বাণীর তাগিদে তিন পাড়ে কাঁটাবেড়ায় ঘিরে সামান্য এক সব্জিক্ষেত আর কিছু ফুলগাছ হয়েছে। এদিকটার ঘাটের পাশে কলাগাছ মাথা তুলেছে। এই প্রথম মোচা এসেছে একটাতে। সর্বাণী বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মুখ তুলে মোচাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। রোদ মুছে এলে সে বই রেখে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সব্জিক্ষেত আর ফুলগাছে জল দিতে যায়। বীরেশ্বর টিনের ঝারি এনে দিয়েছে শহর থেকে। কোনো কোনোদিন কুনাইপাড়া বাউরিপাড়া হাড়িপাড়ার মেয়েরা কেউ কেউ দরখাস্ত লেখাতে আসে। বীরেশ্বরকে না পেলে সর্বাণী আছে। সর্বাণীর হাত থেকে জলের ঝারিটা কেড়ে নেয়। ভদ্রলোকের মেয়ের কি এই কাজ বাবুদিদি? আমনি দরখাস্ত নেকুন, আমি জল দিচ্চি আমনার বাগানে।

সর্বাণী তাদের মুখে তার প্রিয় বাগানটুকুর প্রশংসা শুনতে চায়। গাছপালা ফুলফল আর মাটির রহস্য হয়তো তার চেয়ে ওরাই বেশি জানে। বেগুনে পোকা লাগলে কী করতে হয়, তারাই তাকে বাতলে দিয়ে যায়। কোনার দিকে কালোর বউ একটা কাকতাড়ুয়া বানিয়ে দিয়ে গেছে। বীরেশ্বরের ছেঁড়া পাঞ্জাবি সেটার গায়ে। মাথাটা একটা কেলে হাঁড়ির, তাতে চুন দিয়ে চোখমুখ আঁকা। কালোর বউ মুখে আঁচল চেপে হাসি ঢেকে বলেছিল, থাকো তুমি সাক্ষাৎ মাস্টের মশাইটি হয়ে। সর্বাণীও হেসে অস্থির। বীরেশ্বর বাড়ি ফিরলে বলেছিল, দেখ গে তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি বাগানে। শুনে বীরেশ্বর দেখতে গিয়েছিল টর্চ নিয়ে।

কাল রাতের ঝড়ে কাকতাড়ুয়াটা পড়ে গিয়েছিল। সকালে আবার খাড়া করে দিয়েছে সর্বাণী। কাল রাতের ঝড়টা যা সাংঘাতিক গেছে, সর্বাণী খুব ভয় পেয়েছিল। পুজোর সময় চালের খড় ফেলে বীরেশ্বর টালি চাপিয়েছে। টালির চালের ওপর পেছনের নিমগাছের ডাল আছড়ে পড়ছিল। আর কী সব অদ্ভুত ভাঙচুরের শব্দ। এমন রাতে আবার হারুর মায়ের জ্বর। শুতে আসেনি সর্বাণীর কাছে।

সকালে উঠোন জুড়ে খড়কুটো ছেঁড়াপাতা ডালপালা পাখির বাসা—সে এক আবর্জনা। সাফ করতে ক্লান্তির একশেষ। দুপুরটা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে সর্বাণী। তারপর কুকার জ্বেলে চা করে বই আর চটের আসন হাতে ঘাটে এসেছে। এদিকটায় তার মন পড়ে থাকে।
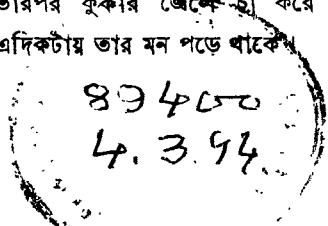
ডোবার জল থেকে রোদ মুছে আসছিল। জলমাকড়সাগুলো তর তর করে অসম্ভব গতিতে জলের ওপর ছুটে বেড়াচ্ছিল। দিনশেষের এই সময়টাতে কেমন ঘোর-ধরা আচ্ছন্ন একটা ভাব এসে যায়। বইয়ের পাতায় মন বসে না আর। কোথায় বাছুরের গলায় ঘণ্টা বাজে। গাইগোরু হাম্বা করে ডেকে ওঠে। কেউ তই তই বলে হাঁসগুলোকে ডাকতে থাকে বেনেদীঘির জলে—এত দূর থেকেও কানে ভেসে আসে। মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যায়। মাঝে মাঝে পিচ রাস্তার দিকে মোটরগাড়ির হর্নের শব্দ। তারপর চাপা গরগর গর্জন মিলিয়ে যায় ক্রমশ। আকাশে শেষবেলায় একটা প্লেন। সর্বাণী প্লেন দেখতে দেখতে সিংহবাহিনীর মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজল।

বাইরে কেউ কড়া নেড়ে ডাকছিল। সর্বাণী আসন গুটিয়ে উঠে পড়ল। বীরেশ্বরের গলা নয়। তার ফেরার কথা আগামীকাল অথবা পরশু। আজ আর বাগানে জল দেবার দরকার নেই। রাতের বৃষ্টিটা যথেষ্টই। সর্বাণী বারান্দায় আসন আর বইটা রেখে দরজা খুলতে গেল।

রাখহরি চক্কোত্তি ঢুকেই চাপা স্বরে বললেন, বীরু ফেরেনি?

সর্বাণী একটু অবাক হয়ে বলল, না। ওদের তো আজ অব্দি কনফারেন্স। তারপর ডেপুটেশনে যাবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। কেন জ্যাঠামশাই?

এমনি। চক্কোত্তি হাসলেন।

আপনি বসুন জ্যাঠামশাই!

সর্বাণী সেই আসনটা বারান্দায় পেতে দিলে চক্কোত্তি পা ঝুলিয়ে বসলেন। বইটা একবার পাতা উল্টিয়ে দেখে রেখে দিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, আজ সারাটা দিন মনটা খুব অস্থির, সাবি! বুড়োতলার নালায়—

সর্বাণী দ্রুত বলল, ও হ্যাঁ। মোনা বলছিল, ডেডবডি পেয়েছে একটা। কার জ্যাঠামশাই?

সেটাই তো রহস্য। চক্কোত্তি গলার ভেতর বললেন। বললাম না মনে শান্তি নেই সারাটা দিন?

চেনা যাচ্ছে না?

না। চক্কোত্তি একটা হাত কাটারির কোপ মারার ভঙ্গীতে নেড়ে বললেন। পিস বাই পিস কেটেছে।

কিন্তু কাপড়চোপড় জ্যাঠামশাই? কাপড় নেই পরনে?

উঁহু। নেকেড করে কেটেছে। চক্কোত্তি করুণ হাসলেন। কী বর্বর রসিকতা

দেখ সাবি, মুণ্ডুটা কেটে অন্য জায়গায় ফেলে পালিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, কাউকে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে ফেলে পালিয়েছে।

সর্বাণী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, দেখছ, মোনা আমাকে এসব কিচ্ছু বলেনি। আচ্ছা জ্যাঠামশাই, কাটা মাথাটা দেখে মুখটা তো চেনা যাবে? তাই না?

চক্কোত্তি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, যাবে কী করে আর? কুকুরে খুবলে সব খেয়ে ফেলেছে। রায়েদের হিনু সকালে ওখানে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায়।

সর্বাণী চুপ করে রইল। একটু পরে চক্কোত্তি বললেন, পুলিশের যা কাজ! কাটা মুণ্ডু আর বডি টাউনের মর্গে চালান করে দিয়েছে। কালকের দিনটা নাকি রেখে দেবে। কেউ শনাক্ত যদি করে, করবে। তবে আমার ধারণা, শনাক্ত দুঃসাধ্য।

সর্বাণী আস্তে বলল, আপনি দেখেছেন?

দেখেছেন কী বলছ? আগাগোড়া আমিই তো গাইড করে—চক্কোত্তি আবার শ্বাস ছেড়ে থেমে গেলেন। পা দুটো নাচাতে থাকলেন।

সর্বাণী বলল, আপনি একটু বসুন জ্যাঠামশাই। চা করি।

সে লণ্ঠন জেলে বারান্দায় একটু তফাতে রাখল। তারপর রান্নাঘরে চা করতে গেল। চক্কোত্তিকে চা খাওয়ানোর মানে হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ মানুষের সঙ্গ হঠাৎ প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সর্বাণীর। কুকার জ্বালানোর সময় তার হাত কাঁপছিল। বীরেশ্বর কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলনে গেছে। আগামী-কাল বা পরশু বিকেলের মধ্যে তার ফেরার কথা। তাছাড়া সে তো একা যায়-নি। এলাকা থেকে একদল প্রতিনিধি নিয়ে গেছে। সর্বাণী টের পাচ্ছিল, তবু খুব ভেতরদিক থেকে একটা উদ্বেগ যেন আঙুল বাড়িয়ে দিচ্ছে—হয়তো চক্কোত্তিজ্যাঠার এমন করে এসে বীরেশ্বরের কথা জিগ্যেস করাটাই কাল হয়েছে। আগুনের নীল শিখা দপদপ করছে। বুকের ভেতরও ওই রকম একটা শব্দ। বীরেশ্বরের এখানে অনেক শত্রু। দোগাছিয়ায় সে ক্রমশ কোণঠাসা এবং একঘরে হয়ে পড়ছে। গত শীতে ক্ষেতমজুর সমিতি করে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। তা ছাড়া ভাগচাষীদের কৃষক সমিতি মাঠ থেকে ধান তুলে বারোয়ারি খামারে উঠিয়েছিল। পুলিশ যায়নি। কিন্তু সর্বাণী জানে, বীরেশ্বরই এর পেছনে ছিল। তার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, নিজের জমি নেই বলেই কি বীরেশ্বরের এত রাগ জমিওলা মানুষদের ওপর? বীরেশ্বরকে কিছু বলতে গেলেই বলে, তুমি তো জানো আমি

কী। তুমি কি জানো না ইচ্ছে করে আগুনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে এসেছ? সর্বাণী ওর বলার ভঙ্গি দেখে শেষে হেসে ফেলে। থাক, আর নিজের সম্পর্কে বড়াই করতে হবে না। সর্বাণী একথা মুখে বললেও ভালোই জানে, বীরেশ্বর সত্যিই একটা আগুন। আগুন বলেই তো রাতারাতি তার ঘর করতে আসার সাহস পেয়েছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে চক্কোত্তি বললেন, বীরুর জন্য ভাবনা হয়। খামোকা লোকের সঙ্গে ঝামেলা করে বেড়ায়। যাদের জন্য এসব করে বেড়াচ্ছে, তারা কি ওকে দুঃসময়ে দেখতে আসবে ভাবছ? দোগাছিয়ার লোককে এখনো চেনেনি ও। যে পাতে বসে খাবে, সেই পাতে বসেই উল্টে চোখ রাঙাবে।

সর্বাণীর মনে হলো স্বামীকে সমর্থন করা উচিত। একটু হেসে বলল, সময়টা এখন বদলে গেছে না জ্যাঠামশাই? নিজেদের স্বার্থ সবাই বুঝে নিতে শিখে গেছে। চোখ রাঙানোর কথা বলছেন—আমার মনে হয়, লোকে জানে কে সত্যিকার বন্ধু আর কে সত্যিকার শত্রু।

চক্কোত্তি চুপচাপ চা খেতে থাকলেন। মাখন কোবরেজ ছিলেন তাঁর ছোটবেলা থেকে বন্ধু। তার মেয়ের সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি হয় না। কোবরেজের মৃত্যুর পর অসহায় বিধবা আর এই মেয়ের দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। সর্বাণী কায়েতের ছেলেকে রাতারাতি বিয়ে করে বসেছিল, সেই দুঃখে আর লজ্জায় বিধবা পুলিয়ানে ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন তো গেলেন, আর খবর নেই। এদিকে মেয়েরও এমন শক্ত প্রাণ, ভুলেও মায়ের নাম মুখে আনে না। অবশ্য রতনে রতন চেনে বলে কথা আছে। যেমন গৌরগোবিন্দ বীরেশ্বর, তেমনি—তা কেন, তারও এককাঠি সরেস এই মেয়ে। গ্রামের এক টেরে এই নিরিবিলি জায়গায় একা দিব্যি থাকতে পারে। বীরেশ্বরেরও এতে কোনো মাথা-ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। যেইসান কে তেইসান। চক্কোত্তির নাকের ডগা বেঁকে গেল।

মজার কথা, খেপুই বিয়ে করতে চেয়েছিল সাবিকে। খেপুর সঙ্গে বিয়ে হলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত মেয়েটা। তার মাকেও লজ্জায় পড়ে পালাতে হতো না পরান্নের প্রত্যাশী হয়ে। খেপুও তেজি ছেলে—বীরুর জুটি বললেও চলে। কিন্তু তত বেশি গোঁয়ার নয়। বোঝালে বোঝে এবং স্বভাবে অত্যন্ত ভদ্র। চক্কোত্তি দুজনকেই প্রাইমারিতে পড়িয়েছেন। পড়া না পারলে দুজনের মাথায় ঢুঁ লাগিয়ে দিয়েছেন।

তারপরেও তো ওদের মধ্যে ভাব ছিল দেখেছেন। খেপু কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিল। জোতজমিওলা বাড়ির ছেলে। পড়াশোনায় তত মন ছিল না। বীরুকে বাধ্য হয়ে মন দিতে হয়েছিল। বি এ পাশ করে মাস্টারিটা জুটিয়ে বি টি-ও পড়ে নিয়েছে। শেষে পলিটিক্স ওকে খেল। খেপুর যা সাজে, বীরুর কি সাজে?

চক্কোত্তি তেতোমুখ করে বললেন, উঠি সাবি।

সর্বাণী দরজা অব্দি এগিয়ে দিতে গেল দরজা বন্ধ করার জন্য। নইলে তার শরীরটার কেমন হঠাৎ ধসছাড়া অবস্থা। চক্কোত্তিজ্যাঠা এমন করে এসে বীরেশ্বরের কথা জিগ্যেস করলেন!

আজ বাড়িটাও খুব নির্জন আর স্তব্ধ লাগছে সর্বাণীর। আজও কি মাঝরাতে আবার ঝড় আসবে? কালবোশেখির ঝড়ের যেন সেটাই নিয়ম। একবার এলে পর-পর কয়েকটা দিন একই সময়ে আসে।

কিন্তু এখন আকাশভরা তারা। বিশ্বাস হয় না আবার ঝড় আসবে।···

সকালে কৃপাসিন্ধু বেরুবে ভাবছিল। বিলেপাড়ার কাছে নদীর বাঁধে আজ মাটি পড়বে। অনেক হাঁটাহাঁটির পর মেরামতের টাকা মঞ্জুর হয়েছে জেলা পরিষদ থেকে। বারান্দায় মোটর সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, আলপথে গাড়ি চালিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

ঘরে কাপড় বদলাতে ঢুকলে রত্না বলল, কোথায় বেরুচ্ছ শুনি?

একটু চটে গেল কৃপাসিন্ধু।···তোমার কী হয়েছে কাল থেকে। আঁচলের আড়ালে পিদিম করবে নাকি?

মুখের ভাষা শোনো!

জানই তো চাষাড়ে মানুষ। কাদামাটি ঘেঁটে বেড়াই! কৃপাসিন্ধু লুঙি ছেড়ে প্যান্ট পায়ে ঢোকাল। তারপর শার্টটা টেনে নিয়ে ফের বলল, তোমার এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন বুঝতে পারছি না কিন্তু।

রত্না আস্তে বলল, চিত্তচাঞ্চল্য তো তোমারই দেখছি। পরশু অত রাতে ঝড়ের পর ফিরে এলে কোত্থেকে। সারারাত ওই জানালার ধারে বসে কাটালে। কাল সারাটা দিন—তারপর এ রাতেও যতবার ঘুম ভেঙেছে, দেখি ওখানে বসে আছ জানালা খুলে। খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছ। কেন?

কৃপাসিন্ধু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, খুনখারাপি দেখে মন খারাপ।

তুমি দেখলে—

থামো! খুনখারাপি কখনও দেখনি? আমি সব জানি।

কী জানো তুমি? কৃপাসিন্ধু বেল্ট আঁটতে আঁটতে গলার ভেতর বলল।

রত্না ঠোঁট কামড়ে কথা খুঁজছিল। একটু পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ঝড়ের রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

কৃপাসিন্ধু অবাক হয়ে তাকাল।...কেন—বেণীপুরে।

কক্ষনো না। রত্না হিসহিস করে উঠল।...তুমি ওই মেয়েটার কাছে ছিলে।

মেয়েটা? কোন মেয়েটা বলো তো?

বীরুবাবুর বউয়ের ওখানে ছিলে তুমি! রত্নার গলা কাঁপছিল। বীরুবাবু নেই—আমি খবর নিয়েছি। তুমি আবার ওখানে নাক গলাচ্ছ, তাও জেনেছি।

রত্না কেঁদে ফেলল। কৃপাসিন্ধু অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হাসতে লাগল। আশ্চর্য তোমার ইমাজিনেশান, মাইরি! একটা কথা বলি শোনো—খেপু এঁটোকাটা খায় না কারুর।

কৃপাসিন্ধু জোরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মোটর সাইকেলটাও তেমনি জোরে উঠোনে নামিয়ে নিয়ে গেল। উঠোনেই স্টার্ট দিল। সদর দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবার সময় বাড়িটাকে প্রচণ্ড কাঁপিয়ে দিয়ে গেল সে।

পূর্ণ চৌকিদার আসছিল পিচ রাস্তা থেকে। সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে কৃপাসিন্ধু মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, কী রে পূর্ণ?

আজ্ঞে, বড়োবাবু জরুরি তলব দিয়েছেন।

কী ব্যাপার?

আজ্ঞে, কেলেঙ্কারি। পূর্ণ করুণ মুখ করে বলল। স্লুইসগেটের কাছে রক্ত-মাখা জামাকাপড় পাওয়া গেছে। দুটো স্যাণ্ডেল জুতোসুদ্ধু। আমনি একটু চলুন স্যার।...

থানার বারান্দায় বড়োবাবু বঙ্কুবিহারী নন্দী বসে ছিলেন। প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর কাগজের মোড়কে রক্তমাখা কাপড় আর স্যাণ্ডেল। খুলে বললেন, দ্যাহেন কাণ্ডটা।

কৃপাসিন্ধু দেখতে দেখতে বলল, ধুতি পাঞ্জাবি মনে হচ্ছে।

হঃ। বঙ্কুবাবু বললেন। মার্ডার হইছে স্লুইসগ্যাটের ওহানে। বডিটারে কাটছে। কাটিয়া একখানে পুঁতছে। আর হ্যাডটারে লইয়া—

কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, কার?

মেজবাবু সত্যচরণ পাণ্ডে বললেন, বীরেশ্বরবাবুর।

কৃপাসিন্ধু নিষ্পলক চোখে তাকাল। বলল, বীরুর! কিন্তু সে তো শুনেছি কলকাতায় আছে। কনফারেন্স না কী হচ্ছে ওদের। কৃপাসিন্ধু শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, কে আইডেন্টিফাই করল?

বঙ্কুবাবু বললেন, ওনার ওয়াইফ।

পাণ্ডেবাবু বললেন, রূপপুরের এক টিচার ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন বীরেশ্বর-বাবুর সঙ্গে। উনিই আজ ভোরের বাসে ফিরে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। বীরেশ্বরবাবু নাকি কনফারেন্সে ঝগড়া করে গত পরশু দুপুরে চলে এসেছেন।

কৃপাসিন্ধু গলার ভেতর বলল, হুঁ।

পাণ্ডেবাবু বললেন, মেয়েদের একটা ইনটুইশান থাকে, বুঝলেন না? তাছাড়া দিস ওয়াজ কোয়াইট এক্সপেক্টেড—যা শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক।

বঙ্কুবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, দুপুর মানে ধরেন, এসপ্ল্যানেডে বাস ছাড়ছে দুইটার পরে। ও বাসে আমি আইলাম না? দোগাছিয়া আইতে রাইত নয়টা-টয়টা। অত দেরি হওনের কথা না। হক্কল পথ খালি প্যাসেঞ্জার ওঠায়, খালি প্যাসেঞ্জার ওঠায়। বাপ রে বাপ! য্যান ছ্যাকড়া গাড়ি।

কৃপাসিন্ধু বলল, বাস থেকে বীরুকে নিশ্চয় কেউ নামতে দেখেছিল?

পাণ্ডেবাবু বললেন, ইনভেস্টিগেশানে জানা যাবে।

বঙ্কুবাবু বললেন, আপনারে ডাকছিলাম, কীভাবে কী করন যায়। আপনি হইলেন গা এরিয়ার লিডার। আপনারে না জিগাইয়া কিছু করুম না। খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন বড়োবাবু। এরকম হাসি হাসতে না জানলেই বিপদ।

যা ভালো বোঝেন, করুন। কৃপাসিন্ধু উঠে দাঁড়াল। খুনীরা ধরা পড়ুক, সেটাই আমি চাইব। তবে একটা অনুরোধ বড়োবাবু, প্লিজ যেন নির্দোষ লোককে কষ্ট দেবেন না।

কৃপাসিন্ধু মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় গেল। একটু থামল। তারপর সোজা বাজার পেরিয়ে গিয়ে ডাইনে আগাছাভরা জমিটার ওপর সংকীর্ণ পায়ে চলা রাস্তায় এগিয়ে গেল। কে তাকে দেখছে বা দেখছে না, গ্রাহ্য করছিল না সে। বুড়োতলার নালার সেই পুরনো বিভীষিকা তার পেছনে। আসলে পালিয়ে কোথাও যেন লুকোতেই চাইছিল কৃপাসিন্ধু।

কিন্তু বীরেশ্বরের বাড়ির দরজায় তালা দেখে সে মোটর সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দিল।...

চক্কোত্তি দুবার এসেছিলেন। তৃতীয়বার এলেন সন্ধ্যার মুখে। রেবা চড়া গলায় দোগাছিয়ার মুণ্ডুপাত করছিলেন। তর্কটা ছায়ার সঙ্গে। ছায়া বলে ফেলেছিল, তোমাদের টাউনেও কি কম! সন্ধ্যায় মেয়েরা বেরুতে পারে না—তার বেলা? চক্কোত্তি আসায় ছায়া বেঁচে গেল। রেবা পড়লেন পিসিমাকে নিয়ে। চারুবালা বিব্রতমুখে বললেন, আহা, আমি কি তাই বলছি খুকু?

চক্কোত্তি বললেন, খেপু ফিরেছে নাকি? তারপর মোটর সাইকেলটা দেখতে পেয়ে ডাকলেন, অ খেপু!

রত্না বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে মৃদু স্বরে বলল, শরীর খারাপ। শুয়ে আছেন।

চক্কোত্তির গতিবিধি সর্বত্র অবাধ। চটি ফটফটিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন ডাকতে ডাকতে। কৃপাসিন্ধু খাটে শুয়ে ছিল। উঠে বসে বিরক্তি চেপে বলল, আসুন জ্যাঠামশাই। তারপর লণ্ঠনের দম তুলে আলো বাড়িয়ে দিল। ফের বলল, বসুন।

চক্কোত্তি দক্ষিণের জানালার ধারে চেয়ার দেখে বসতে গেলেন। বললেন, অ। তোমার এখান থেকে বুড়োতলা অব্দি নজর হয় দেখছি।

চক্কোত্তি বসলে কৃপাসিন্ধু বলল, বলুন।

আমি জানতাম। চক্কোত্তি শ্বাসের মধ্যে বললেন। জানতাম কাটা মুণ্ডুটা বীরুরই হবে।

কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, কিছু দেখেছিলেন নাকি?

চক্কোত্তি একটু হাসলেন।...আজ শুক্কুরবার। গত বুধবার রাত তখন নটা-টটা হবে, গোপালের চায়ের দোকানে বসে আছি। কলকাতার বাসটা এসে একটু থেমেই চলে গেল। ওখানটাতে অন্ধকার ছিল। কে একজন নেমেছিল। হনহন করে চলে গেল। মনে হলো, বীরু। গোপাল বলল, বীরু কেন হবে? তার ফেরার কথা শুক্কুরবার।

গোপাল বলল!

গোপাল বলল। চক্কোত্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে বললেন।...গোপালই গণ্ডগোলে ফেলে দিয়েছিল আমাকে। নইলে আমি বীরুকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। ধাঁধাটা কাটছিল না তবু। আসলে গোপালই—

কৃপাসিন্ধু গলার ভেতর বলল, হুঁ।

চক্কোত্তি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, তোমার সাত বিঘে, তারকের দশ বিঘে, আব্দুল ঠিকেদারের তিন বিঘে, হলধরের পাঁচ বিঘে—আরো যেন কার-কার জমির ধান জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বর্গাদাররা বারোয়ারিতলায় খামার করেছিল। বীরুই এসব করিয়েছিল। পুলিশ মজা দেখছিল দূরে দাঁড়িয়ে।

কৃপাসিন্ধু চাপা ও রুক্ষ স্বরে বলল, কী আজেবাজে বলছেন।

চক্কোত্তি একই স্বরে বললেন, বর্গা-রেকর্ডের বছরও বীরু নিজে মাঠে মাঠে ঘুরে জে এল আর ও-র সঙ্গে—

আপনি থামুন তো।

চক্কোত্তি অনড়-অটল থেকে বললেন, বুধবার রাতে গোপালের ওখানে আরো ক'জন বসে ছিল। আমি বীরুর নাম করার পরই তারা উঠে গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি, বীরুর পেছনে সবসময় ওত পেতে বেড়াচ্ছিল খুনীরা। তবে দোষ আমারই খেপু। কেন আমার পোড়া মুখে বীরুর নামটা বেরিয়ে গেল তখন—আমি তো স্পষ্ট করে তাকে চিনতে পারিনি? আমি 'বীরু না কি' না বললে ওরা ছুটে যেত না। ওকে কিডন্যাপ্‌ড্‌ করে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে—ঢোক গিলে থেমে গেলেন চক্কোত্তি।

কৃপাসিন্ধু চক্কোত্তির সামনেই সিগারেট খায়। পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন, তবু। কাঁপা কাঁপা হাতে বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করছিল সে। সিগারেট জ্বেলে দেখল, চক্কোত্তি চোখ মুছছেন। সে ধোঁয়ার মধ্যে বলল, চা খান জ্যাঠামশাই।

ইচ্ছে করছে না বাবা। ভাঙা গলায় রাখহরি চক্কোত্তি বললেন। যতবার ভাবছি, বীরুর মাথাটা কোথায় নিয়ে আসছিল ওরা, ততবার খালি মনে হচ্ছে, মাখনের হতভাগী মেয়েটা কি সইতে পারত? যত গোঁয়ার হোক, মেয়েছেলের মন বাবা খেপু, বড়ো কোমল।

কৃপাসিন্ধু সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে নালায় ফেলল কেন মাথাটা?

ভয়ে। বীরুর আত্মা এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। বলে চক্কোত্তি উঠলেন। আরো কিছু বলবেন ভাবলেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ঘুরলেন হঠাৎ। বললেন, সাবির জন্য যত কষ্ট নইলে—

চক্কোত্তি পর্দা তুলে বেরিয়ে গেলে কৃপাসিন্ধু আপনমনে বলল, কষ্ট তো সে

যেচে নিয়েছিল।…

অনেক রাতে, রত্না ঘুম ভেঙে টের পেল কৃপাসিন্ধু বিছানায় নেই। তারপর দেখল দক্ষিণের জানালা খোলা। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার একটা ফিকে হলুদ ফালি বুকে নিয়ে বসে আছে কৃপাসিন্ধু। রত্না কিছু বলল না। অন্যপাশে ঘুরে চোখ বুজল।

বুধবার রাত থেকে এক বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই চলছে কৃপাসিন্ধুর। বুড়ো-তলার নালায় অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর রক্ত আর অনেক চোখের জলে ভেজা গ্রামীণ অবচেতনার ঐতিহ্যগত খুব পুরনো ওই বিভীষিকার অনেক চেহারা। বুধবার রাত থেকে সে কাটা মুণ্ডুর রূপ নিয়েছে।

কাটা মুণ্ডু, তোমার নাম কী?

বীরু।

কাটা মুণ্ডু, তোমার দেশ কোথায়?

দোগাছিয়া।

কাটা মুণ্ডু তোমাকে কাটল কে?

খেপু।

কৃপাসিন্ধু বোবাধরা গলায় বলে, খেপু না, খেপু না। তারক হলধর আব্দুল কৃপাসিন্ধু…

ডালিম গাছের জিনটি

একটা আমবাগান ছিল। ছায়া ছিল। পিটুলির জঙ্গল ছিল আর বাঁশের মাচানের ওপর টাপর চাপিয়ে টঙ ছিল। রাতে লণ্ঠন জ্বলত। জাগাল আমরু শুকনো পাতায় খুড়ুস শব্দ শুনেই বাঘের হাঁক দিত। আর বিশেষ কথা, এদিক-সেদিক জঙ্গলে প্রকৃত বাঘই ছিল। তবে সে অনেক পুরনো দিনের ঘটনা।

এখন সেটাই চন্দ্র সিং দুগারের একুশ বিঘে গমক্ষেত। ফাল্গুনের রোদে প্রসারিত স্বর্ণচিত্র। ভাগীরথীর নিচু ও শাদা মাটির বাঁধে দাঁড়ালে দৃষ্টি জ্বালা-পোড়া হয়। আমরুর বংশধর নাসিরের শরীরে অতীতের প্রকৃত কোনো বাঘের আত্মা আছে। দুগারজি বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি জন্মান্তরবাদী। 'নাসির, তু জাগাল হ।' বলায় সে এককথায় রাজি। কিন্তু পূর্বপুরুষের মতো সে মাথায় গামছার পাগুড়ি বাঁধেনি। হাতে লাঠি কী বল্লম নেয়নি। তার ছ'ঘরা পিস্তল আছে। আর এই পিস্তলটির কথা দুগারজি জানতেন। 'গতিক দেখলে লাস ফেলবি, ডরাস নে বাপ! আমি আছি।' দুগারজি বলেছিলেন। গমের রঙ বদলানোর মুখে সত্যিই একটা লাশ পড়েছিল। দুগারজি ছিলেন। বলার মতো কিছু ঘটেনি। যার লাশ, সে, জেরাত মির্জা অনেক কিছু দাবি করত। যেমন, সে কেল্লাবাড়িতে থাকে, তাই নবাববংশীয়। তার ঠাকুর্দা ইসমাইল মির্জা কোচোয়ানি করলেও বছরে একটা রুপোর তঙ্কা ও কালেক্টর বাহাদুরের সেলাম পেত। সেই আমবাগানের এক শরিক ছিল সেও। শেষে গাছগুলান কাটা পড়ল। যুদ্ধের বছর সরকারের কাঠের দরকার পড়েছিল, শোনা কথা। তারপর কীভাবে একুশ বিঘেটা ভেস্টেড হয়ে যায় এবং সেও অনেক কথা যে, শেষে ভেস্টেড জমি দুগারজির হাতে চলে আসে। তিনি বিরাট কূট-কৌশলী পুরুষ।

ফাল্গুনে একুশ বিঘে পাকা গমের সময় ভোট। ভোটের মুখে জেরাত মির্জাকে কবর থেকে টেনে বের করার অবস্থা। দুগারজি নির্দল প্রার্থী। পেছনে রাজনৈতিক সমর্থন আছে। জেরাত মির্জার মেয়ে দিলবাহারকে জিপে চাপিয়ে ঘোরানো হচ্ছে এবং সেই মেয়ে প্রাইমারি পাশ, চেরা গলায় ভাষণ দিচ্ছে,

বিচার চাইছে জনগণের কাছে। দুগারজি বললেন, 'নাসির, ই কী বাপ, তু আছিস না কী?'

নাসির বলল, 'মেয়েমানুষ। ছেড়ে দেন।'

'ছাড়া কঠিন।' দুগারজি বললেন। 'তোর নামও উঠছে। শেষে—ইদিকে ভোট, হাওয়া ঘুরছে।'

'আগে ই কথাটোর জবাব দেন।'

'বল।'

'জাগালি মাঠের কাজ। মাঠ করব, না ভোট করব?'

'দুই-ই।'

নাসির হেসে ফেলল। 'আপনাকে মশাই বুঝা কঠিন। ভোট, না মাঠ, ভেবে পাই না।'

ফরাক্কা ফিডার ক্যানেল বারো মাস ভাগীরথীকে পূর্ণগর্ভা করেছে। ধনুক-বাঁকের মাঝামাঝি একটা গাবগাছ, যার তলায় জেরাত মির্জার লাশ পড়ে ছিল। মাথার জায়গায় দুগারজির একজোড়া পামসুর চাপ। তবে মাটিটা খটখটে, জমানো দুধ মনে হয়। রক্ত কয়েকটি বর্ষা ধুয়ে দিয়ে গেছে। একুশ বিঘে স্বর্ণ-চিত্রে পিঁপড়ের শ্রেণী হয়ে বাংলাদেশী মুনিসরা গম কাটছে। ক্ষেত খালি হলেই পাওয়ারটিলার নামবে। এককোনায় ছোট্ট হলুদ পাকাঘর। তার ভেতর পাম্পসেট বসানো। জল জিনিসটার অভাব নেই এ মাটিতে। দুগারজি ক্ষেত দেখছিলেন। ভোট, না মাঠ? নাসির মাঝে মাঝে এভাবে তাঁকে বাস্তবতা দর্শন করায়। একটু পরে তিনিও হাসলেন। 'ভোট, না মাঠ, বললি।'

'তাই তো বললাম মনে হয়।'

'জিতব না। মিনিস্টারও হবো না।' দুগারজি স্বীকার করলেন। 'কিন্তু ভোটে না গেলে মাঠ বাঁচানো কঠিন হয়, বাপ।'

'ক্যানে কঠিন হয়?'

দুগারজি তাকালেন তার দিকে। বাঘের আত্মা আছে এই জোয়ানের মধ্যে। জাত-ঘাতক। জীবন্মৃত্যুর পার্থক্য নিমেষে একাকার করতে পটু। কপালে, দুই ভুরুর মধ্যিখানে স্থায়ী লম্বাটে নীল তিলক, যার স্থানীয় নাম 'রাখাল-ফোঁটা।' সে অতীতে এক রাখাল ছিল। ন্যাকড়ায় ঘুটিঙ বেঁধে থুথু দিয়ে তার স্মৃতি। নাসিরকে রূপবান করেছে ওই চিহ্ন, তাতে ভুল নেই। তার গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল, ব্রোঞ্জ-নির্মিত শরীর, তার মুখের হাসিতে ঐতিহাসিক ফৌজদারদের লক্ষণ

আছে, এবং মধ্যযুগে ইচ্ছে করলে এরাই নবাব-বাদশাহ হতে পারত। কেল্লাবাড়ি থেকে কাটরা কলোনি পর্যন্ত ঘরে-ঘরে তার সাগরেদ। তাদের কেউ-কেউ ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়াও জানে। এই নিরক্ষর জোয়ান ঘাতকের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা আছে। দুগারজি তার সামনাসামনি এলে এই সব কথা ভেবে গর্বিত হন। যেহেতু তিনি বাঘ পুষেছেন। আবার ভয়ও করে। যেহেতু বাঘ মানুষখেকো হলে একটা বিপজ্জনক অনিশ্চয়তার মধ্যে চলাফেরা করতে হয়।

ভাবনা-চিন্তা করে চন্দ্র সিং দুগার বললেন, 'হরেনমাস্টার ই ভোটে রানীকে গিলবে বলে রানীদির ডর, তু জানিস।'

'হুঁ, সব্বাই জানে।'

'তো রানীদি বললে তুমি দাঁড়াও, একগাল খাও।' দুগারজি কষ্ট করে হেসে বললেন, 'ওই যেমন ভৈরব লধি যেতে যেতে একগাল কবে খায়—যদ্দূর যায়। ভোগরথপুরের কাছে অবস্থা দেখেছিস?'

নাসির বুঝতে পেরে বলল, 'এখুন রাজনীতি বেক্তিগত।'

'ব্যক্তিগত।' দুগারজির অবাক হবার কিছু নেই। নাসির আধুনিক শব্দ বা টার্মগুলান বোঝে। 'রাজনীতি ব্যক্তিগত, খুব ভালো বলেছিস বাপ। রানীদি জিতলে মিনিস্টার হবে। হরেনমাস্টার জিতলে এম এল এ-ই থেকে যাবে। উয়ারা সরকার করতে পারবে না, ইটা সারা দ্যাশ জানে। কথা কী, ওই হন্না বলেছিল, দুগারজি তুমি ভেস্টেড ল্যাণ্ড আবাদ করেছিলে। হে, তুমার বড়ো শাহস দেখি। ইয়ার বেশি আর কী বলি তোকে?'

'দুগারজি, মেয়েমানুষের গায়ে ই নাসির হাত তুলে না।'

'মেয়েমানুষ। আমার বাবার বসানো ইস্কুলে—' দুগারজি চটে যাওয়ার ভান করলেন, 'ওই হন্নাও আমার বাবার বসানো ইস্কুলে পঢ়াতে পঢ়াতে এম এ পাশ দিলে, বি টি পাশ দিলে—শেষে, উঃ। শালা এই দুনিয়া! তবে তোকে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে কি বলেছি?'

নাসির হাসতে লাগল। 'কথাটো কী?'

'মির্জার বেটিকে বিয়া কর বাপ।' সিড়িঙ্গে চেহারার দুগারজি শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে থুথু ফেললেন। 'হাজারদুয়োরির ধাপ দেখেছিস? উই দ্যাখ—' দূরে কেল্লাবাড়ির ওদিকে নবাববাহাদুর হুমায়ুন খাঁর ১৮২০-তে তৈরি সৌধটি তর্জনীতে নির্দেশ করে বললেন, 'ধাপে ধাপে চড়তে হয়। ভোটের আর দিন পনেরো দেরি। তু ধাপে পা দে বাপ! পনেরো দিন—তু সব পারিস।'

নাসির হাসি বন্ধ করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে শাদা মাটি ঘষছিল। শ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমি উয়ার বাপকে মেরেছি।'

'উয়াকে বুঝা, তু লয়—অন্য কে, সিটাই ফার্স্ট ধাপ।'

'মির্জারা শিয়া।'

দুগারজি খ্যা খ্যা করে হাসলেন একথায়। 'আজকাল আর শিয়া-স্নন্নি। মোতি মির্জার বেটি শাহাদত দর্জির বেটার ঘরে উঠেনি? শাহাদত শিয়া? আর উই বেটির মা? কী যে বলিস তু!'

একটু পরে নাসির বলল, 'পনেরো দিন!'

'তোর এক দিনেই একশো, বাপ। তোর সব বড়ো দিন। খেলা দেখা। দেখি।'...

বরাবর ভোটের মুখে এইভাবে পুরনো কথা ফাঁস হয়। কবর থেকে অনেক লাশ বেরিয়ে আসে। যার সৌধে ধাপে ধাপে ওঠার চক্রান্ত, সে দিলবাহার, সতেরো বছর বয়স, ভোটের মুখে অনেক পুরনো কথা জানতে পেরেছিল। তাকে ভাগীরথীর ওপারে একুশ বিঘে সবর্ণচিত্রটি দেখিয়ে বলা হয়েছে, ওইখানে এক আমবাগান ছিল। দু' আনার মালিকানা ছিল তাদের। বুড়ো আমরুর কথাও তাকে বলা হয়েছিল। সেই সূত্রে নাসিরের কথাও। নাসির জলঙ্গির বর্ডার থেকে তেত্রিশশো টাকায় যে পিস্তলটি কিনে এনেছিল, তাও সবিস্তারে। জেরাত মির্জার বুক ঝাঁঝরা-করে-দেওয়া পিস্তলটি দেখতে ইচ্ছে হতো মেয়ের। তার সৎ ভাই জাহাঙ্গির নিজের মাকে নিয়ে সে বছরই কলকাতা চলে যায়। জাহাঙ্গির ট্রেনে পকেট মারত। কলকাতায় এই কাজটার স্নবিধে নাকি বেশি। দিলবাহার বেগম কলকাতা দ্যাখেনি। দক্ষিণে বহরমপুর, উত্তরে জঙ্গিপুর তার নগরদর্শন। হরেন-মাস্টার বলেছিলেন, 'তুই খান্দান বংশের বেটি মা। কথাটা মনে রাখবি।' কেন একথা, ভোটের মুখে এসে বোঝা যায়।

মির্জা জেরাত আলি ছিলেন দর্জি। কাটরা কলোনির টেরে হাড়-পাঁজর বের-হওয়া তিনশো বছরের পোড়ো শিয়া মসজিদের উঁচু চত্বর সাফ করে একা ঈশ্বরকে ডাকতে যেতেন। দিনেরাতে নিয়মমতো পাঁচবার। তিনি পুরো বাঙালি বনে গিয়েছিলেন। দিলবাহারের মায়ের কারণে। গুলবাহার বেগম ছিলেন বাঙালি বধূ। যৌবনের শেষে পৌঁছেও প্রেম এমনি আসে না, ঠেলায় পড়লে আসে। বেগমের বাপ ছিলেন উকিল। বেগম ছিলেন একপায়ে ল্যাংড়া মেয়ে, কালো রঙ, কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট। উকিলসাহেব বলেছিলেন, 'একুশ বিঘে ভেস্টেড করুক,

আমি আছি। আইন আছে।' এই হলো বিয়ের শর্ত। আইন করে দু' আনা শরিকানার তিনবিঘে হাতে এনে দিয়ে আইনজীবী চমৎকার একটি স্ট্রোকে শেষ শ্বাস ছাড়েন।

দিলবাহার মায়ের চুল পেয়েছে, ঠোঁট পেয়েছে, নাকের কিয়দংশও। বাপের পেয়েছে গায়ের রঙ, সাহস, তেজ, অহঙ্কার। খান্দানি অহঙ্কার ঠাকুর্দা কোচোয়ানি করলেও কালেক্টর বাহাদুরের বৎসরান্তে সেলাম পেতেন। এটা কম নয় জীবনে। বিশেষ সেই দিনে যে আচকান, তাজ, নাগরা, মখমলের কোমরবন্ধ পরে যেতেন ইসমাইল, সিন্দুকে এখনও রাখা আছে। গুলবাহার উর্দুভাষিণী সতীনের সঙ্গে কাজিয়া করতেন, কে শীতের রোদে ওই খান্দানি গৌরব শুকোতে দেবে! সতীন হেঁপো মেয়ে। কুঁদুলি। হাঁপানি ওঠার ভয়ে শেষদিকে কুঁদুল ছেড়ে নেহাত ঝাঁটা দেখানো শুরু হয়। দড়ির খাটিয়ায় বসে, পেছনে পুষ্পবতী ডালিম গাছ, ঝাঁটা দেখাতেন। দিলবাহার, জাহাঙ্গির হেসে অস্থির হতো। কতটুকু ছেলে ছিল জাহাঙ্গির। আপেল-টুকটুক গায়ের রঙ। নিজেকে দেখিয়ে বলত, 'ম্যায় জিন হুঁ রি, সফেদ জিন।'

এসব পুরনো কথাও ভোটের মুখে এসে পড়ে, যেন আসতে বাধ্য। পুষ্পবতী ডালিম ফাল্গুনে ফলবতী হয়েছে। ওই গাছে সেই সফেদ জিন অর্থাৎ শাদা অলৌকিক মনুষ্যবৎ প্রাণীটি বাস করে। পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন, 'আমি মানুষ ও জিন পয়দা করেছি।' জিনদের দেশ আকাশের তৃতীয় স্তরে, বৈজ্ঞানিক টার্মে বলা চলে, থার্ড গ্যালাক্সিতে। সুতরাং মির্জাবাড়ির ডালিম-গাছের জিনটি নির্বাসিত, অথবা পলাতক কোনো আসামী। জাহাঙ্গিরের মা বলতেন, 'মালুম, ভাগকে আয়া।'

জাহাঙ্গির বলত, 'হেঁয়া কাহে রি আম্মি?'

'আনার উনকি খানা, ইস লিয়ে।'

ডালিম মহাজাগতিক দ্বিপদ প্রাণীটির খাদ্য? আর কিছু খায় না? পৃথিবীতে কত কিছু খাদ্য আছে। জেরাত মির্জা বলতেন, 'যদি আমার বরাতে কিছু ঘটে যায় বেটি, যাবে। কিন্তু কখনও আনার বেচে খাবিনে। ওই ফল আমরা বেচি না। খাই না।'

ডালিমগুলান যত উজ্জ্বল দেখাক, কেমন একটু টক তিতকুটে স্বাদ—দিলবাহার গোপনে জেনেছিল। ডালিমগাছটি পুষ্পবতী হয়। ফলবতী হয়। নিঃস্ব ভিখারিনী হয়। উদ্দেশ্যহীন এই ধারাবাহিক ঘটনার সঙ্গে অলৌকিক

নির্বাসিত প্রাণীটিকে কেন জড়ানো হয়েছে, দিনে দিনে আরো বুঝেছিল সে। জিনটি না থাকলে গাছটির সম্পর্ক পৃথিবীতে কিছুই থাকে না হয়তো। এইভাবেই সকল বৃক্ষলতা, ফুলফলকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করা হয়। কিন্তু তারপর একটি আকস্মিকতা দিলবাহারকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দেয়। জেরাত মির্জা যেদিন লাশ হন, জিনটিকে সকাতরে ডেকেও সাড়া পাননি। জিনেরা কি মানুষের ভাষা বোঝে না? কেন এতকাল এই ক্ষয়াটে জীর্ণ দালানবাড়ির মানুষজনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, সেটা কোনপক্ষের দোষ, অথবা ও মানুষকে নিকৃষ্ট গণ্য করে? ঘৃণা করে? একটা চিন্তার বিষয়।

রানী রায় বলেছিলেন, 'তোমার বাবার কথা অ্যাসেম্বলিতে তুলব। থানার দারোগা দুগারজির ঘুস খেয়েছে। ট্রান্সফার হয়ে গেল।' দারোগারা আসেন, চলে যান। সবই গতিশীল। পৃথিবীই তো একটা প্রবাহের অধীন। জে এল আর ও সায়েব কর্তৃক ভেস্টেড ল্যাণ্ড ঘোষিত হবার আগেই নাকি একুশ বিঘে মির্জাগোষ্ঠীর কাছে কিনেছিলেন চন্দ্র সিং দুগার। জেরাত আলিরও সই আছে দলিলে। উকিল নানাজি 'ডিসট্রেস সেল' প্রমাণ করে তিন বিঘে উদ্ধার করেন। তার গৌরব রানী রায় 'ভূমিসংস্কার' নামে আত্মসাৎ করেন। সব বেরিয়ে আসছে ভোটের মুখে। জিনেরা কেন ঘৃণা করবে না মানুষকে?

আজ ভাদুড়িয়াহাটে মিটিং ছিল। আগের রাতের সামান্য বৃষ্টিতে মাটি নরম। মঞ্চ থেকে নেমে এসে আঁচলে ঘাম মোছার সময় একটি ঠোঁট—রোগা, তীক্ষ্ণ চেহারা, চোখে নিকেলের ফ্রেমে চশমা, জিনসপরা বলল, 'নমস্কার! আরো কিছু জানতে চাই, বলুন।'

'সবই তো বললাম। আপনি কে?'

'আমি দৈনিক সত্যসেবক থেকে আসছি। ইলেকশান সার্ভেতে—'

'গিয়ে তো উল্টোপাল্টা লিখবেন।'

'আপনি মুসলিম মহিলা—'

'কলকাতার লোকেরা কিছু বোঝে না।'

'বুঝিয়ে দিন।'

'মুসলিম বললেন। মহিলা বললেন। আপনি বুঝবেন না।'

'এক মিনিট। হরেন সরকার—আপনাদের ক্যাণ্ডিডেট. কোন দলের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন?'

'ওই তো পোস্টার, ব্যানার। দেখে নিন।'

'বিপ্লবী ফ্রন্ট ব্যাপারটা বুঝলাম না। আপনারা কি নকশাল গ্রুপ?'

সতীশ, ফয়েজ, বারীন কর্মকাররা এসে ব্যূহ গড়ল। বারীন বলল, 'দিলু, কাগজের লোকের লগে কী কথা? আপনে যান তো মশয়! দিলু, চা।'

রিপোর্টারটি চিনে জোঁক। 'আপনি অসাধারণ বলেন।' সে স্তুতি করতে থাকল! 'নেতৃত্বের পোটেন্সিয়ালিটি—এই বয়সে আপনি—ওয়াণ্ডারফুল! আপনার রাজনৈতিক—'

দিলবাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমার রাজনীতি ব্যক্তিগত।'

বারীন দ্রুত বলল, 'দিলু আর রাজনীতি ব্যক্তিগত না। উল্টোপাল্টা কইও না বোনটি।'

রিপোর্টার বলল, 'একুশবিঘে ব্যাপারটা—'

ফয়েজ বলল, 'জমির লড়াই।' সে ব্রিফিং-এ ব্যস্ত হলো। রিপোর্টার নোট করতে থাকল। বাহার চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে জনগণের প্রশংসা শুনছিল তখন। ভাবছিল, ভোটের মুখেই কি এত কথা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে? অথবা ডালিম গাছের জিনটি এভাবেই তার মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে? বাপের সেলাই মেশিনে বসে যেসব কথা ভাবতে ভাবতে অসতর্ক আঙুল রক্তাক্ত হয়েছিল, এতদিনে সেইসব কথা, অবুঝ আর অসংবদ্ধ চিন্তা, একুশ বিঘের মতো শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণশস্য হয়ে সংবদ্ধতায় প্রসারিত হলো কি? আসমানি রঙ শাড়ির ভেতর বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানি ক্রমশ থেমে যেতে যেতে একটা প্রচণ্ড ক্লান্তি এতক্ষণে তাকে চেপে ধরল।...

বাড়ির চারদিকে অগোছাল জঙ্গল, ধ্বংসস্তূপ। ঘেঁটুফুল, আকন্দফুল, শিমুলফুল, পলাশফুল, মাদারফুল, উঁচু-নিচু ব্যাপকতায় সমুজ্জ্বল। ভোটের সঙ্গে এদেরও কী এক গোপন যোগসূত্র। সেলিম মির্জার আমবাগানে সন্ধ্যার মুখে কোকিলটা চুপ করে গেল হঠাৎ। দু-ঘর একতলা বাড়ির গায়ে গাছের নখ। কার্নিশে গাছের পা। ছাদে ফাটল। বিপ্লবী ফ্রন্ট পাশের দর্জিখানা চুনকাম করে নির্বাচন অফিস বসিয়েছে। এদিন সকাল থেকে চারটে মিটিং, গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘোরা, কর্মীরা ক্লান্ত। এ রাতে ছুটি। রিক্সাওয়ালা নিজামের মা তারাবুড়ি দিলবাহারের রাতের সেন্টি তিন বছর ধরে। বুড়ির কান জাগাল আমরুর চেয়ে খর। তবে এ বুড়ি খান্দানি বংশজাত কন্যা। উর্দু-বাংলা সমান বলে। মাটির ফরসিতে তামাক টানে। নিজাম আজ মুর্গি জবাই করেছিল। খানিকটা দিয়ে গেছে। সে মুর্গি জবাই করলে এটা নিশ্চিত, বাংলাদেশী সওয়ার এসেছে বহুদূর থেকে, যার

পাসপোর্ট-ভিসা থাকে না। নিজাম কীভাবে তাদের টের পায়, আশ্চর্য! তারাবুড়ি দিলবাহারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সব সামলে-সুমলে ফরসিতে টান দিয়েই হাঁকল, 'কৌন হো জি ?'

সাড়া এল না। দিলু বলল, 'কেউ না।'

'নেহিরি!' বুড়ি ফের হাঁকল, 'ফৈজু আছিস ? নক্কর করছিস কাহে বেটা ? আ যা।'

উঠোনঘেরা পাঁচিল ধ্বসে আছে। রাঙাচিতের বেড়া। সেখানে টর্চ জ্বলল। তখন দিলু বলল, 'কে ?'

'আমি।'

আকাশে চাঁদ আছে! টর্চের আলো তাই রাগিয়ে দেয়। দিলু বলল, 'কে রে আমি ?'

'দিলু, আমি নাসির আলি।'

বুক ধড়াস করে উঠে ডালিম গাছটির দিকে একবার তাকাল দিলু। সানুনয় দৃষ্টিপাত। তারপর শ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কী ?'

নাসির হাসল। 'আমি বাঘ নই, মানুষ।'

'বলো।'

'বুলব বলেই এলাম! আগড় না খুললে কী বুলব ?'

'কিছু বলার থাকলে দিনে এস।'

'আমি মাঠের লোক, দিলু। দিনরাত সমান!' নাসির আগড়ের ওপার থেকে বলল। 'তবে কথাটো ভোটেরও বটে, লয়ও বটে।'

তারাবিবি ফরসি টানতে ভুলে গেছে। মাটির ঢিবির মতো স্থির। হেরিকেনের দম তুলতেও সাহস হারিয়েছে। দিলু শক্ত হয়ে গেল। বলল, 'শাসাতে এসেছ দুগারজির হয়ে ?'

'না। তুমি ভোটে খাটছ মাস্টেরের হয়ে। খাটো। আমার বাধা লাই। আমার কথাটো হলো, তুমার বাপজিকে আমি মারিনি।'

'অ্যাদ্দিন পরে এসব কী কথা ? মতলব কী তোমার ?'

'আমার ওপর-পুরুষ তুমাদের বাগানের জাগাল ছিল। আমি জাগালবংশ। দুগারবাবুর জাগাল হয়েছি। শুধু এইটুকুনই কথা। কিন্তুক তুমার বাপকে আমি মারিনি।'

'তুমি মাতলামি করতে এসেছ। চলে যাও।'

নাসির হাসল। 'একটুকুন খেয়েছি। না খেলে আসা যেত না তুমার ছামুতে। দিলু, তুমি মোসলমান, আমি মোসলমান! এই সম্পক্ক ঠিক কিনা? আর ওই শালো দুগারবাবু ভিনজাত কিনা? তুমার হুকুম লিতে এলাম।'

'কী হুকুম?'

'শালোকে বসাই, হুকুম দাও।'

'চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। চলে যাও তুমি।'

'শুধু তুমার মুখের একটো কথা, দিলু। হুকুম দাও।'

'চলে যাও!'

দিলু বারান্দায় উঠে এসে হেরিকেনের দম তুলল। শরীর কাঁপছিল। দেখল, নাসির চাঁদের আলোয় আগড়ের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। আরো একটু দাঁড়িয়ে থেকে টর্চের আলো অকারণ ফেলতে ফেলতে চলে গেল। এতক্ষণে তারাবুড়ি চাপাস্বরে বলতে থাকল, 'কমিন! কমজাত! শয়তানকা বাচ্চা। মাস্টেরকে বলিস, মু তোড় দেগা হারামিবাচ্চার।...'

একুশ বিঘের ঈশানকোণে ভাগীরথীর নিচু বাঁধে গাবতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে চন্দ্র সিং দুগার হেসে অস্থির! 'তু বললি আমাকে বসাবি?'

নাসির হাসছিল না। বলল, 'না বুলে উপায় কী? আমার মুখে ই কথা ছাড়া আর কী মানাত?'

'ধাপে পা রাখতে পারলি না বাপ! পা ফস্কে গেল। তবে এখনো চোদ্দ দিন বাকি।'

'বলেন তো বোম মেরে রিকশোসুদ্ধু উড়িয়ে দিই ছুঁড়িকে।'

দুগারজি শিউরে উঠে তিড়িং-বিড়িং নেচে বলেন, 'না না। মুখে আনিস না বাপ! আমার তিনপুরুষের কীর্তি উড়ে যাবে। পাবলিক খেপে যাবে। হিতে বিপরীত। আবার যা।'

'যেতে ডর কিসের? ই নাসির আলি সব জায়গায় যেতে পারে। তবে কঠিন মেয়েমানুষ।'

একটু ভেবে দুগারজি বললেন, 'তুলে লিয়ে যেয়ে বিহা করতে বলতাম। রানীদির সঙ্গে সে-কথাও হলো। কিন্তু বুঝলি তো? তু আমার লোক, সবাই জানে। আমি পাবলিক ওয়ার্ক করি। রিস্ক্ আছে। তুই আবার যা। ওরে বাপ, পিরিতি বড়ো দড় জিনিস। আঠার মতন। ছুঁলেই ছুঁড়ি আটকে যাবে—

আমার মন বলছে ই কথা।'

নাসিরের পরনে আজ জিনস, ছাইরঙা শার্ট, জলঙ্গি বর্ডারে হস্তগত। দুগারজির দেওয়া মহার্ঘ সিগারেটটি ঠোঁটে রেখে বলল, 'জ্বালুন।' দুগারজি হাওয়া বাঁচিয়ে ধরিয়ে দিলে সে ধোঁয়ার রিং বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার পর বলল, 'কালু হাজির পামসেট চুরি হয়েছে। বুলছিল, নাসির, তু তামাম মাঠের পামসেটের জিম্মা লে। আমরা পেত্যেক বছরে পাঁচশো করে দিব। বছরে উপরি পাবি হাজার পাঁচেকের কম লয়। আমি মাঠের লোক, দুগারজি। কী করি, বলুন?'

'আমার আপত্তি কী? তোর যদি উপরি হয়, লে। কিন্তু ই কাজটো তোকে করতেই হবে।'

'পেরাইমারি পাশ। আমি নাম সই করতে পারি না।'

'ধুর ছোঁড়া। তু সিনেমার হিরো।' দুগারজি বেজায় হাসতে থাকলেন। 'ধনু উকিলের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিলি তু। তোকে মোছলমান বলে গণ্য করেছিল? ইস্কুল ফাইনাল পাশ মেয়ে। তারপর—'

থামিয়ে নাসির বলল, 'ই টাউনে সব পারি। কেল্লাবাড়ির কাউকে পারি না। উয়াদের লোহু অন্যরকম।'

'লবাবী লোহু'! নিমেষে মুখ বেঁকে গেল চন্দ্র সিং দুগারের। 'নবাবদের বান্দাবাঁদির বংশও বলে লবাবী লোহু! শালা! জেরাত মির্জার ওপর-পুরুষ ছিল সইস। ছাড় বাপ! লেগে যা আঠা লিয়ে।'

'দিলুর মুখ বন্ধ করা তো? নাকি আরো কিছু?'

একটু পরে দুগারজি মুখ খুললেন। 'আরো কিছু। ঠিক ধরেছিস বাপ! রানী রায় জিতলে মিনিস্টার হবে। ঠিক। ই একুশ বিঘে সেইফ হবে। ঠিক। কিন্তু হন্না ছাড়বে না। মির্জার বেটি উয়ার ইস্যু মানে, তিন বিঘের ঝাণ্ডা পুঁততে আসবে।'

'আমি আছি।'

'তোড় এলে ভেসে যাবি, বাপ! তোর পিস্তলে মোটে ছটা গুলি।'

'রানীদিদি মিনিস্টার হবে বুলছেন। আবার বুলছেন ঝাণ্ডা, তোড়—বুঝি না।'

'ওরে বোকা ছেলে! পাবলিককে জাগিয়ে দিচ্ছে। তোড় একটি আসবে। মেয়েমানুষ অমন করে বিচার চাইছে পাবলিকের কাছে। রিপোর্ট খারাপ, বাপ!'

আসলে দুগারজি বোঝাতে চাইছিলেন যা, তা হলো কলকাতার রিপোর্টার-টির ভাষায় নেতৃত্বের পোটেন্সিয়ালিটির কথা। মির্জার মেয়ের মধ্যে রানী রায়ের আদলের আঁকুর। একটা নতুন ফোর্স জাগছে সতেরো বছরের এক তরুণীর মধ্যে। রানী রায়েরও সেই চিন্তা। অদূরে তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী। আর 'আজকাল এডুকেশন রাজনীতিতে কোনো ফ্যাক্টরই নয়।'

একথা রানী রায়ের।

নাসির কতকটা বুঝল, কতকটা বুঝল না যেন—দুগারজির ধারণা। এই ঘাতক ছোঁড়াটাকে নিয়ে একটাই সমস্যা, মেয়েমানুষের দিকে দৃকপাতহীন। ঐতিহাসিক আমলে এখানে অসংখ্য খোজা বান্দা ছিল। মনে মনে বললেন, 'ই শালার আত্মায় ফিফটি পার্সেন্ট বাঘ, ফিফটি পার্সেন্ট খোজা। শালা হিজড়ে! নৈলে এখনও বিয়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে না।'

নাসির সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাজারদুয়ারি প্যালেসের দিকে—দূরে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'দেখছি। ভাববেন না।'...

বিকেলে অপ্রত্যাশিতভাবে নদীর ঘাটে দেখা। চাপ-চাপ জমাট জঙ্গল দুধারে। সংকীর্ণ রাস্তা। কেল্লাবাড়ির ভাঙা ফটকের দিকটাও জনহীন। সিক্তবসনা তরুণী ঠোঁট কামড়ে ধরে পায়ের কাছে ইটের টুকরোগুলো দেখতে দেখতে ডালিমবৃক্ষবাসী জিনটিকে মনে মনে ডাকতে ডাকতে বলল, 'কী?'

নাসির বলল, 'হুকুম।'

'মাতলামি কোরো না।'

'আমি মদ খাইনি। সন্ধ্যের পর খাব। এখুন মাথা ঠিক। হুকুম দাও।'

'চেঁচিয়ে লোক ডাকব।'

'ডাকো। আমার নাম নাসির।'

'কেন তুমি আমার পেছনে লেগেছ?'

'লাগিনি।' নাসির একটু হাসল। 'তিন বিঘে ফেরত লিবা তো হুকুম দাও।'

দিলু বাঁকা হাসল। 'কী মতলব? খুলে বলো।' নাসির চুপ করে আছে দেখে সে ফের বলল, 'দুগারজি আমার মুখ বন্ধ করতে পাঠিয়েছেন তো? আমি জানি।'

'দেখ দিলু, ইভাবে মুখ বন্ধ হয় না। নাসির জানে। নাসির ইচ্ছে করলে তুমাকে উঠিয়ে লিয়ে যেয়ে বিহা করতে পারে। সব জানে। তবে সেটা কথা লয়।'

হঠাৎ সাহসী হয়ে গেল দিলু। 'কাল থেকে মিটিঙে তোমার একথা বলব।'

'বোলো। সেটাই চাই। তবে ছ্যাচা কথাটো বলবে। কী, বুলবে, নাসির আলি দুগারবাবুকে বসাতে হুকুম লিতে এসেছিল। আর বুলবে কী, নাসির আলি বুলেছে, হুকুম পেলে ভোটের আগেই ঝাণ্ডা পুঁতবে মাঠে।'

দিলু আস্তে বলল, 'তুমি আমাদের হয়ে ভোটে খাটো তাহলে। দেখাও, তুমি মিথ্যা বলছ না।'

'আমি ভোট বুঝি না, মাঠ বুঝি। কালু হাজি বুলেছে, তল্লাটের পাম্‌সেট পাহারা দিলে বছরে পাঁচ হাজার পাব। আমার পাঁচজন লোক আছে, যারা আমার আপন। বাদবাকি ই টাউনে সবাই ফালতু। ভাবে ভক্তি লয়, ভয়ে ভক্তি। বুঝলা কিছু?'

'আমার বুঝে দরকার নেই।' বলে দিলু পা বাড়াল।

'দিলু, হুকুম!' নাসির পেছন থেকে বলল।

'আমার কোনো হুকুম নেই।'

দিলু চলে গেলে সিগারেট ধরালো। এতদিন বাদে নিজেকে এই প্রথম অসহায় লাগছে। দুগারজি তাকে নিয়ে এ কী খেলা খেলতে শুরু করল? বুকটা তোলপাড় হয়। সি রুবসনা তরুণীর পথ চলার ছপছপ শব্দ কানে বসে গেল। এই টাউনের তাবত মেয়ে নাসিরকে দেখলে মিষ্টি হাসে। সেই নাসির! শালা দুগারবাবু। খুঁচিয়ে তুমি ঘা করে দিয়েছ।...

চন্দ্র সিং দুগারও রোজ গাঁয়ে-গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছেন। ·লাকার ব্যবসায়ীরা তাঁর সমর্থক। বড়ো জোতের মালিকরাও তাঁর পেছনে। মুসলিম মেজরিটি জেরাত মির্জার হত্যাকাণ্ডের সময় দুগারজির বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়েছিল বটে, কিন্তু এসব ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী হয় আপন স্বভাবে। মির্জার মেয়ে তাকে জাগানোর চেষ্টা করেছে হরেনমাস্টারের তাগিদে। দুগারজি হাওয়া আঁচ করেন, অতীত ক্রোধ জাগি-জাগি করছে। মেয়েটা এমন বলিয়ে, ভাবা যায়নি। একটা মাসেই 'জ্বালাময়ী ভাষণ' যাকে বলে, রপ্ত করে নিয়েছে। আসলে মেয়ে তো, তদুপরি নবাবি খান্দানের দাবিদার এবং বিশেষ কথা, মুসলিম। এটাই চিন্তার কারণ। 'কিন্তু না, সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গেলে এটা নেওয়া ভুল হবে, দুগারজি।' রানী রায় বলেন। 'ধর্ম সম্প্রদায়-টায় আজকাল ইলেকশান-ফ্যাক্টর নয়—অন্তত এই রাজ্যে। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, দুগারজি! আপনি শুধু ফ্লোটিং ভোটটা খান, দ্যাটস এনাফ্।'

ফ্লোটিং ভোট, যতদিন যাচ্ছে, হরেনমাস্টারমুখী হচ্ছে যেন। বড়ো সমস্যায় ফেলে দিলে জেরাত মির্জার মেয়ে। ওকে একনিমেষে বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে সর্বনাশের চূড়ান্ত হবে।

পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যায় একুশ বিঘের পাম্পসেট-বসানো একতলা ঘরটির বারান্দায় বসে হুইস্কির একটি বোতল উপহার দিলেন নাসিরকে। বিদ্যুতের আলোয় প্রসারিত মাঠে সুবর্ণচিত্রটি থরথর করছে উত্তেজনায়। দুগারজি বললেন, 'কদ্দূর এগুলি, বল বাপ!'

নাসির বলল, 'সব ঠিক আছে।'

একটু চটে গেলেন চন্দ্র সিং দুগার। 'কোথায় ঠিক! আজ রোশনবাগের মিটিঙে হারামজাদি বলেছে—'

'বলুক। মুখের কথা।'

'নাসির! তু—'

'ভোটের মুখে লোকে কত কী বলে।' নাসির ডাকল, 'ভজা! গিলাস বার কর। চাণ্টা, শালা কী দেখছিস? পানি লিয়ে আয়। কড়া জিনিস।'

দুই সাঙাত হুকুম তামিলে দেরি করল না। তারপর নাসির বলল, 'আলো নেভা বে। চাঁদের আলোই সাফিসেন্ট। চাণ্টা, আগে মালিককে দে।'

আলো নেভামাত্র চাঁদের সমস্ত আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর পাড়ে, একটু দূরে, বাংলাদেশী খেতমজুরদের কুঁড়েয়, গানের আসর বসেছে। এতোলবেতোল হাওয়া কুড়িয়ে এনে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দু-একটা কলি। দুগারজির সামনে গেলাস ধরলে ছিটকে সরে বসলেন। 'ছিঃ! কখনও দেখেছিস?'

'আজ একটুকুন দেখি, দুগারজি!' নাসির বলল। 'আমার মন চাঙ্গা। মন চাঙ্গা তো পাশেই গঙ্গা।'

'না গিলেও মাতলামি! কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।'

নাসির খানিকটা গিলে গোঁফ মুছে বলল, 'কাজ হয়েছে। আমি নাসির, দুগারজির।'

'কী কাজ, হিসেব দেদিনি।'

'দিব। এক চুমুক খান, এই কোণ্ডিশন।'

দুগারজি না হেসে পারলেন না। 'ওরে আমার কোণ্ডিশনওলা!'

নাসির গেলাস শেষ করে দুগারজির জন্য রাখা গেলাসটা তুলে তাঁকে

খাওয়াতে গেল। মুহূর্তে কুপিত চন্দ্র সিং দুগার তার হাতে ধাক্কা মারলেন। গেলাসটা পড়ল না। কিন্তু মদটা ছলকে পড়ল। নাসির বলল, 'ভজা, চাণ্টা! ধর মালিককে। একটুকুন খাওয়াবই খাওয়াব। আমি নাসির।'

ভজা বলল, 'ছিঃ। কী করো নাসিরদা।' চাণ্টাও বলল, 'কী করছ, মাইরি।'

নাসির গেলাসটা ফের তৈরি করে বলল, 'কৈ, হাঁ করুন। ভজা, চাণ্টা। ধর। অ্যাই শালারা।'

দুগারজি বেগতিক দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে রাগী হাসি। পা বাড়িয়ে বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। ভজা, দেখিস বাপ। ঝামেলা না পাকায়। সকালে এসে কথা বলব।'

যেতে যেতে পেছনে শুনতে পেলেন, 'আপনার কথায় মানুষ বসিয়ে দিয়েছি। আমার একটো কথা থুলেন না, দুগারজি। সামান্য এইটুকুন কোণ্ডিশন—একটা শর্ত শুধু। নামতে হলে দুজনই নামবঁ, না কী? একতরফা! দুগারজি। নাসির মানুষ লয়, খালি আপনি মানুষ। আচ্ছা!'

ছোঁড়াটার এমন বেগড়বাঁই কখনো দেখেননি। সারা চন্দ্রালোকিত মাঠ ভাবতে ভাবতে গেলেন চন্দ্র সিং দুগার। কিছু একটা ঘটেছে। কী? নৌকোয় উঠে মনে হলো, হিতে বিপরীতই হয়ে গেছে।···

ভোটের সাতদিন আগে কালিগঞ্জে হরেনমাস্টারের জনসভায় বোমা ফাটল। তিনটে অথবা চারটে, প্রকৃতই বোমা। তবে সভার ভেতরে নয়, পিচরাস্তায়। ঘন ধোঁয়ার ভেতর মাইকের তার কাটা গেল। মানুষজন পালিয়ে যাচ্ছে, তবু খালি গলায় হরেনমাস্টার চিৎকার করছেন, 'এভাবে বিপ্লবকে রোখা যায় না।' কর্মীরা দিলবাহারকে কাছের একটা বাড়িতে টানতে টানতে নিয়ে গেল, যেন দলের প্রাণভোমরা। কারা বোমা ফাটাল, জানা যায় না। একজন কর্মী ভাকাকে মালবাহী সাইকেল রিকশোর দঙ্গল নিয়ে নাকি আসতে দেখেছিল। ভাকা এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী। রানী রায়কে সমর্থন করার গুজব ছিল। পরদিন রানী রায়ের ফ্যাকসিমিলি স্বাক্ষরসম্বলিত ইশতাহার বেরুল, 'আমরা সমাজবিরোধীদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখি না। আমরা তাদের ঘৃণা করি। কালিগঞ্জের ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। কারণ কেউ হতাহত হয়নি। জনগণের সামনে আমরা এই প্রশ্নটা রাখছি, বোমা কি গোলাপখাস আম?' এই প্রজাতির আমের সঙ্গে নবাবী ঐতিহ্যের সম্পর্ক থাকায় কিছু ইঙ্গিত ছিল। বুঝ লোক, যে

আন সন্ধান।

কোনো একটি ঘটনা অন্যান্য ঘটনা প্রসব করে। হরেনমাস্টার বলেছিলেন, 'দিলু, ভয় পেয়েছিস মা? ভয় পাসনে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, এটা তারই লক্ষণ।' সে-রাতে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পোড়ো মসজিদের গম্বুজে এসে বসলে বিনিদ্র দিলুর সঙ্গে ডালিমবৃক্ষবাসী জিনটির প্রথম মুখোমুখি দেখা হলো। দিলু বলল, 'আমার ভয় করছে। বলো, কী করি?'

'তুমি নাসিরকে ডাকো।'

'ছিঃ। এ কী কথা?'

বসন্তরাতের জ্যোৎস্না-নাড়াদেওয়া তোলপাড় হাওয়ায় ডালিম গাছটির ভেতর 'নাসির নাসির নাসির' শব্দ খালি। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে 'নাসির নাসির নাসির'। ভাঙা চাঁদ ভালো করে দেখতে আরো একটু উঠল। তারাবুড়ি স্বপ্নের ভেতর থেকে ডাকল, 'বেটি।' দিলুর ইচ্ছে করছিল, ডালিমগুলান দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে আছাড় মেরে ভাঙে।

পরদিন কেশবপুরের মাঠে সন্ধ্যার মুখে হরেনমাস্টার আর দিলুর রিকশোর পেছনে বিস্ফোরণ। নিজামের রিকশো। কর্মীরা পায়ে হেঁটে ফিরছিল। সঙ্গে কিছু অস্ত্র ছিল। কিন্তু এটিও নিষ্ফল বোমা—গোলাপখাস আম। যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে সেটি ফেটেছিল। সুতরাং হরেনমাস্টারের সিদ্ধান্ত, 'ওরা ভয় দেখাচ্ছে।' কারা? প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ। তারা কারা? রানী রায়, চন্দ্র সিং দুগার, আবদুস সামাদরা।

ডালিম গাছের জিনটি বলল, 'নাসির নাসির নাসির···।'

অসহ্য। চোখে জল নিয়ে মির্জা জেরাতের বেটি ভাগীরথীর ঘাটে গেল। ভৈরব ডিঙ্গি থেকে জাল ফেলছিল জলে। অস্তসূর্যের ঝিলিমিলি জালের জলকানায় বুকফাটা কান্না, অঝোর অবুঝ ক্রন্দন মনে হয়। ভৈরব একটু অবাক হয়ে বলে, 'ই অবেলায় উপারে কতি যাবা মাজলনী? ভৈরব কয়েকপাত্র গেঁজানো খেজুর রস গিলেছে। চুপ দেখে ফের বলল, 'উপারে যাবার ইচ্ছে আমারও। ইখানটায় দ। শালার জাল তল পায় না গো, দেখছ—হুঁ?'

একুশ বিঘে আমবাগান দিলু দেখেনি। গমক্ষেতের স্বর্ণচিত্রটি দেখেছে। ভাঙা দেউলের শরীরে জঙ্গল ঝাঁপ দিয়েছে যেখানে, সেখানে চিত্রটির সীমানা। কাঁটাতারের বেড়া! থমকে দাঁড়াতে হলো দুগারজির শক্তির সামনে। গমের পাঁজা মাথায় খেতমজুরেরা আবছায়ায় ক্ষয়ে যাচ্ছে। আট-ন ইঞ্চি পুষ্ট শিস।

এত ফলন এই মাটির। হাত গলিয়ে কয়েকটা শিস ছেঁড়ে দিলু। শরীরে অসহ্য জ্বালা আর চিৎকার। ডালিম গাছের জিনটি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আর শ্বাস-প্রশ্বাসে উত্তাল হাওয়ার স্বরে বলছে, 'নাসির নাসির নাসির···!' তাকে তাতিয়ে দিচ্ছে। প্ররোচিত করছে।···

গাবতলায় নাসির দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। কদিন থেকে দুগারজি আসছেন না। আজ আসার খবর হয়েছে। ভোটের মিটিং সেরে মজুরি মেটাতে আসবেন।

নাসির জাগাল। তার দৃষ্টি একুশ বিঘের প্রতিটি শিস ছুঁয়ে ঘোরে। চুন্নি মাঠ-কুড়োনিদের পটাত করে শিস ছেঁড়ার শব্দও প্রতিধ্বনিত হয় তার তিনপুরুষের জাগাল রক্তে। শিবমন্দিরের কাছে সেই শব্দ শুনেই, অথবা অন্য কিছু, সে ঘোরে। রক্ত ছলাত করে ওঠে। আলো এখনও ফুরোয়নি। অসহ্য আনন্দ অথবা ক্ষোভ তাকে মাটি ছাড়া করতে চায়। চেঁচিয়ে ডাকবে। ডাকে না।

মুখোমুখি হয়ে কয়েক হাত দূরত্বে থেমে সে দিলুর মতোই বলে, 'কী?'

'নাসিরভাই!' দিলু আস্তে বলে। 'কাল সন্ধ্যায় কেশবপুরে—' থেমে যায় সে।

'হুঁ—ভাকা।'

'দুগারবাবু।'

'ওই হলো। যা ভাকা তাই দুগারবাবু।' নাসির গলার ভেতর বলে, 'কিন্তুক কথাটো কী?'

'হুকুম চাইতে গিয়েছিলে, নাসিরভাই!'

নাসির একটু হাসে। 'এই কথা! ভালো! খুবই ভালো। হাজিসাহেব আমাকে বুলেছে, তামাম পামসেট জিম্মা লাও, পাঁচ হাজার। আমি বুলেছি ডবল। তবে রফা হবে।'

'নাসিরভাই! তুমি ঝাণ্ডা পুঁতবে বলেছিলে।'

'পুঁতব! আগে শালা দুগারজি।' নাসির সিগারেটটা পায়ের তলায় চপ্পলে ঘষে নেভায়। 'বড়ো মুখ করে এসেছ দিলু। তখন ই নাসির ছেঁচা কথাটো বুলবে! হ্যাঁ, তুমার বাপজিকে আমি মেরেছি। ঘিন্না করো, গায়ে থুতু দাও, যা ইচ্ছে করো! আমার ই হাত পাপিষ্টির হাত। ই হাত কাটো, যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তুক—'

ভৈরবের হাঁক ভেসে আসে। 'জননী গো!' এপারের জলে সুবিধে হচ্ছে না।

তাই ফের ওপারে যাবে। দিলু বলে, 'যাই!' নাসির কী বলতে চাইছিল, শুনতে সাহস নেই বলেই এমন পলায়ন।

নাসির ডাকবে ভাবে। ডাকে না। একটা ঝড় এসেছিল। চলে গেল। এখন বৃষ্টির শব্দ চারদিকে। ওপারে ইতিহাসের ভাঙা-চোরা প্রাচীন রাজধানী ধূসর হয়ে যাচ্ছে। দিনশেষের অলীক বৃষ্টিতে নাসির তার পাপ ধুয়ে ফেলতে চায়।···

দুগারজির আসতে একটু রাত হলো। ক্ষেতমজুরদের সপ্তার মজুরি মিটিয়ে আরাম করে বসলেন সেই ছোট্ট ঘরটার খোলা বারান্দায়। আজও একটা হুইস্কির বোতল এনেছেন। নাসির বেয়াদপি করল না আজ। বোতল আধাআধি হলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। 'চান্টা, আলো নেভা বে! চান্টা আলো নিভিয়ে দিলে গাঢ় অন্ধকার আর বাতাসের শব্দ। মাঠজুড়ে ইতিহাসের পুরনো ঘোড়সওয়ারদের ছোটাছুটির শব্দ। একটা হারা-জেতার চরম লড়াই বেধেছে রাজধানীর সামনে।

দুগারজি বললেন, 'নাসির! ধাপে পা দিতে পারলিনে বাপ!'

নাসির বলল, 'দিয়েছি।'

'কীরকম, কীরকম?'

'এই রকম।'

কী একটা সন্দেহ করে দুগারজি টর্চ জেলেই আঁতকে উঠলেন। সেই ছ'ঘরা পিস্তল! চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চান্টা জগা? বসির!' আজ বসিরও আছে পাম্পঘরে। সে দুগারজির বডিগার্ড।

টর্চের আলোয় প্রথম গুলিটি ফুটল। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটি গমক্ষেতে গিয়ে ঢুকল। তারপরই বসিরের হাতের লোহার রডটি ফটাস শব্দে নাসিরের খুলিতে পড়ল। টর্চ নিভে গেল। ফের জ্বললে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নাসিরের দিকে তাকিয়ে দুগারজি বললেন, 'ইঃ! ই কী রে! ইটা—'

বসির বলল, 'শ্যাষ করাই ভালো।'

দুগারজি ভাঙা গলায় বললেন, 'ইঃ! দুধ দিয়ে সাপ—শালা! দে, তাই দে। দিয়ে নদিতে ফেলে দিয়ে আয়। পরে দেখা যাবে। আর চান্টা, নৌকোতে দিয়ে আয় আমাকে। পা কাঁপছে বাপ!'···

ভোটের মুখে লাশ পড়ে বরাবর। এটা কোনো খবর নয়। কিন্তু খবর করা

হয়, নাসিরের ক্ষেত্রে। সে দুগারজির মাইনে করা লোক ছিল। খবর হয় মিটিং-গুলানে, হরেনমাস্টার মির্জার বেটিকে দিয়ে নাসিরকে টেনে এনে খতম করেছে। মির্জার বেটি টোপ ছিল। সাক্ষী ভৈরব? ভৈরব বলে, 'হঁ, সিটা মনে হয় বটে। আমার লৌকোয় মেয়েটোর উপারে যাওয়াও সত্যি। হুঁ—লেয্য কথা বলব। ডর কিসের?'

নেহাত আইনরক্ষার জন্য আইনরক্ষকরা মির্জার মেয়েকে গ্রেফতার করতে এসে দেখলেন, সে উঠোনের ডালিম গাছটিকে ওতপ্রোত কুপিয়ে কাটছে। গোড়াটা নির্মূল করার সময় আব্বাস দারোগা একটু হেসে বললেন, 'আসুন। আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

মির্জার মেয়ে বয়স সতেরো বছর। তাকে আপনি বলার হেতু নিয়ে লোকেরা মাথা ঘামাচ্ছিল। শেষে ধরে নিল, খান্দানি রক্তের প্রতি সম্মান। ন্যাড়া উঠোন জুড়ে ডালিম গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তারাবুড়ি সুর ধরে কাঁদে আর জড়ো করে। ফলগুলান টক আর তিতকুটে, সে জানে। এও জানে, নির্বাসিত জিনটি ঠাঁই বদলাতে বাধ্য।...

মানুষ ভূতের গল্প

আলোরানী হেরিকেনের দম কমিয়ে শুয়ে পড়তেই একটা ঘুম-ঘুম পুরুষশরীরের ফাঁদে আটকে যাচ্ছিল প্রায়, এমন সময়ে বাড়ির পেছনে খিড়কির দিকে কাঁপা-কাঁপা গলায় সন্দেহজনক ডাকাডাকি, 'ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম। ঘনা রে।'

এক ঝটকায় ফাঁদ ছিঁড়ে উঠে বসল আলোরানী। বাইরে বারান্দার খানিকটা দরমাবাতায় ঘেরা কুঠুরি। শাশুড়ি তারাদাসীর ডেরা সেখানে। তার ভয়কাতুরে চাপা ধমক শোনা যাচ্ছিল, 'যা। যা। ধুস্ ধুস্।' বয়স বাড়লে ঘুম কমে। কানও খর হয়। গাছগাছালি থেকে পাতা খসে পড়লেও শাসায়।

কিন্তু এটা কোনো পাতা খসার ঘটনা নয়, স্পষ্ট ডাকাডাকি এবং গলাটা অবিকল ঘনশ্যামের বাবা বটকেষ্টর। আলোরানীর ধাক্কা খেয়ে ঘনশ্যামের ঘুম ও প্রেম দুই-ই গেল। অভিমান করে বলল, 'কী মাইরি খালি—'

আলোরানী হেরিকেনের দম বাড়িয়ে চমকানো গলায় বলল, 'বাবার গলা মনে হচ্ছে যেন?'

এবার খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল ঘনশ্যাম। 'ছাড়ো তো। কোন শালা রাতদুপুরে মস্‌করা করতে এসেছে।' বলে সে বউকে ধরতে হাত বাড়াল। একটা ধস্তাধস্তি বেধে গেল।

সেই সময় আবার শোনা গেল, 'ও ঘনা। ঘনা রে।'

আলোরানীকে ছেড়ে ঘনশ্যাম লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। হাড়জ্বালানে মামলাবাজ বলে গাঁয়ে তার বাবার খুব বদনাম ছিল। আড়ালে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসাও করা হতো। কিন্তু আর তো লোকটা বেঁচে নেই। তাছাড়া বাবা খারাপ হতে পারে, ঘনশ্যাম মোটেও খারাপ নয়। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবার রেখে-যাওয়া মামলা-মোকর্দমা নিয়েও তার মাথাব্যথা নেই। অন্যপক্ষ এই এক মাসেই ঝটপট একতরফা ডিক্রি পেয়ে যাচ্ছে। ঘনশ্যাম লাঠি হাতে বেরুল। পেছনে হেরিকেন হাতে তার বউ আলোরানী। তারাদাসী দরমাবাতা এবং তেরপলের ভেতর থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, 'স্বভাব যায় না মলে।

সকালে গেন্থকে খবর দিস বরং।'

গেন্থ ভূতের বদ্যি। ঘনশ্যাম মায়ের মুখে গেন্থর নাম শুনে একটু ভড়কে গেল বটে; কিন্তু ফের করুণ স্বরে 'ঘনা রে' শুনে লাঠি বাগিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'কোন শালা রে?'

খিড়কির দরজার বাইরে থেকে অবিকল বটকেষ্টর গলা শোনা গেল, 'আমি রে, আমি। খামোকা শালাসমন্দি না করে দুয়োর খুলবি না কী? শীতে অবস্থা কাহিল একেবারে।'

ঘনশ্যাম হকচকিয়ে গিয়েছিল। আলোরানী ঠোঁট কামড়ে ধরে কী ভাবছিল। তার হাতে হেরিকেন। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দিল এবং যে লোকটি বাড়ি ঢুকল, সে অবিকল বটকেষ্ট।

সেই ময়লা ফতুয়া, খাটো ধুতি, কাঁচাপাকা গোঁফ, কাঁধে ব্যাগ। চোখে তেমনই জুলজুলে চাউনি, চালাক-চালাক ঝিলিক।

ঘনশ্যাম প্রচণ্ড আতঙ্কের চোটেই লাঠি তুলেছিল। বটকেষ্ট খপ করে ধরে ফেলে খাপ্পা মেজাজে বলল, 'হতচ্ছাড়া বাঁদর বাবার মাথায় লাঠি তুলতে হাত কাঁপল না? তখন থেকে ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল, আবার বাড়ি ঢুকতেই লাঠি। মারব গালে এক থাপ্পড়।'

ঘনশ্যাম লাঠি ছেড়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সেই আদি অকৃত্রিম বাবা মনে হচ্ছে, কিন্তু—

সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'ধুস্ শালা। তাহলে ধার-দেনা করে কার বডি পুড়িয়ে এলাম?'

বটকেষ্ট থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'পুড়িয়ে এলি মানে?'

ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল, 'বেড খালি দেখে খোঁজ করলাম। বলল, মগ্‌গে গিয়ে দেখুন।' বটকেষ্ট হতভম্ব হয়ে বলল, 'মগ্‌গে গিয়ে আমাকে দেখলি?'

'তাই তো মনে হলো।' ঘনশ্যাম মিনমিনে স্বরে বলল, 'হাসপাতালের লোকেরাও বলল। তা ছাড়া বডি ফুলে ঢোল।'

বটকেষ্ট এতক্ষণে একটু হাসল। 'আর বলিস নে। হাসপাতালের যা খাবার। গত জন্মের ভাত উঠে আসে পেট থেকে। কাঁহাতক আর সহ্য হয়। শেষে কেটে পড়লাম।'

আলোরানী মুখ টিপে হাসছিল। গৃহবধূর গলায় বলল, 'গরম জল করে দিই। হাত-মুখ ধুয়ে নিন।' তারপর শ্বশুরের পায়ে ঢিপ করে প্রণামও ঠুকল।

বটকেষ্ট আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, 'আগে এক কাপ চা। রায়পুরে খগেনের বাড়ি খ্যাঁট দিয়ে বেরিয়েছি।' বলে ছেলের দিকে ঘুরল। 'মাথা ন্যাড়া করেছিলি দেখছি। তার মানে, বাপের ছেরাদ্দও করেছিস। হাঁদারাম।'

তারাদাসী তার ডেরায় চুপচাপ ছিল। হঠাৎ তার ফোঁপানি শোনা গেল। আলোরানী বলল, 'আঃ। চুপ করুন তো। রাতদুপুরে কেলেংকারি করবেন না।'

বউমার তাড়ায় তারাদাসী থেমে গেল। ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল, 'কেলেংকারি হবেই সকালে, গাঁসুদ্ধু হইচই পড়ে যাবে। তুমি মাইরি খালি ঝামেলা বাড়াও—কোনো মানে হয়? হাসপাতালে ভালো লাগল না তো বাড়ি চলে আসবে। তা নয়, এক মাস নিপাত্তা। এদিকে কোন শালার বডির মুখে আগুন দিয়ে—ধুস্।'

বটকেষ্ট আস্তে বলল, 'চেপে থাক্ দিনকতক। কাকপক্ষীটিও যেন টের না পায়।' বলে সে বারান্দায় উঠল। 'বিধবা' স্ত্রীর উদ্দেশে ফিক করে হেসে বলল, 'কী? গোঁসাঘরে খিল দিলে নাকি? যা-যা বলতাম, ঠিক-ঠাক মিলে গেছে তো? বলেছিলাম না ঘনা ঘরে ঢুকবে আর তোমাকে এই পায়রার খোপে ঢোকাবে?'

ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠল। 'না জেনে খামোকা যা-তা বোলো না। মা নিজেই বলল, তোরা ঘরে থাক। আমাকে বাইরে দে।'

মামলায়-মামলায় প্রায় সর্বস্বান্ত বটকেষ্ট বউমা আর ছেলের জন্য বারান্দায় এই ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করেছিল। আশা ছিল, হরেনের সঙ্গে টুকরো জমি নিয়ে মামলায় তার জয় হবে এবং তাই বেচে পাশে একখানা ঘর তুলবে। কিন্তু হাকিমের অভাবে আদালতে নাকি মামলার পাহাড় জমে উঠেছে।

বটকেষ্ট হেরিকেনটা তুলে তেরপলের পর্দা ফাঁক করে তার 'বিধবাকে' দেখতে গেল। কিন্তু তারাদাসী লেপমুড়ি দিয়েছে। বটকেষ্ট খ্যা খ্যা করে বলল, 'ঢঙ। বিধবা হয়েছ তো বিধবা হয়েই থাকো। ছেরাদ্দ-হওয়া লোকের বউ। যাগযজ্ঞ করে গণ্ডা কতক বামুন খাইয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, জানো তো? বউমা, আমাকে এখানেই বিছানা করে দিও!'

ঘনশ্যাম পিতৃভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল, 'না, না। তুমি ঘরে শোবে। আমরা বরং এখানেই শোব। এখনও তত শীত পড়েনি!...'

সকালে শাশুড়ির সাড়াশব্দ না পেয়ে আলোরানী তেরপলের পর্দা তুলেছিল।

তারাদাসীর বিছানা খালি। বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরেও পাত্তা পেল না। গাঁয়ের একটেরে বাড়ি। পড়শিদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এল আলোরানী। কেউ দেখেনি তারাদাসীকে। তখন উদ্বিগ্ন ঘনশ্যাম বেরুল মায়ের খোঁজে।

কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে সে গম্ভীর মুখে বলল, 'জগা বলল, ভোরের বাসে মাকে চাপতে দেখেছে। বাবাকে মাইরি কী বলব? খালি ঝামেলা বাড়ানো স্বভাব।'

ঘরের ভেতর তক্তাপোশে বসে বটকেষ্ট চা খাচ্ছিল এবং পুরনো পোকায় কাটা দলিল-পরচা দেখছিল। ছেলের কথা কানে যেতেই চাপা গলায় ডাকল, 'ঘনা। শুনে যা।'

ঘনশ্যাম বারান্দায় উঠে বলল, 'বলো।'

'তোর মা কেটে পড়েছে তো?' বটকেষ্ট বাঁকা হাসল। 'জগা বলল না কোন বাসে চাপতে দেখেছে?'

'সাঁইথের বাসে। কেন?'

বটকেষ্ট তারিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমি ভাবছিলাম হাসপাতালে গিয়ে ঢুকবে নাকি। সাঁইথে যাওয়া মানে রোঘোর বাড়ি। যত্নআত্যি পাবে। তোর মায়ের কিছু কিছু ব্যাপারে বেশ টনটনে বুদ্ধি। আয়, বস্ এখানে।'

ঘনশ্যাম অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বসল। সিন্দুক থেকে এসব পোকায় কাটা কাগজপত্তর বের করে খুঁটিয়ে দেখা তার মামলাবাজ বাবার বরাবরকার অভ্যাস। মুখ তেতো করে বলল, 'আবার ওই মড়া ঘাঁটতে বসেছে?'

'স্বভাব যায় না মলে।' বটকেষ্ট ফিক করে হাসল। 'তোর মা কাল রাত্তিরে বেশ বলছিল। তোর মায়ের কথাটা মনে ধরার মতো। তুই ছেরাদ্দ করে ন্যাড়া হয়েছিলি। তোর মা শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে বিধবা হয়েছে। তার মানে, আমি এখন মরা মানুষই বটে। কাজেই চেপে যা।'

'চাপবটা কী?' ঘনশ্যাম জানতে চাইল। বটকেষ্ট জুলজুলে চোখে ঝিলিক তুলে বলল, 'কাল রাত্তিরে বললাম কী তোকে? আমি যে বেঁচেবত্তে আছি, একেবারে চেপে যা।'

'হুঁ, তারপর?'

'তেঁতুলতলার জমিতে একখানা ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে আয়।'

ঘনশ্যাম জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ? হন্নাদা আমার

বড়ি ফেলে দেবে। কলাই বুনে কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে—নিজে গিয়ে দেখে এসো গে না।'

বটকেষ্ট একটু ভেবে বলল, 'কাঁটার বেড়া দিয়েছে নাকি? যাচ্চলে। মামলা এখনও ঝুলে আছে। মগের মুলুক পড়ে গেছে দেখছি। তোর বাধা দেওয়া উচিত ছিল।'

ঘনশ্যাম চটে গেল। 'তুমি গিয়ে ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে দেখ না, কী হয়। হন্নাদা এখন গাঁয়ের মাথা হয়েছে। পঞ্চায়েতের মেম্বার। এসব আমার দ্বারা হবে না।'

'তুই একটা অকম্মা।' বটকেষ্টও চটল। 'তোরই ভালোর জন্য চিন্তা-ভাবনা করে বাড়ি ফিরে এলাম। নৈলে অ্যাদ্দিন গয়া-কাশী-মথুরা করে দিব্যি ঘুরে বেড়াতাম। সংসারে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, জানিস?'

ঘনশ্যাম আঙুল খুঁটতে থাকল।

বটকেষ্ট চাপা গলায় ডাকল, 'বউমা! শোনো তো!'

আলোরানী মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকল। সে বারান্দা থেকে কান করে সব শুনছিল। বলল, 'কাকে কী বলেছেন? সেদিন তালপুকুরের মাছ ধরে সব্বাই যে-যার ভাগ নিয়ে বাড়ি ঢুকল। মাঝখান থেকে আমি চ্যাচামেচি করে গলা ভাঙলাম। আপনার ছেলে উল্টে আমাকে বকাঝকা করে ঠেলতে ঠেলতে—'

'বাজে কথা বোলো না!' ঘনশ্যাম বাধা দিয়ে বলল, 'মেয়েছেলে—অপমান করে বসলে খুব ভালো হতো? চারটে পুঁটিমাছের জন্য ঝামেলার মানে হয় না।'

'পুঁটি নয়, বাবা!' আলোরানী শ্বশুরকে হাত তুলে মাছের সাইজ দেখালো। 'এত-এত বড়ো পোনা।'

বটকেষ্ট গলার ভেতর বলল, 'এক আনার শরিক আমি। আচ্ছা দেখছি। ফিরে যখন এসেছি, একটা এস্পার-ওস্পার না করে ছাড়ছি না।'

আলোরানী শ্বশুরের সায় পেয়ে উৎসাহে বলল, 'জানেন বাবা? হাসপাতালের ব্যাপারটাতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল। যত বলি, কাকে দেখতে কাকে দেখেছ, তত বলে, আমাকে বাবা চেনাচ্ছ?'

বটকেষ্ট অভিমানী শ্বাস ফেলে বলল, 'আমাকে যদি চিনবে, তাহলে এ অবস্থা হয়? যাক্ গে। বউমা, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই। ঘনার দ্বারা কিস্যু হবে না।'

আলোরানী ঝটপট বলল, 'ঝাণ্ডা পুঁততে হবে তো? পুঁতে আসব। আমি সব পারি—আপনি কিছু ভাববেন না।'

ঘনশ্যাম নড়ে উঠল। 'মারা পড়বে বলে দিচ্ছি। মেয়েছেলের এত সাহস ভালো নয়। শালা হন্নাদাটা বড্ড ঢ্যামনা!'

খপ্ করে তার কান ধরে বটকেষ্ট ঝাঁকুনি দিল। 'চো-ও-প্! কাল রাত্তির থেকে শুনছি আমার মুখের সামনে খালি শালা-টালা মুখখিস্তি। একটা মাস আমি ছিলাম না, তাতেই এই? সত্যি-সত্যি মলে মুখ থেকে নাদি বেরুবে হতচ্ছাড়ার।'

ঘনশ্যামের পিতৃভক্তির মূল কারণ, ছোটবেলা থেকেই তার কাছে বাবা একটা বিপজ্জনক সাংঘাতিক জিনিস। তা ছাড়া বটকেষ্টর এক সময় গাঁয়ে প্রচণ্ড দাপটও ছিল। বউয়ের সামনে কান ধরায় অপমানের চোটে ঘনশ্যাম শেষ পর্যন্ত কী আর করে, খি খি করে হাসতে লাগল।

আলোরানী একটু লজ্জা পেয়েছিল অবশ্য। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘনশ্যাম বলল, 'খুব হয়েছে। কান ছাড়ো, বেরুব।'

কান ছাড়ার সময় শেষ ঝাঁকুনি দিয়ে বটকেষ্ট বলল, 'যেখানে যাবি যা। তোর আশা কখনও করিনি, করবও না। কিন্তু সাবধান, আমার কথা চেপে রাখবি। চাউর করলেই কী হবে, জানিস?'

উঠে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম বলল, 'বাড়ি থেকে বের করে দেবে তো? দিও।'

'না।' বটকেষ্ট শক্ত মুখে বলল। 'তাহলে সত্যি-সত্যি মরব।'

ঘনশ্যাম একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

মাথার ওপরকার কড়িকাঠ দেখিয়ে বটকেষ্ট বলল, 'ওখান থেকে ঝুলব বুঝতে পারছিস তো? একহাত জিভ বের করে ঝুলে থাকব।'

ঘনশ্যাম ভয় পেয়ে জিভ কেটে বলল, 'ধুস্! খালি আজেবাজে কথা।'···

বটকেষ্টর মরার খবর পেয়ে হরেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। টুকরো জমিটা নিয়ে জ্ঞাতি বটকেষ্টর সঙ্গে তিন বছর মামলা চলছিল। জমিটার তিন দিকে আগাছার জঙ্গল, একদিকে কয়েকটা ঝাঁকড়া প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। তার ওধারে একটা পুকুর। ভাদ্রমাসের ধান তুলতে থানাপুলিশ হয়ে গেছে। সেই ফৌজদারি মামলাও ঝুলছে আদালতে। আশ্বিনে হঠাৎ কী অসুখে ভুগে বটকেষ্ট শহরের হাসপাতালে গেল এবং মারাও পড়ল। শ্রাদ্ধে দয়া করে হরেন ঘনশ্যামকে কিছু নগদ টাকাকড়িও দিয়েছে। শর্ত হলো, ঘনশ্যাম আদালতে যাবে না। তারপর হরেন জমিটাতে কলাই বুনে দিয়েছে। সারের জোরে দেখতে দেখতে ঝাঁপালো সবুজ

হয়ে উঠেছে জমিটা। গোরু-ছাগলের বড়ো উপদ্রব এদিকটাতে। তাই কাঁটা-ঝোপের বেড়া দিয়েছে। এবেলা-ওবেলা এসে একবার করে দেখে যায় হরেন। তার কাছে খুব গর্বের জিনিস এই মাটিটুকু।

বিকেলে বাসরাস্তার ধারে গজার দোকানে হরেন চা খাচ্ছিল। সেই সময় তার মেয়ে পান্তি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, 'বাবা! শিগগির এস। তেঁতুলতলার কলাইয়ের ক্ষেতে ঘনাকাকার বউ ঝাণ্ডা পুঁতেছে।'

ঝাণ্ডা পোঁতার ব্যাপারটা পাড়াগাঁয়ে ইদানিং রীতিমতো ঘটনা। কিন্তু হরেনের বিশ্বাসই হলো না। ঘনশ্যাম তার বাবার মতো নয়। কোনো ঝামেলায় থাকে না। তবে তার বউটা একটু তেজি, একথা ঠিকই। তাই বলে তার ঝাণ্ডা পোঁতার সাহস হবে, এটা অবিশ্বাস্য—এবং সেও কিনা হরেনের দখল করা কলাইবোনা জমিতে?

হরেন বলল, 'যাঃ!'

'সত্যি বাবা!' পান্তি চোখ বড়ো করে বলল, 'মা দেখেছে। আমি দেখলাম। মা বলল, শিগগির তোর বাবাকে খবর দে।'

হরেন হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'বাড়ি যা দিকি! কাজ নেই কম্ম নেই, খালি পাড়া-বেড়ানো। ঝাণ্ডা পুঁতেছে তো কী হয়েছে? বাড়ি যাবার সময় উপড়ে ফেলে দিয়ে যাব।'

পান্তি মনমরা হয়ে চলে গেল। জগা বলল, 'পেছনে লোক জুটিয়েছে হে হরেন! নৈলে ঘনার বউয়ের এত সাহস হতো না।'

হরেন চটে গিয়ে বলল, 'তুমিও মাইরি যেন কী! লোক জোটাবে! এত শস্তা? লোক জোটাতে হলে মালকড়ি দরকার। ঘনার হাঁড়ির অবস্থা ঢনঢন। কালই দেখবে মুনিশ খাটতে নেমেছে!'

জগা বলল, 'তোমার বেপার্টির লোক হলেই জুটবে। আজকাল তো এরকমই হয়েছে।'

গোঁ ধরে হরেন বলল, 'বেপার্টি? এ গাঁয়ে আমার বেপার্টি হবে কোন শালা? সবগুলোকে তো দেখলাম। পায়ের তলায় এসে মুণ্ডু কাত করেছে। মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই—বটকেষ্ট সম্পর্কে জ্যাঠাও ছিল বটে, তবে সেও গেছে, সব ঠাণ্ডাও হয়েছে।'

জগা কথা বাড়ালো না। চায়ের দোকানে এ সময়টা খদ্দেরের ভিড় বেড়ে যায়।

চা শেষ করে হরেন উঠল। কিছুক্ষণ দোনামনা করে রাস্তার নয়ানজুলির দিকে ঘুরল। শর্টকাটে যাওয়ার পথে বাধা নয়ানজুলির জল। শেষ বেলার আলোর গায়ে কুয়াশার ছাপ পড়েছে। এখান থেকে তেঁতুলতলার জমিটা দেখা যায় না। অনেকটা ঘুরে বাঁধের ওপর দিয়ে মাঠে নামল হরেন। গাঁয়ের শেষ দিকটায় ঘন গাছগাছালি। জমিটার কাছাকাছি যেতে দিনের আলো কমে এল আরো।

তেঁতুলতলা পৌঁছেই চোখ জলে গেল হরেনের। সত্যিই কলাইয়ের জমির মাঝখানে পোঁতা কঞ্চিতে লটকানো একটা ঝাণ্ডা। খুঁজতে খুঁজতে একখানে কাঁটার বেড়া ওপড়ানোও চোখে পড়ল। হরেন হুঙ্কার দিল, 'তবে রে হতচ্ছাড়ি।' হুঙ্কারের লক্ষ্য ঘনশ্যামের বউ।

তারপর সে মসমস করে জমিতে ঢুকে ঝাণ্ডাটা ওপড়াল। কঞ্চিটা দুমড়ে মুচড়ে এবং কাপড়ের ফালিটা ফালাফালা করে ছুঁড়ে ফেলল জমির বাইরে। আগের মতো কাঁটার বেড়ার ওপড়ানো অংশটা কোনো রকমে আটকে সে তেঁতুলতলায় উঠে এল। রাগী চোখে তাকিয়ে রইল জমিটার দিকে।

ঠিক এই সময়ে তেঁতুলগাছের ওপর থেকে কেউ ডাকল, 'হন্না নাকি রে! ও হন্না!'

হরেন ভীষণ চমকে উঠেছিল। মাথার ওপরকার ঘন ডালপালার ভেতর থেকে চেনা—খুবই চেনা গলায় কেউ তাকে ডাকছে। হরেন মুখ তুলতেই আবছা আঁধারে একটা মূর্তিও দেখল, একটু ওপরে মোটা একটা ডালে বসে দুটো ঠ্যাং দোলাচ্ছে। হরেন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'কে কে?'

বটকেষ্ট দুটো ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে বলল, 'ন্যাকা, চিনেও চিনতে পারছিস না—কে কে করছিস? সোজা ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তারপর ঘাড়টি মটকে দেব। আর কখনো যদি এই জমির তল্লাটে দেখেছি তো—'

হরেন বনবাদাড় ভেঙে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটু পরে বটকেষ্ট চাপা গলায় ডাকল, 'বউমা! মইটা নিয়ে এস। নামি।'

আলোরানী একটু তফাতে হাল্কা একটা মই নিয়ে আড়ালে বসে ছিল। এসে শ্বশুরকে গাছ থেকে নামালো। বটকেষ্ট খি খি করে হেসে বলল, 'খুব জব্দ হয়ে গেছে হন্না। চলো, এখনই এখান থেকে কেটে পড়া ভালো।'...

একটু রাত করে ঘনশ্যাম ফিরল। মুখটা গম্ভীর। বউকে দেখে বলল, 'বাবা কী যে

ঝামেলা করে মাইরি! সন্ধ্যাবেলা হন্নাদা তেঁতুলগাছে নাকি বাবাকে দেখেছিল। বাড়ি ফিরে অজ্ঞান হয়ে যায়। শেষে একদঙ্গল লোক লাঠিসোটা টর্চ হ্যাসাগ নিয়ে তেঁতুলতলায় খুব খোঁজাখুঁজি করেছে। খবর শুনেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমি তো ভয়ে সারা। একটা কিছু সন্দ করে আমাদের বাড়ি এলেই কেলেঙ্কারি হতো।'

আলোরানী নির্বিকার মুখে বলল, 'হতো না।'

'হতো না মানে?' ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠল। 'এসেই বাবাকে দেখতে পেত। তারপর—'

'বাবা তখনই চলে গেছেন।'

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বলল, 'সে কী!'

'রায়পুরে রাত্তিরে থাকবেন। সকালে ওখান থেকে সাঁইথে চলে যাবেন।'

আলোরানী মুখ টিপে হাসছিল। ঘনশ্যাম একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'মা যদি ছোটমামার বাড়ি গিয়ে থাকে আর বাবা সেখানে হাজির হয়, আবার এক ঝামেলা।'

আলোরানী বলল, 'কিসের ঝামেলা?'

'ধুস্! বোঝো না কিছু।' ঘনশ্যাম বিরক্ত হয়ে বলল। 'মা তো বিধবা হয়ে আছে এখনও!'

আলোরানী হাসতে লাগল। 'সে তুমি ভেবো না। তোমার মা সব শাড়ি-গয়না গুছিয়ে নিয়েই গেছেন। কিচ্ছু খুঁজে পাইনি ওঁর ঘরে। আর শাঁখা-সিঁদুর? বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।'···

রানীরঘাটের বৃত্তান্ত

রানীরঘাট যাচ্ছি শুনে মফস্বলের বাসে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন—রানীরঘাট যাবেন? দেখবেন মশাই, মহা ত্যাঁদোড় জায়গা। সাবধানে থাকবেন।

—কেন বলুন তো?

—প্রবাদ শোনেননি 'রানীরঘাটে কে কার বাবা?'

শুনিনি। তবে আমাদের গাঁয়ের পাশে এক বড়ো গাঁ গোকর্ণ। সারা রাঢ় অঞ্চলে তার নামে প্রবাদ ছিল শুনেছি—'গোকর্ণে কে কার মেসো!' সব চালু প্রবাদের পেছনেই একটা গপ্পো থাকে। এক্ষেত্রেও ছিল। তখন নাকি ঠ্যাঙাড়েদের যুগ। আক্রান্ত পথিক অন্ধকারে ঠ্যাঙাড়েকে চিনতে পেরে মেসোমশাই বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ঠ্যাঙাড়ে তার গলায় বাঁশ চেপে মুণ্ডু উল্টে দিয়ে বলেছিল—'গোকর্ণে কে কার মেসো!'

নিছক গপ্পো হতে পারে, নাও পারে। হয়তো সে-আমলের মাৎস্যন্যায়কে বোঝাতেও এমন গপ্পোর উদ্ভব। কিন্তু রানীরঘাটের বেলায়ও তো একটা গপ্পো থাকার কথা। কী সেটা? খোঁজ-খবর করতে গিয়ে দেখি, গপ্পোর নায়ক আমার রীতিমতো চেনা।

সেই গপ্পোটাই অবিকল শুনিয়ে দিচ্ছি। এতটুকু রঙ চড়াচ্ছি না। বরং যতটা রঙ ছিল, ঘষে একটু ফিকে করেই দিলুম। ঈষৎ ধূসর দেখাক্ না! কিন্তু দার্শনিকতা না, মরাল না, হাতের তালুর মতো স্পষ্ট ব্যাপার। আজকাল জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলে লোকে অপমানিত বোধ করে। বিপুলা পৃথ্বীর নিরবধি-কালের কতটুকুই বা জানি যে জ্ঞান দেব?

আরো একটা কথা। নিজেকে গপ্পোর মধ্যে ঢুকিয়ে এক নিরাসক্ত কিংবা ক্রান্তদর্শী চরিত্র করে তোলার লোভও অতিকষ্টে সংবরণ করেছি। যদিও তাই রেওয়াজ।

সে অনেক বছর আগের কথা।...

নদীর ওপারে এক শহর, এপারে এক ঘাট। তার নাম রানীরঘাট। নদীর নাম ভাগীরথী। লোকেরা বলে মাগঙ্গা। মাগঙ্গার কোলে ছোট্ট মেয়ের মতো রানীরঘাট হেসেখেলে দিন কাটায়। গাঁয়ের মেয়ের চোখে শহরের ঘোর লাগা ভাবটুকুও চোখে না পড়ে পারে না। কিন্তু শুধু ওই আলতো ঘোরটুকুই ছিল তখন, আর কিছু না।

একটা বাসস্ট্যাণ্ড ছিল। কয়েকটা ছোটোখাটো দোকান ছিল। রিকশো খান পাঁচেক। এক সময় ঘোড়ার গাড়িও ছিল। সারাদিন বাইরের মানুষের ভিড়ে হইচই বড়ো বেশি। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতে ভিড় কমে যায়। শেষ বাস ছেড়ে যায় সাড়ে সাতটাতেই। বাঁশবনে শেয়াল ডাকে। তক্ষক ডাকে। পেঁচা ডাকে শিমূল গাছে। নিঃঝুম রাতে ঘাটের ধারে আটচালায় একটা লণ্ঠন। কাদের চাপা গলায় গপ্পসপ্প। আর মাঝে মাঝে ঘাটের ইজারাদার চৌবেজীর চেরা গলায় হাঁক—শম্ভুয়া—আ—আ! শেষ খেয়া ফিরতে হয়তো দেরি করছে।

সেবার শীতে জেলাবোর্ডের সেন্সাসের বাবুরা এসে আধঘণ্টাতেই রানীরঘাটের গণনা শেষ করে ফেলেছিলেন। রোদে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে একজন হঠাৎ তামাশা করে বললেন—আরে, ওই পাগলীটা যে রয়ে গেল! লিখে নাও।

আটচালার ধারে বসে পাগলীটা তখন যাকে দেখছে, চেঁচাচ্ছে—ও বাবারা! ওগো বাবারা! সবাইকে ওর বাবা বলা অভ্যেস! কিন্তু বাবা বলে ডাকছে কেন, কী বলতে চায়, বোঝা যায় না। ভিক্ষে দিলেও তো ছুঁড়ে গায়ে ফেলে দেয়।

পাশের তেলেভাজার দোকান থেকে ময়রাবুড়ি ফিক করে হেসে বলল—তা লিখে নেবেন তো নিন বাবুরা। লিখুন, সুরেশ্বরী। লোকে বলে সুরিক্ষেপী! সেও তো একটা মানুষ বটে। রানীরঘাটে সাত বছর আছে। সবার নাম লিখলেন, ওর কেন লিখবেন না?

প্রথম বাবু বললেন—আর কে আছে ওর?

—আবার কে থাকবে? যে-যা দয়া করে দেয়, খায়। আটচালাতে ঘুমোয়।

দ্বিতীয়বাবু দেখছিলেন সুরিক্ষেপীকে। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বললেন—মেয়েটা মনে হচ্ছে প্রেগন্যান্ট্! স্ট্রেঞ্জ!

প্রথমবাবু হেসে ফেললেন—ভাগ্! তুমি তো ব্যাচেলার। কিসে বুঝলে?

—এসব বুঝতে বিয়ে করা লাগে না। দেখ না, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য থিং।

সুরিক্ষেপী ছেঁড়া নোংরা শাড়িটা সামলাতে পারে না। অথচ মাথায় ঘোমটাটি থাকা চাই-ই। প্রথমবাবু দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন—সত্যি তো! মানুষ মাইরি এখনও জানোয়ার।

ময়রাবুড়ি ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভারি গম্ভীর হলো। গোমড়ামুখে বলল—মাগঙ্গার চোখের সামনে এই পাপ। সইবে ভেবেছেন? দেখুন না কী হয় পেলয়-কাণ্ড! রানীরঘাট ভেসে যাবে। ধুয়ে মুছে যাবে। বেঁচে থাকলে দেখে যাব।

দ্বিতীয়বাবু হো হো করে হেসে বললেন—ও বুড়িমা, কী করে দেখবে? তুমিও তো ভেসে যাবে!

বুড়ি বিকৃত মুখে গরম তেলে বেগুনি ছাড়ল। চড়চড় করে আওয়াজ হতে থাকল। কনুই গড়িয়ে জলের ফোঁটা পড়েছে বুঝি। বাবুর কথার জবাব দিল না। পাপের শাস্তি নিজের হাতে দিচ্ছে যে।

প্রথমবাবু চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলল আকন্দের ঝোপে। পা বাড়িয়ে আবার রসিকতা করল।—তাহলে লিখতে হলে দুটো নামই লেখ। সুরেশ্বরী না কী বলল যেন, আর তার পেটে যেটা আছে।

—ছেলে হবে, না মেয়ে হবে তার ঠিক নেই। দ্বিতীয়বাবু সিগারেট ধরিয়ে পা বাড়ালেন।

—একটা কমন নাম দেওয়া যাক্।

—মাথায় আসছে না।

—অজস্র আছে, অজস্র। শোন বলছি। উষা, পার্বতী, রেণু, উমা…আঙুল গুনতে গুনতে প্রথমবাবু বললেন। ক'টা হলো? দাঁড়াও, আরো বলছি। রমা।…

সুরি পাগলী চেঁচিয়ে উঠল—বাবারা! ও বাবারা! ওগো বাবারা!

ঘাটের ধারে উঁচু পাড়ে ঘাটের ইজারাদার চৌবেজীর গদি। পুর্ণিয়ার লোক। এ ঘাটে আছেন চৌদ্দ বরষ। যখন এসেছিলেন, তখন চুল ছিল কুচকুচে কালো। এখন অর্ধেক পেকে গেছে। ফি-সাল জষ্ঠি মাসের সংক্রান্তিতে গঙ্গাপুজোর মেলার দিন ন্যাড়া হন। ময়না পোষার শখ খুব। খাঁচাটা সামনে ঝুলছে। রাম নাম শেখান সকাল-সন্ধ্যা। নিজে পড়েন তুলসীদাসের রামচরিতমানস। কালেকটরিতে এ বছর একইশ হাজার রূপেয়া গুনে দিয়ে ঘাট জিতেছেন। আনা-আনা পারানি। তবে বিলাঞ্চলের যুবতী মেছুনীদের বেলা আনাকড়ি নয়, রাতের জলের ফসল ঝকঝকে রাইখয়রা মাছ। চৌবেজী মাছও খান, মাংসও খান। খৈনি ডলেন, গড়গড়াও টানেন। গদিতে কোলে তাকিয়া নিয়ে বসে ভাঙা

উচ্চারণে গানও গেয়ে ওঠেন—'কেম্‌নে এ গঙ্গা হোবো পার / হামি জানে না সাঁতার।' মাছের গন্ধ লাগা বেলুন-বেলুন বুক খিলখিল হাসিতে ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে।—ওত্তা হাসো মাৎ রী! ফাট্‌ যায়গা।

—ঘাটোয়ারিবাবু না ঘাটের মড়া! কোথায় শিখলে এমন গান! আ ছি ছি!

আর ফচকেমির সময় নেই। শম্ভু মাঝি ডাক দিয়েছে—এ অষ্টসখী রাধিকে সুন্দরীরা!...

ওদিকে ডাক দিয়েছে ইসমাইল ড্রাইভারের বাসও। হর্নের ভ্যাঁক ভ্যাঁক আওয়াজ চলে যাচ্ছে নদী পেরিয়ে ওপারের ঘাটে।—পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। ছেড়ে গেল, ছেড়ে গেল। সবুজ বাসের ভেতরে লোক, বাইরে লোক, ওপরে লোক। অলীক ফলন্ত বৃক্ষ হেলতে দুলতে যাবে। রাস্তা মহা ফক্করবাজ।

—বাবারা! ওগো বাবারা! ও বাবারা! সুরিক্ষেপী মাটিতে থাপ্পড় মেরে সেই হাত কপালে আনে। আবার মাটিতে থাপ্পড়। ধুলোয় কপাল ধূসর।

ময়রাবুড়ি চেঁচায়—চুপ! চুপ! গলায় দেবো গরম তেল ঢেলে! লজ্জা করে না বড়ো গলা করে চ্যাচাতে? তখন কোথায় ছিল এ গলা? চিহির-পোকার (শ্রীহরি) কামড় খেয়ে বোবা হয়েছিলি?

মাঘের শেষে রানীরঘাটে শিমুলের ডালপালায় যেন হাজার অলীক বনমোরগ উড়ে এসে বসেছে। লাল লাল ঝুঁটি। ফাল্গুনে তাদের সাদা পালক উড়ে পড়ে মাগঙ্গার বুকে। স্বচ্ছ কালো জল বালির চরে মাথা কুটে কুটে পথ প্রার্থনা করে। যেতে পায় কী পায় না! শ্যাওলায় ঠোঁট ঘষে বেড়ায় মৌরালার ঝাঁক। প্রতিমার খড়বাঁশের টাট উল্টে গেছে যে স্রোতে, তা এখন স্মৃতি এবং পরবর্তী প্রতীক্ষা। মড়াখেকো দাঁড়কাক এসে সেই টাটে বসে সবাইকে খেতে ডাকে—খা খা! ময়রাবুড়ি তাই শুনে বলে—ওই ঘাটের মড়াটাকে খা। এ ঘাটে অনেক মড়া। কোন মড়ার কথা বলে দাঁড়কাক জানে না। সুরিক্ষেপীকে বুড়ি এনেছে চান করাতে। বুড়ির হাতে কঞ্চি। কঞ্চিটা নাচাতে নাচাতে বলে—ভালোমানুষের বেটি হবি তো বস্‌। বসে পড় জলে। তাই বলে ওকে ছোঁবে না বুড়ি। নিজে-নিজেই চান করতে হবে সুরিক্ষেপীকে। তাই আবার স্নান। পা ছড়িয়ে আঘাটার জলে বসে কপাল থেকে জলের দিকে এবং জলের দিক থেকে কপালে হাত।—বাবারা! ওগো বাবারা! জল বলে ধুলোমাখা কপাল ধুয়ে যায়, এটাই এখন

সুবিধে। বুড়ি বলে—হাতখানা বুকে দে লো, বুকে দে। বাবারা বলে বুকে দে দিকিনি।

শীতটা চলে গেল। গ্রীষ্ম এল। ঘাটের ধারে আকন্দঝাড়ে ফুল ফুটল। ঘাটোয়ারিজী গঙ্গাপুজোর দিন ন্যাড়া হলেন। আটচালায় সুরিক্ষেপীকে আড়-চোখে দেখে দয়া করে ভাত পাঠিয়ে দিলেন। এবছর অচানক দশ হাজার টাকা বেড়ে গেছে ইজারার দর। তাই বলে চৌবেজী রানীরঘাট ছাড়বেন না। বুড়ো হয়ে মরবেন, তখন কেউ গদি দখল করুক। বড়ো মায়া বসে গেছে রানীরঘাটে।

বর্ষায় এক রাতে তুলকালাম বৃষ্টি। তার মধ্যে সুরিক্ষেপীর বাচ্চা হলো আটচালায়। কজন দূর গাঁয়ের গাড়োয়ান গোরুমোষের গাড়ি নিয়ে এসে আটকে পড়েছিল। তারাই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ছুটোছুটি করে অবশেষে ময়রাবুড়িকেই পেল। মানুষের জন্মটা ওইসব গেঁয়ো গাড়লদের কাছে নিশ্চয়ই খুব দামি। তারা একটা হ্যারিকেন দিল পর্যন্ত। আটচালার কোনটাও কাপড় টাঙিয়ে ঘিরে দিল। মেয়েমানুষের আর্তনাদ শুনে তাদের হৃদয় গলে যাচ্ছিল। বৃষ্টি না থাকলে তারা এ-সময় দূরে সরে থাকত। মানুষের জন্ম তাদের কাছে বড়ো পবিত্র ঘটনা। তারা একে সম্মান দিতে চাইছিল। কিন্তু বৃষ্টি! আর বুঝি সময় ছিল না বর্ষাবার। তারা বর্ষার বাপান্ত করছিল।

ময়রাবুড়ি বলল—আগুন চাই যে এখন। দেখ্‌ দিকি, এ অসময়ে গুখেকোর বেটি এ কী করে বসল!

গাড়োয়ানরা ঘাটোয়ারিবাবুর গদি থেকে শুকনো লকড়ি এনে দিল। একটু পরে শোনে, ওঁয়া ওঁয়া কান্নাকাটির মধ্যে বুড়ি হেসে হেসে আদর করছে—এ রাঙা টুকটুক কোত্থেকে এল রে! এ ভাঙা ঘরে চাঁদের হাট কোন মুখপোড়া বসালে রে! একে আমি কোথায় রাখব রে! আহা হা, যেমন নাক তেমনি চোখ। যেমন মুখের গড়ন, তেমনি রঙ। ওরে ছোঁড়া, এ মুখ তুই কোথায় পেলিরে?…

সে এক দীর্ঘ পদ্য, ছড়ায় সুরে গেয়। রানীরঘাটে সকাল হতে না হতে সুখবর পড়ল ছড়িয়ে। তখনও ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নামগন্ধ নেই কোথাও। রানীরঘাটের স্থায়ী জনসংখ্যা বাড়ল, এই যথেষ্ট। প্রসূতিকে কড়া চা খাইয়ে-খাইয়ে ঢোল করার অবস্থা। ময়রাবুড়ি চোখ পাকিয়ে কপট ধমকায়। বাসের লোক রিকশোর লোক, আর যতসব উটকো লোকের ঝামেলা সে ছাড়া আর কে সামলাবে? সে আঁতুড় আগলে দাঁড়িয়ে বলে—কী দেখার আছে? অ্যাঁ? কারও মা-বোন বিয়োইনি?

সেন্সাস বাবুদ্বয় অনেকগুলো নাম আওড়ে গিয়েছিল। রানীরঘাট নিল না। আদর করে নাম দিল ফালতু। আসলে এতকাল যেন কাজের মতো কাজ, কিংবা খেলার মতো একটা চমৎকার খেলা পাচ্ছিল না কেউ। এতদিনে পেল। পেল তো এমনভাবে পেল যে হুজুগের মাত্রাটা গেল বেড়ে। ছোকরা কণ্ডাক্টাররাই লিড নিল। চাঁদার লিষ্টিতে প্রথম নাম চৌবেজীর। পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় নাম ইসমাইল ড্রাইভার। দু টাকা। ঘাটে ফিষ্টি হবে। স্থরিক্ষেপীর ব্যাটার জামা-পেণ্টুল কিনতে হবে। একখানা নতুন শাড়িই বা কেন কেনা হবে না? এ প্রস্তাব শম্ভু মাঝির। আর সেইদিনই দৈবাৎ এসে পড়েছে একটা নাটুকে দল। লোকে বলে আলকাপ দল। ছেলেটা মেয়ে সেজে নাচে-গায়। বেঁটে লোকটা সঙ দিয়ে লোক হাসায়। ঘাটের পিছনের চত্বরে তেরপল টাঙিয়ে আসর হলো। ঘাটবাবুর হ্যাজাগ জ্বলল। রানীরঘাটে এ ছিল উৎসবের রাত। আর তখনও রানীরঘাটে ব্রিজ হয়নি। বিদ্যুৎ আসেনি। মাইক বাজত না। দূর উত্তরের ফারাক্কায় ফিডার ক্যানেলটাও খোঁড়া হয়নি। দেশ দু' টুকরো হয়নি। কত কি হয়নি। সে অনেক বছর আগের কথা।…

স্থরিক্ষেপীর চেহারা আহা মরি ছিল না। মুখটা ছিল গোলমাল, সরু বেঁটে নাক, নীচের ঠোঁটটা একটু পুরু। গতরটা ছিল থলথলে প্রচুর মাংসে ভরা। ময়রাবুড়ি বলত—সাতশো শ্যালশকুনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। শুধু দেখবার মতো জিনিস ছিল তার চুল। কী চুল কী চুল! ছেলে হওয়ার পাঁচ-দিনের দিন, আঁতুড় থেকে যেদিন বেরোয়, সেই পাঁচোটের দিন কঞ্চি তাড়না করে মমতাময়ী বুড়ি তাকে নাইয়ে আনে এবং গড়গড় করে এক বাটি নারকোল তেল ঢেলে দেয় চুলে। সেই একবার তেল। ফলটা হলো কী, আটচালার ধুলো-ধাসড় মেখে পুরোটা গিয়েছিল জট পাকিয়ে। জটার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। পরে যখন রানীরঘাটওয়ালারা স্থরিক্ষেপীর জন্যে বাসস্ট্যাণ্ডের পিছনে একটা ছফুট-চারফুট-সাতফুট মাপের খুপরি বানিয়ে দিয়েছিল, স্থরি বাচ্চা কোলে নিয়ে সেখানে বসে বাবাদের ডাকাডাকি করত, আর ধর্মভীরু দেহাতী মেয়েরা পয়সা ছুঁড়ে দিত। পয়সাগুলো স্থরি পাল্টা ছুঁড়ে ফেলবেই। সেই পয়সা ঘাটেরই কেউ না কেউ কুড়িয়ে জোর করে ওর আঁচলে গেরো বেঁধে রাখবেই। তাতে আপত্তি ছিল না স্থরির। কিছুতেই আপত্তি ছিল না। পরের গঙ্গাপুজোর আগেরদিন ময়রাবুড়ি চুপি চুপি একদলা সিঁদুর ঢেলে দিয়ে এল সিঁথেতে।

চেহারাটা খুব খুলে গেল মেয়েটার। টুকটুক করে তাকিয়ে দেখে বুড়ি বলল, আহা! শাঁখানোয়াখান হলে কী মানান মানাত পোড়ারমুখীকে! ব্যস, খবর গেল শম্ভু মাঝির কাছে। ওপারে ঘাটের ওপর শাঁখাপট্টি। তাও জুটে গেল। ময়রাবুড়ি খুপরির সামনে কোমরে দু'হাত রেখে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না। ছেলেপুলের মায়ের যা যা দরকার, তা নইলে চলে? দেখ তো মুখপুড়ীকে এখন কেমন মানিয়েছে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বুড়ি দৌড়ে যায় দোকানের দিকে। রানীরঘাটে পাখপাখালি যত, তত কুকুরবেড়াল। তার ওপর কড়াইতে তেল ধোঁয়াচ্ছে।...

সেবার গঙ্গাপুজোর দিন সন্ধেবেলা খুব কালবোশেখি হলো। বিষ্টি হলো। বাইরের লোকেদের খোয়ারের হলো একশেষ। কিন্তু রানীরঘাটে গজিয়ে গেল এক দেবী। আবার কে? ওই সুরিক্ষেপী। সে 'ক্ষেপী মা' হয়ে গেল। লোকে তার কাছে জ্ঞাতব্য তথ্য আদায় করতে চায়। ক্ষেপী মা'র শুধু ওই এক কথা—ওগো বাবারা! ও বাবারা! আর ডানহাত কপাল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে কপালে! রাত দুপুরে নিঝুম রানীরঘাটে হঠাৎ শোনা যায়—ওগো বাবারা! ও বাবারা!

কিন্তু এত যে যত্নআত্যি লক্ষ্য, তার তলায় তলায় আরেক তরঙ্গ বইছিল রানীরঘাটে। কাজটা কার হতে পারে? পাপ হোক, পুণ্য হোক, ভালো বা মন্দ হোক, এ একটা ঘটনাই বটে। কে সে? জানোয়ার হোক, মানুষ হোক—দৈবাৎ মতি টলেছিল, কিন্তু কার? নানা ফিকিরে বাচ্চাটার মুখ দেখা হয়, ফিরে এসে রানীরঘাটে মুখ খুঁজে মেলাবার চেষ্টা চলে। মেলে না। চৌবেজী ঘাটোয়ারির নামটাও উঠেছিল। টেঁকেনি। অত সাফসুতরো মানুষ। গদির সাদা চাদরে এককণা ময়লা পড়তে দেন না। দুবেলা স্নান আহ্নিক করেন। খালি গায়ে ধবধবে সাদা পৈতে থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে। নোংরা দুর্গন্ধ এক নারীশরীরে কোন দুঃখে সুখ খুঁজতে যাবেন? তার ওপর লাখপতি লোক। ইচ্ছে করলেই ওপারের অলিগলি খুঁজে সুন্দরী সংগ্রহ করাটা ডালরোটি খাওয়ার সামিল। কেউ বলেছিল, ইসমাইল ড্রাইভারই বা! যা মদ-তাড়ি খায় লোকটা। রাতের দিকেই ঘটেছে। হিসেবমতো আশ্বিন মাসেই বটে। সে-আশ্বিনে প্রায়ই রাতে ঝড়বৃষ্টি হতো। কিন্তু মনে পড়ল, তখন ইসমাইল অ্যাকসিডেণ্ট করে অনেকদিন হাসপাতালে ছিল।

এইভাবে জনাদশেক প্রজননক্ষম পুরুষমানুষ, যারা কিনা ঘাটেরই বাসিন্দা

এবং বয়স পনেরো থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে, সবাইকে যাচাই করে করে বাদ দেওয়া হলো। অতএব দায়িত্বটা বাইরের লোকের ঘাড়েই ফেলতে হয়। আশ্বিনে তো ঝড়জল গেছে। বারোমাসই ওই আটচালায় রাতের আশ্রয় নেয় কত জায়গার পথিকজন, গাড়োয়ান, ভিখিরি, ফকির, সন্ন্যাসী—কত রকম মানুষ। কার মাথায় কটকট করে 'চিহরিপোকা' কামড়েছিল! শেষ অব্দি হাল ছেড়ে দেওয়া হলো। ও পোকা বিষম পোকা। কামড়ালে উত্তর-পুব জ্ঞানগম্যি থাকে না।

আর, দিন যায় রাত আসে। রাত যায়, দিন। মাস যায়, বছর। ঢ্যাঙা শিমুলে অলীক লালঝুঁটি মোরগের ঝাঁক আসতে ভোলে না। ঘাটোয়ারিজীর ময়না কবীরের দোঁহার একটি শব্দ পেরিয়ে যেতে যেতে হিমসিম খায়। ঘাটোয়ারিজীর বাকি চুল সাদা হয়ে ওঠে। ক্ষেপীমায়ের 'থানে' পয়সা পড়ে এবং চুরিও যায়। এক শীতে ময়রাবুড়িও গঙ্গা পায়। ক্ষেপী চেঁচায়—বাবারা! ওগো বাবারা! ও বাবারা!

ফালতু তখন গুটগুট করে হাঁটতে শিখেছে। আর রানীরঘাটের সবাই তার বাবা। আধো আধো বুলিতে ছোঁড়াটা কাপড় ধরে টানে—বাবা! বাবা। ব্যাপারী, দালাল, ফড়ে, মামলাবাজ, গাড়োয়ান আর বাবু—সবাইকে বাবা ডাক। চৌবেজীর উঁচু গদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছোট্ট নোংরা হাত বাড়িয়ে ডেকে ওঠে—বাবা! চৌবেজী হাসতে হাসতে ধমকান—ভাগ! ভাগ! তাই বলে কেউ ওর গায়ে হাত তুললেই হয়েছে! সারা রানীরঘাট এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দেখতে দেখতে ফালতু বড়ো হলো। আবার এক গঙ্গাপুজোর মেলার দিন খুব জলঝড় এল। সেই রাতে সুরিক্ষেপী আচমকা বমি কাপড়ে-চোপড়ে করে ভোররাতে ঠাণ্ডা আর নীলবর্ণ হয়ে মারা পড়ল। মায়ের গুয়েমুতে ছোঁড়াটা বেহদ্দ ঘুমোচ্ছিল। বাঁশবনে বাঁশ কেটে খাটুলি বানানো হলো। ওপাশের শ্মশানে ক্ষেপীমা পুড়ল। রানীরঘাটে সেও একটা দিনের মতো দিন ছিল। আবার চাঁদা তুলে ফিস্টি। আবার এক আসর গান। শেয়ালমারার ষষ্ঠীপদ কেত্তুনে নিখরচায় গেয়ে গেল। ফালতুকে কেউ যদি শুধোয়—তোর মা কোথায় রে? ফালতু শ্মশানের দিকটায় আঙুল তুলে ছড়া গায়—'হো হো! কেপী গেচে, পুলতে / ছসেল পতোল তুলতে!' অর্থাৎ কী হাসির কথা! ক্ষেপী গেছে পুড়তে, ছসের পটোল তুলতে। কে শেখাল? শম্ভু মাঝিই বা। সে বড়ো রসিক মানুষ। নয়তো দিনদুপুরে মাঝ গঙ্গায় লগি ঠেলতে ঠেলতে কেউ গায়—'এ ভরা গাঙমে চেকন জোসনা ডুব দিয়ে পার হবি লো সই / সই লো—ও—ও—ও?'

হাফপেন্টুল পরা উদোম-গা ফালতু ভালো রকম বুলি ফুটলে বাসের মাথায় উঠে চ্যাচায়—চলে এস! চলে এস! আভি ছোড় দেগা! জলদি ছোড় দে গা!

আর এর ফলটা হলো এই যে, সে গতি চিনল। গতিকে ভালোবাসলো। ইসমাইলের বাসেই তার জীবনটা জড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। কখনো ইসমাইলের সঙ্গে গঙ্গা পেরিয়ে শহর। শহরে ইসমাইলের বাড়ি। তার বউ ফালতুর ইতিহাস জানে। দেখলেই মুখটা গম্ভীর করে। জল চাইলে ফুটো এনামেলের গেলাসে জল দেয়। ছিঘেন্নার চূড়ান্তই করে। ইসমাইল কাঁচুমাচু হাসে খালি। কী বলবে? অথচ ছোঁড়াটা খুব কাজের। পাকাচুল তোলে। ফরমাস খাটে। নিজের ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে। তারা যেন এ হারামি ড্রাইভারী কাজের ত্রিসীমানা না ঘেঁষে! হাতে স্টিয়ারিং এলে দুনিয়াটা পয়মাল হয়ে যায়, কে বুঝবে? থিতু হয়ে বসা যায় না ঘরে। শয়তানের চাক্কা ঘোরে সারাক্ষণ এই শরীরে। থামতে দিলে তো? আর শয়তান তোমাকে শেষ অব্দি জাহান্নামের দিকেই নিয়ে চলেছে, টের পেয়েও কিছু করার নেই তোমার।...

কতকাল পরে রানীরঘাটে আরেক শীতে আবার এসেছেন সেন্সাসের বাবুরা। এ বাবুরা সেই তাঁরা নন। এঁরা সরকারি বড়ো সেন্সাসের লোক। এ রানীরঘাটও সে রানীরঘাট নয়। তিনটে বাসরুট এসে মিলেছে ঘাটে। দোকানপাট বেড়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। শ্মশানঘাটের ওপাশে ব্রিজ গড়ে উঠেছে। চৌবেজী ঘাটোয়ারির এই শেষ ইজারা। খাঁচার ময়নাটাও গেছে মরে। আর পাখি পোষেন না। তক্তাপোশের তলায় ঘূণ ধরা খাঁচাটার কী অবস্থা কেউ জানে না। সেন্সাসের বাবুরা ঘুরে ঘুরে লোক গুনছিলেন। পোষা জীবজন্তুর হিসেবও নিচ্ছিলেন। আরো কত কী তথ্য। লোকসংখ্যা সতেরো থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে বাহান্ন। নেহাৎ পেটেরটা বাদ দিয়ে ধরলে। লোকেরা ব্রিজের দিকেই সরে যাবার তালে ছিল। কিন্তু গিয়ে করবেটা কী? নেহাৎ ঘর বেঁধে থাকাই হবে। উঁচু পুলের ওপর দিয়ে বাসবোঝাই লোকজন সোজা গিয়ে ওপারে নামবে। এখানে কোথাও আর রাস্তা আগলে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই। রানীরঘাট হিম হয়ে ঝিম মেরে গেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সময় গোনা! নেহাৎ ভিটের মায়ায় কেউ কেউ থেকে যাবে। সেন্সাসের বাবুরা টের পেলেন, এ বাহান্ন আবার সতেরোয় নামবে, কিংবা আরো নেমে সাতে ঠেকলেও অবাক হবার কিছু

নেই। যারা দোকানদারি করতেই এখানে ঘর বেঁধেছে, তারা ওপারে নতুন বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে দু'চার হাত জমির জন্যে মাথা ভাঙছে।

অথচ বাইরে বাইরে এই মৃত্যুযন্ত্রণা বোঝার উপায় নেই। তেল ফুরোবার আগে সলতে পুড়ছে হু-হু করে। রানীরঘাট ভিড় হল্লাজেল্লায় চঞ্চল। মোটর অফিসের টেবিলে শেষ সংখ্যা বসিয়ে সেন্সাসের বাবুরা নেমে এলেন চায়ের দোকানে, যেখানে আগের সেন্সাসের দুই বাবু চা খেয়েছিলেন। ওপরে এক-টুকরো টিনে লেখা: অন্নপূর্ণা টি স্টল। বাঁকাচোরা হরফ। তার তলায় লেখা প্রোঃ জগন্নাথ—পদবী ধুয়ে গেছে। চা বানাচ্ছে ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। দেখতে মন্দ না। ভেতরে দরমাবাতার দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চের কোনায় বসে চা খাচ্ছে এক নবীন যুবক। মাথায় ঝাকড়-মাকড় চুল। সরু চিকন গোঁফ। তামাটে রঙ। শক্তসমর্থ চেহারা। তার পরনে তোবড়ানো খাঁকি ফুলপ্যাণ্ট, আর খয়েরি শার্টের ওপর হাতকাটা সোয়েটার। বাঁহাতে স্টিলের বালা। ভারি অমায়িক তার হাবভাব।

তার দিকে ঘুরে জগন্নাথের মেয়ে টুকটুকি হাসল।—ও ফালতুদা, তোমার নাম লিখিয়ে দাওনি বাবুদের ?

সেন্সাসবাবুদ্বয় বেঞ্চে বসেছেন। ফালতু ভুরু কুঁচকে বলল—কিসের নাম ?

হাসতে হাসতে টুকটুকি বলল—ওর নাম লিখুন! ও যে বাদ পড়ে গেল!

প্রথমবাবু বললেন—তুমি বুঝি এখানেই থাকো ?

ফালতু নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সিগারেট ধরাল। পানুটি কি এখানে? বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা ঠেঙিয়ে বাস নিয়ে এসেছে একটু আগে। পথে দুবার বিগড়েছিল। ঠেলতে হয়েছে। মালিককে বললে বলেন, আর ক'টা দিন চালিয়ে নে বাবা। নতুন গাড়ি আসছে। ইসমাইলকে বুড়ো করেছে এ গাড়ি। সেই গাড়ি ফালতুকেও বুড়ো করবে।

দ্বিতীয়বাবু কাগজপত্র বের করেছেন ব্যাগ থেকে।—কেউ তো বলেনি তোমার কথা! হুঁ, নামটা বলো ভাই।

ফালতু হেসে বলল—কী হবে ?

প্রথমবাবু বোঝাতে শুরু করলেন। টুকটুকিও বলল—ভয় নেই বাবা! কেউ ধরে নিয়ে যাবে না। আমারও নাম লিখে নিয়েছে। নেননি বাবু? বলুন তো একবার।

একটু পরে কাঁচুমাচু মুখে ফালতু রাজি হলো।—লিখুন তাহলে। ফালতুই

লিখুন।

—ফালতু! হাসলেন উভয় বাবুই। ওটা নিশ্চয় ডাক নাম? আসল নাম বলো।

মেয়েটা হেসে খুন হলো। চায়ে দুধ ঢালতে গিয়ে উনুনে পড়ে গন্ধ উঠল। ফালতু গোঁ ধরে বলল—আসল নকল জানি না সার, ফালতু আমার নাম। লিখতে হয় লিখুন, নয় বাদ দিন।

—বেশ, ফালতু। হুঁ, বয়স?

—বিশ-পঁচিশ হবে।

আবার হাসি উঠল অন্নপূর্ণা টি স্টলে।—বিশ, না পঁচিশ?

—যা মনে হয় লিখুন! ফালতু বিরক্ত হয়ে বলল।

—মাঝামাঝি লিখছি। বাইশ। কেমন? জাতি কী ভাই?

একটু চুপ করে থাকার পর ফালতু বলল—হিন্দুই লিখুন।

—বাবার নাম?

হঠাৎ বজ্রাঘাত। জগন্নাথ মেকদারের হাসিখুশি মেয়েটা শক্ত হয়ে গেল। আড়চোখের বাঁকানো দৃষ্টি ফালতুর গায়ে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ রানীরঘাট নিঃঝুম। ঝড়ের আগে যখন পাতাটিও গাছে নড়ে না। খালি বাজ পড়ার শব্দ।

—বলো ভাই!

ফালতু বেঞ্চের কোনায় সিগারেট ঘষটে নেভাল। তারপর বলল—মায়ের নাম লিখুন সুরিক্ষেপী। তাহলেই হবে।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল জগন্নাথ মেকদারের মেয়ে।—না। সুরেশ্বরী লিখুন। বাবা বলত ক্ষেপীমার নাম সুরেশ্বরী। উইখানে থাকত—মাথায় জটা! আমি দেখিনি। বাবা দেখেছে। ঘাটের কত লোক দেখেছে। গঙ্গাপুজোর সময় নাকি ভর হতো। লোকেরা মানত করতো।···

সবাই গম্ভীর। তারপর আস্তে বললেন দ্বিতীয়বাবু—হুঁ, অজ্ঞাত। এবার বলো, বাড়িতে কে আছে। ক'খানা ঘর। পোষা জীবজন্তু আছে কিনা। বাড়ির গারজেন থাকলে তার নাম কি···

প্রথমবাবু বললেন—ট্রেন চালিও না। একে একে জিগ্যেস করো।

ফালতু উঠে দাঁড়াল। বলল—বাড়িটাড়ি নেই। থাকি মোটর আপিসে। তারপর চলে গেল।

বাবুরা চা খাচ্ছেন। তখন গঙ্গায় নেয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের

বাবা জগন্নাথ এসে গেল। কোমরে বরাবর বাত। এখন শরীর দু' ভাঁজ হয়ে গেছে। কোমর থেকে মাথা অব্দি মাটির সমান্তরাল। তাই হাঁটলে হাত দুটো উড়ন্ত শকুনের ডানার মতো দু'পাশে ঝটপট করে। এখন একহাতে ঘাট। ঘটিতে গঙ্গাজল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সেই হাতটা ঝুলে স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু ঘটি রাখতেই আবার যে-কে সেই। সেন্সাসের বাবুদের চা খেতে দেখে খুশি হলো। টুকটুকি ঠোঁটের কোনায় হেসে বলল—ফালতুদার নাম লিখে নিয়েছে বাবা। আমিই বললুম তো লিখতে। বাদ পড়ে যেত কেমন!

জগন্নাথ হাসল।—তোর যেন দিদির স্বভাব। বুঝলেন স্যার? সেবারে আপনারা আসেননি। অন্য দুজন এসেছিলেন। আপনাদের চেয়ে বয়স অনেক কম। দিদি থাকত ওই যে ভিটে দেখছেন, ওখানে। ওই ফালতুর মায়ের নাম লিখিয়েছিল। খুব ভালোবাসতো মেয়েটাকে!

কথার কথা হিসেবে প্রথমবাবু বললেন—কাকে?

—স্বরিক্ষেপীকে। মানে ফালতুর মা। জগন্নাথ রোদে দাঁড়িয়ে পুঁথি খুলল। পুঁথিতে অল্পবিস্তর রঙ চড়বেই। তাই—কোন জাত না কোন জাত, জাত মানামানি নেই। দিদি ঘাটে ফেলে মেয়েটাকে রগড়াত। কী ভালো না বাসতো স্যার! ঘাটের অনেকে জানে। দেখেছেও, যারা ছিল তখন। আমার দিদি মুরুক্ষু মেয়ে হলে কী হবে, প্রাণটা ছিল বড়ো। ফালতুর জন্মের রাতে কী বিষ্টি কী মেঘ! পেলয়ঙ্কর চলছে। তার মধ্যে দিদি কাঠ রে আগুন রে সেঁকা রে পোড়া রে, আপনার মশাই লণ্ঠন রে করে রানীরঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! আজকাল আর অমন মানুষ হয় না স্যার! তো ফালতু এখন মানুষ হয়েছে। এ লাইনে খুব পাকা ড্রাইভার। ও জানেই না এসব কথা। কে ওর চোখে কাজল পরিয়ে গায়ে তেল মাখিয়ে রোদে বসে থাকত জিগ্যেস করুন, বলতে পারবে না।

সেন্সাসের বাবুদ্বয়ের অত সময় নেই। শহরে শিক্ষকতা করেন। স্কুলের সময় হয়ে এল। উঠে গেলেন পয়সা দিয়ে। জগন্নাথ একটু বেজারই হলো। এক সময় স্বরিক্ষেপীর বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা রানীরঘাটের মনমেজাজ চাঙ্গা রাখতো। কার না মনে পড়ে সেসব দিন? ফিষ্টি, গানের আসর। স্বরিক্ষেপীর ঘর গড়ার দিন কত হইচই, ফূর্তি। যে আসছে, সেই হাত লাগাচ্ছে। জগন্নাথ কত কাপ চা খাইয়েছিল হিসেব নেই। আজকাল সবাই কেমন যেন হয়ে গেছে। ফালতু তখন মোটেই ফালতু ছিল না। এখন ফালতু তো বটে, মানুষই যেন ফালতু হয়ে

গেছে। ঘাটোয়ারিজী একটা লাল হাফপেণ্টুল দিয়ে ফালতুকে বলেছিলেন—যেদিন বাবা বলা ছাড়বি, সেদিন থেকে রোজ একপো করে রসগোল্লা। ফালতু ছাড়তেই পারেনি। ও বাবা, তোমার পাখিটা দাও না! ও বাবা, আমি খৈনি খাব। ও বাবা, দুটো পয়সা দাও। হুঁ, ফক্কুরে লোকেরা শিখিয়ে দিত ছোঁড়াটাকে। ঘাটোয়ারিজীকে নাকাল করে ছাড়তো। শুধু ঘাটোয়ারিজী কেন, জগন্নাথের ওপরও লেলিয়ে দিত না? একবার অশ্বিনী দারোগা এসেছেন ঘাটে। কে লেলিয়ে দিয়েছে ফালতুকে। ফালতু দারোগাবাবুর হাফপেণ্টুল খামচে ধরে বলে—ও বাবা, সাইকেল চাপব। বাবা, সাইকেল চাপব! দারোগাবাবু বললেন—এটা সেই পাগলীর বাচ্চাটা না? আহা! রানীরঘাটে সে এক দিনকাল ছিল! দুঁদে দারোগা হো হো করে হেসে সাইকেলের রডে চাপিয়ে সত্যি একচক্কর ঘুরিয়ে দিলেন! নামিয়ে দু'আনা পয়সাও দিলেন। বললেন—কী রে ছোঁড়া? আমার সঙ্গে যাবি? আমার বাড়িতে থাকবি। লেখাপড়া শেখাব। অ্যাঁ? যাবি?

সেদিন ফালতু গেলে ভালোই করতো। রানীরঘাটের লোকগুলো যেন ছোঁড়াটার মায়ায় পড়ে গিয়েছিল। ও গেলে যেন ঘাট ফাঁকা হয়ে যাবে। এক ফাঁকে শম্ভু মাঝি ডাকল—আয় বে! লৌকোয় চাপবি! ফালতু চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দারোগাবাবু সাইকেলে চেপে গেলেন আসামী ধরতে কনকপাড়া-গোপগাঁ।···

তবে ছোঁড়াটার লোভ ছিল না কিছুতে। দিদি একখানা বেগুনি হাতে দিলে তো প্রায় সারাদিন ধরে তাই কুচ কুচ করে দাঁতে কেটে খা..। দিদি ওদের মা-ব্যাটার মতো যত্ন করতো। এখন ভাবলে অবাক লাগে। কেন এমন করতো দিদি? কেন কেন করতে করতে জগন্নাথের শীতটা গেল বেড়ে। তোবড়ানো মুখে ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল।

—বাবা, আমি আসছি।

জগন্নাথ তাকায় মেয়ের দিকে।—নাও! মাথায় পোকা কামড়াল! খদ্দের-পাতি আসবে-টাসবে।

—তুমি দেখ না ততক্ষণ! মরতে তো যাচ্ছি না!

লম্বা পা ফেলে টুকটুকি বাসস্ট্যাণ্ডের ওপাশে চলে গেল। মা-মরা মেয়ে নিজের জোরে বড়ো হয়েছে। বড়োটা বড্ড বেশি। ঘাটসুদ্ধু লোক তার কুটুম্ব। মামা খুড়ো কাকা মামী খুড়ি কাকিমা, দাদা বউদি, আরো কত রকম সম্পর্ক

মানুষের থাকে।

বাস সিণ্ডিকেটের লক্ষ বাবু ডাকেন—ও টুকটুকি কোথা যাচ্ছিস? টুকটুকি সোজা বলবে—আপনার কনে খুঁজতে দাদামশাই! লক্ষ্মণবাবু দাড়ি চুলকে বলবেন—ওরে, ওরে! তুই-ই তো আমার কনে। টুকটুকি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলবে—আমার বর যে ঠিক হয়ে আছে দাদামশাই। আহা, আগে বলতে হয়।

আর ওই চৌবেজী। ওকে দেখলেই খৈনি ডলতে ডলতে—'কেমনে হোবো এ গঙ্গা পার / হামি জানে না সাঁতার।'

ঘাটোয়ারিজী লোটা হাতে শিমুলতলায় দাঁড়িয়েছিলেন। কানে পৈতে জড়ানো। হাতমাটি করা হয়ে গেছে। মোছা হয়নি। নির্মীয়মাণ ব্রিজ দেখছেন। দেখতে দেখতে ঘুরলেন ডাইনে বাঁশবনের দিকে। আকন্দ ও সাঁইবাবলার ঝাড়ের পিছনে জগন্নাথের মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। একটু সরলে ঘাটোয়ারিজী অবাক। ওটা ফালতু না? চোখের নজর ইদানীং কমেছে। তাহলেও চিনতে ভুল হলো না। হেঁড়ে গলায় কাঁপা-কাঁপা স্বরে গেয়ে উঠলেন—'কেমনে হোবো এ গঙ্গা পার…' টুকটুকি হনহন করে চলে গেল গঙ্গার আঘাটায়। ফালতু একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বাস অফিসের দিকে হাঁটল। চৌবেজী খুব হাসলেন। কতক্ষণ আপনমনে হাসলেন। হাসার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন। মন খারাপ হয়ে গেল।

—টুকটুকি! ও রী টুকটুকি! শুন, শুন! ইধার আ।

—বলো ঘাটোয়ারিজী। যা বলার ঝটপট বলো, আমার শোনার সময় নেই।

—আ রী বৈঠ্‌ বি, তব তো বোলবে।

—হুঁ, বসলুম। বলো।

—হাঁ রী। এত্তো কী ফুসুর-ফাসুর করে বেড়াস ফালতুর সঙ্গে?

টুকটুকি মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মারব! তারপর কান্নার ভান করে—হুঁ, মাগো! এবং আবার মুঠো তুলে—মারব!

চৌবেজী নির্লজ্জের মতো ফিসফিস করলেন—সাচ বলছি রী বেটি। বাত তো শুন।

—শুনব না! চিলচ্যাচানি চেঁচাল জগন্নাথের মেয়ে।

—পাগলী বেটি! বোল, বিভা করবি তো বোল হামাকে। হামি লাগিয়ে

দেবে। চৌবেজী চাপা স্বরে বলতে থাকলেন। আ রী ! হামি তো ঘাট ছেড়ে চলেই যাবে। তোদের বিভা দেখে যাই ! এত্তোকাল ঘাটে থেকে বুঢ়া হোয়ে গেল। হামার বহৎ সুখ হোবে, বেটি ! বহৎ ধুমধাড়াক্কা লাগিয়ে দেব।

টুকটুকি ভেংচি কেটে পালিয়ে গেল। তারপর থেকে তারও মন খারাপ। চৌবেজীকে দেখলে সেখান থেকে কেটে পড়ে। জগন্নাথ তাকে ওপারে শহরে পাঠালে সে আঘাটায় জল ভেঙে চলে যায়। শীত যত যায়, জল তত শুকোয়। বালির চড়ায় মাথা কেটে। ওদিকে ঘাটের সামনে বারোমাস দহ। ফালতুকে বিয়ে করলে ঘাটোয়ারিজীর কেন সুখ হবে, টুকটুকি বোঝে না। শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। রানীরঘাটের বনভূমি সাধ্যমতো সাজল। এবার নিষ্পত্র ঢ্যাঙা শিমুল শ্মশানে দাঁড়িয়ে রইল কিংবদন্তীর সেই রাহুচণ্ডাল। ভাগীরথীর বুকে ঘূর্ণী ঘুরে বেড়ায়। ভূতেরা নাইকুণ্ডল খোঁজে আপন আপন। নাইতে গিয়ে টুকটুকি চেঁচায় —গোরু খা, গোরু খা, গোরু খা ! সেই সময় একদিন শম্ভু মাঝি থপথপ করে হেঁটে ফালতুর কাছে এল।

—কেমন আছিস বাপ ফালতু ?

খাতির করে সিগ্রেট দিয়ে ফালতু বলল—ভালো আছি শম্ভুকাকা। তুমি ভালো তো ?

রানীরঘাটের সবচেয়ে বড়ো আর বুড়ো শিরীষ গাছের তলায় ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল শম্ভু মাঝি।—বাপ ফালতু রে !

—বলো কাকা !

শম্ভু মাঝি হঠাৎ গামছার খুঁটে চোখ মুছে বলল—জোয়ান হয়েছ। বড়ো হয়েছ। ভালো রোজগারপাতি করছ।

—তা করছি কাকা ! ফালতু অকৃতজ্ঞ নয়। রানীরঘাটের এসব লোকই তাকে মানুষ করেছে, সে জানে। সবাইকে শ্রদ্ধাভক্তি করে চলে।

এবারে বিয়েটিয়ে করে ফেলো বাপ। আর কদিন আছি ? ঘাটও তো উঠে যাচ্ছে। তোমার বিয়েটা দেখেই যাই !

ফালতু হাসল।—আমাকে কে মেয়ে দেবে শম্ভুকাকা ?

বুড়ো ঘাটমাঝি তার গায়ে হাত বুলোতে থাকল। লগিধরা কড়াপড়া হাত। লোলচর্ম বাহু। গোঁফ ছাপিয়ে জল ঝরছে। কী স্নেহে কোন মায়ায় কাঁদে এতদিন বাদে, কে বলতে পারে সে গুহ্য কথা ?—যদি ইচ্ছে করো, জগাইকে বলি। লজ্জা করে কী হবে ? ঘাটে তো সবাই জেনেছে, তোমাদের বড্ড মনামনি

ভাব। বুড়ো ঘাটমাঝি ফ্যাঁচ করে নাকই ছেড়ে ফেলল, এমন আবেগ এসেছে!

ফালতু হো হো করে হেসে উঠল।—ধ্যাৎ। আমাকে কেন মেয়ে দেবে? কাকার আবার কথা!

শম্ভু গম্ভীর হয়ে বলল—দেবে। দিয়ে বর্তে যাবে! আমরা ঘাটসুদ্ধ গিয়ে ধরব। ঘাটোয়ারিজী বলেছেন, সবাই মিলে ফালতুর বিয়ে দেব। খরচ যা লাগে তিন ভাগ ওনার। খুব ধুমধাম হবে বইকি।…

সেদিনই একটু রাত গড়ালে চৌবেজীর গদ্দিতে সভা বসেছে। পুরনো লোকেরা সবাই এল। জগন্নাথকেও ডাকা হলো। সে বেচারা কিছুই জানে না। দু' হাত দু' পাশে ছড়িয়ে শকুনের ডানার মতো ঝটপট করতে করতে কুঁজো হয়ে এল। এসেই অবাক। তার খাতিরটা বড্ড বেশি করা হচ্ছে। ধরাধরি করে তাকে উঁচু গদ্দিতে উঠিয়ে দিল লোকেরা। মদন কণ্ডাক্টার এখন চুলপাকার দলে। ফালতুর ব্যাপারে সেই বরাবর লিড নিয়েছে। এবারও নিল। চৌবেজীর দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে কথাটা উঠুক ঘাটোয়ারিজী! সবাই সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চৌবেজী বললেন—জরুর!

মদন শুরু করল। ফালতুর মা স্বরিক্ষেপী থেকেই শুরু করল। ফালতুকে মানুষ করার ইতিবৃত্ত, ফালতুর চালচলন, ইসমাইল ড্রাইভারের স্নেহ (আহা, এখন সে বেঁচে থাকলে কত খুশি হতো, এবং কয়েকটি জিভের চুকচুক শব্দ, মাথা নাড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ), খুঁটিনাটি ঘটনা, অশ্বিনী দারোগার আহ্বান (খুব হাসির রোল পড়ে গেল এইতে), ফালতুর দুষ্টুমি—আধঘণ্টারও বেশি। তার সঙ্গে রানীরঘাটেরও নানা ঘটনা জুড়ে দেওয়া হলো চারপাশ থেকে। ব্রিজও এল। রানীরঘাটের অনিবার্য মৃত্যুর প্রসঙ্গও উঠল। (দীর্ঘশ্বাস ও নীরবতা) তারপর জগন্নাথের দিদি—যাকে সবাই বলত ময়রামাসি, তার কথা—এ পাপে রানীরঘাট একদিন ভেসে যাবে! তাই যাচ্ছে। আগের দিনের মানুষেরা যা বলতো, ফলে যেত!

এই সময় চৌবেজী মানুষের লোভকেই দায়ী করলেন। তুলসীদাস আওড়ে বললেন—'সেবক সুখ চহ মান ভিখারী / ব্যসনী ধন সুভ গতি বিভিচারী / লোভী জসু চহ চার গুমানী / নভ দুহি দুধ চহত এ প্রাণী।' মানুষ আকাশ দুহে দুধ চায়! হায়রে লোভ!

জগন্নাথ খুব মাথা নাড়ল। মদন কণ্ডাক্টার বলল—তো কথা হচ্ছে, ময়রা-মাসির কাছে শোনা কথা, (স্রেফ মিথ্যে কিন্তু) স্বরিক্ষেপী মাসির আগের

চেনাজানা ছিল। মাসির স্বজাতিরই মেয়ে। স্বামীর অত্যাচারে…

এ পর্যন্ত শুনেই জগন্নাথ জোরে মাথা নেড়ে বলল—না ! না !

শম্ভু মাঝি একটু তফাতে মাটিতে বসে ছিল। বলল—আহা, বলতেই দাও জগাইদা !

মদন একটু হেসে বলল—মাসি আমাকে বলেছিল। সত্যমিথ্যে সেই জানতো। আমি যা শুনেছি বলছি। আর স্বজাতি না হলে অমন সেবাযত্ন করতো ? বলুন সবাই ! না কি ঘাটোয়ারিজী ? বলুন !

সবাই শোরগোল তুলে বলল—ঠিক ঠিক। বেজাত হলে অমন করবে কেন ?

জগন্নাথ গতিক বুঝে গুম হয়ে বলল—হলেও হতে পারে তাহলে।

মদন বলল—আমরা রানীরঘাটওলারা ছেলেটাকে মানুষ করেছি। এখন লায়েক হয়েছে। ভালো কামাচ্ছে। লাইনের নামকরা ড্রাইভার। না হয় লেখাপড়াটাই ভুল করে আমরা শেখাইনি। তাতে কী ? যে বিদ্যে ধরেছে, তাই বা মন্দ কী ! বইপড়াও বিদ্যা, গাড়ি চালানোও বিদ্যা।

সবাই সায় দিয়ে বললে—একশোবার একশোবার।

মদন বলল—এখন তাহলে ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর মা-বাবা নেই তো কী হয়েছে। আমরাই ওর মা-বাবা। আমরাই ওর বিয়ে দেব। চৌবেজী, আপনাকে তিন ভাগ খরচ দিতে হবে। বাকি এক ভাগ আমরা দেব। কী বল জগাইদা ?

আগে থেকে সব সাজানো ব্যাপার। জগন্নাথ না জেনে বলল—নিশ্চয় দেব।

এবার মদন আচমকা পর্দা তুলল।—ফালতুর স্বজাতের কনে রানীরঘাটেই আছে—উপযুক্ত কনে …মদন হেসে বলল। না কী চৌবেজী ?

—জরুর।

মদন গলা ঝেড়ে বলল—আমরা সবাই জানি। সকালসন্ধে দেখছি ওদের দুটিতে খুব ভাব-ভালোবাসা। আমরা এখন বাকিটুকু ছেড়ে দিলুম কনের বাপের হাতে।…বলেই সে চতুর হেসে জগন্নাথের কাঁধে ডান হাতটা রেখে সহাস্যে বলে উঠল—বলো জগাইদা !

আর যায় কোথায় ? কুঁজো বুড়ো নড়বড় করে প্রায় ঝাঁপ দিল নীচে। তোবড়ানো মুখখানা যতটা পারে ভয়ঙ্কর করে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—ন্না ! আবার ডানা ঝটপট করে গদীর দিকে ঘুরে গর্জন করল—না ! কক্ষনো না !

শোরগোল শুরু হলো। সবাই ওকে বোঝাতে চায়। জগন্নাথের চারিদিকে

ঘিরে দাঁড়ায়। কাকুতিমিনতি কতরকম। সাধ্যসাধনা। জগন্নাথ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে মাথাটা দুপাশে জোরে দোলাতে দোলাতে বলল—না না না! না না না! না না না···

বুড়ো মানুষ অমন করে কাঁদলে বড্ড খারাপ লাগে। যেন জবাই করা হচ্ছে ওকে। অদ্ভুত লোক তো! দেখব কী দিয়ে বর জোটে মেয়ের।···

তখনও ফরাক্কার ফিডার ক্যানেল খোঁড়া হয়নি। বসন্তের শুরুতেই ভাগীরথীর জল শুকিয়ে যেত। জ্যোৎস্নারাতে বালির চড়ায় বসে যুবক-যুবতীদের চমৎকার প্রেম জমতো। ওপারে শহরে বিদ্যুৎ, এপারে রানীরঘাটে বিদ্যুৎ—ভাগীরথীর গর্ভে সে আলো পৌঁছয় না। জ্যোৎস্নাটা ভালোই খেলে। রানীরঘাটের নীচে অবশ্যি কিছুটা দহ। দক্ষিণে শ্মশানের ওদিকটায় প্রায় সবই শুকনো, একখানে সেই মাথা কুটতে থাকা জল ঝিলমিল করে বয়ে যায়। ফুরফুরে বাতাসে গা শিরশির করে। দুটিতে বসে অনুচ্চ স্বরে কথা বলছিল।

—ঘাটে কিসের মিটিঙ ডেকেছে। গেলে না যে?

—আমাকে ডাকেইনি।

—ডাকবে আবার কী? তুমি ঘাটের লোক নও?

—নাঃ। আমি ফালতু।

—শোন, তুমি এবারে একটা নাম নাও। ভালো নাম।

—তুমিই দাও না একটা নাম।

—নেবে?

—হুঁউ।

—আগে জানলে ওই গুণতিবাবুদের কাছে···আচ্ছা, ওরা আর লোক গুণতে আসবে না?

—কে জানে? কী নাম দিচ্ছ, দাও আগে।

—দিচ্ছি। নতুন বাসমোটর কবে আসবে তোমার?

—ব্রিজ খুলুক। কেন?

—প্রথম—একেবারে প্রথম পেসেঞ্জার আমি। ভাড়া দেব না কিন্তু। চাপাবে?

—হুঁউ।

—তখন থাকবে কোথায়?

—ওপারে নতুন আপিস হচ্ছে না? সেখানে। আমার থাকার ঘরও হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে আবার—বাবা ওখানে জায়গাই পেল না। লক্ষ্মণ দাদামশাইকে বলতে বলেছিল বাবা। বলেছি তো। সে কথা নেই, শুধু দেখলেই ফক্কুরি করে। তুমি বলবে একবার?

—বড়ো মুখ করে বললে যখন বলব।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর—গুণতিবাবুদের কাছে তুমি বাবার নাম বললে না। আমার খুব খারাপ লাগছিল, জানো? যা হোক একটা বললেই পারতে! কী ভাবল ওরা?

—কী ভাববে? বয়ে গেল।

—যাঃ! বাবা না থাকলে চলে? বাবা না থাকলে…

—কী?

—আমার লজ্জা করছে। তুমি হয়তো রেগে কাঁই হয়ে যাবে।

—না, না। বলোই না!

—থাক। তোমার বাবার কথা জানতে ইচ্ছে করে না?

জোরে মাথা দোলাল এবং জ্যোৎস্নামাখা বালিতে আঁচড় কাটতে থাকল প্রেমিক যুবক। গায়ে ছায়া ফেলে উড়ে গেল একঝাঁক রাতের পাখি। শ্মশানের বাঁশবনে শেয়াল ডেকে উঠল। তার একটু পরে কী একটা শব্দ হলো কোথায়। তারপর প্রেমিকা তরুণী উঠে দাঁড়াল ঝটপট। অস্ফুট স্বরে বলল—কে যেন আসছে! আমি যাচ্ছি। এদিকেই আসছে যেন। যাচ্ছি!

ডানা থাকলে উড়ে যেত এভাবে চলে গেল, যেন পা বালি ছোঁয় না। নিঃশব্দে। ফালতু উঠল একটু পরে। সিগারেট ধরালো। আলো দেখেই আওয়াজ এল—কে ওখানে?

ফালতু লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—জগাইকাকা নাকি? আমি ফালতু।

—টুকটুকি কই? হাঁড়ির ভেতর থেকে জগন্নাথ কথা বলল যেন।

একটু দ্বিধা হলো। তারপর সেটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল—কী হয়েছে জগাই কাকা?

জগন্নাথ একটা অদ্ভুত ব্যবহার করল। সে খপ করে ফালতুর হাত দুটো ধরে ফেলল। তারপর মরণকালের ঘড়ঘড় শ্বাসকষ্টের আওয়াজ তুলে বলে উঠল—ফালতু, বাবা! তোর হাত দুটো ধরে বলছি রে, এ নিশুতি কাল। মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে বলছি। ঘাটওলারা ষড়যন্ত্র করেছে, জোর করে তোর সঙ্গে আমার

টুকটুকির বিয়ে দেবে। ফালতু রে! আবার বলছি, মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে আছি—ওরে, তোরা ভাইবোন রে! আমি মহা পাপী রে! টুকটুকি আর তুই ভাইবোন—তোদের বিয়ে হয় না রে···

এক ঝটকায় ফালতু হাত ছাড়িয়ে নিল।

—আমি বলছি বাবা। নীচে মা গঙ্গা, আমি বলছি আমার পাপের কথা।

ফালতু হুংকার দিতে গিয়ে সামলে নিল। সে জানে, সে দুঃখী। লোকের করুণায় বেঁচেছিল। জোর দেখাতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়। অমনি চুপসে যায়। আস্তে বলল—হতে পারে তুমি লম্পট। হতে পারে বইকি। আমার মা আটচালায় থাকত আর তোমরা রানীরঘাটওলারা···থাক সে কথা। এখন বয়েস হয়েছে তো। বুঝতে পারি সব। কেন আমাকে মানুষ করা, সবই বুঝি!

জগন্নাথ ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে পাছায় হাত মোছে। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে কুডাক ডাকতে ডাকতে একটা পেঁচা উড়ে যায় শ্মশানের পাশে শিমুল গাছটার দিকে। কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একবার কেঁউ করে ডেকেই চুপ করে যায়। লেজ নাড়ে। জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া শোঁকে একবার।

ফালতু আবার বলতে থাকে—আজ পারুলিয়ার নতুন রুটে গাড়ি খারাপ হয়েছিল। মিস্ত্রি ডাকতে পাঠালুম। মাথায় টুপিপরা, সাদা দাড়ি মুখে, এক মুসলমান হাজিসায়েব এল। চিনলেও চিনবে। ইব্রাহিম হাজি নাম বলল।

ভাঙা গলায় জগন্নাথ বলে—হ্যাঁ। ডাকাত ছিল। পরে তীর্থ করে হাজি হয়েছে। খুব চিনি·বাবা, কে না চেনে! খুনের মামলায় জেল হয়েছিল যাবজ্জীবন। তাও জানি।

—কথায় কথায় বলল, ঘাটে এক পাগলী থাকত—সে বেঁচে আছে, না মারা গেছে? বললুম, মারা গেছে। আমি তারই ছেলে। শুনেই লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরল। তুমি তারই ছেলে বাবা? আমি তো অবাক। এমন কেন করছে লোকটা? তারপর কিছুতেই আসতে দেবে না। প্যাসেঞ্জার আছে গাড়ি ভর্তি। শোনে না। মিষ্টির দোকানে নিয়ে গেল। বলে—আমার ব্যাটাকে পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দাও। আমার কেমন যেন লাগল। আমি খেতে পারলুম না। সে আমাকে ছাড়বে না। জড়িয়ে ধরে টানাটানি। বলে, আশ্বিন মাসে ঝড়জলের রাতে···

এ পর্যন্ত শুনেই জগন্নাথ বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাতটুকু ওপারে মোক্তারবাবুর বাড়িতে লুকিয়ে থেকে পরদিন আদালতে হাজির হতো। অত রাতে তখন খেয়া

বন্ধ। শম্ভু গাঁজা খেয়ে মড়া। এদিকে ঝড়জল। ইব্রাহিম আমাকে জায়গা চাইল। খুনী ফেরারকে জেনেশুনে জায়গা দিতে পারলুম না। বললুম, আটচালায় গিয়ে থাকো বরং।

ফালতু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল জোরে। সাদা কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে শুঁকল এবং ছ্যাকা খেয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়তে থাকল।—এতকাল পরে ওর খেয়াল হলো সুরিক্ষেপীর কথা। ফালতু দম-আটকানো গলায় ধলে উঠল।—ওই ছাতুখোর ঘাটোয়ারি! ওই মাতাল মদন কণ্ডাক্টার! আবার দেখি জগাইকাকা তুমি! তুমি আরো এককাঠি সরেস। কী না টুকটুকি আর আমি ভাইবোন। এবার ফালতু গর্জন কিংবা হাহাকার করে উঠল।—কী বাবা দেখাচ্ছ আমাকে সবাই মিলে? রানীরঘাটের মড়াখেকো শেয়ালকুকুরগুলো ফালতুকে বাবা দেখাচ্ছে। আমার বাবার দরকার নেই। হুঁ, বাবা দেখাচ্ছে শালারা! আরে, আমার হাতে যে স্টিয়ারিং ধরে দিয়েছে, সেই আমার বাবা।...

ময়রা মাসি বলেছিল—এ মহাপাপ সইবে না। রানীরঘাট ভেসে যাবে। শেষ অবধি তাই ফলে গেছে। এখন ভাগীরথীর ওপর বিশাল ব্রিজ হয়েছে। ফারাক্কার ফিডার খাল থেকে জল আসছে। বারো মাস নদী কূলে কূলে ভরা। সেই কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ কাজল জল আর নেই। শ্যাওলায় গা ঘষে বেড়ানো রূপসী মৌরলার ঝাঁকও আর দেখা যায় না। রোদে-জ্যোৎস্নায় বুকের তলার রূপোলি বালুকণাও আর অলীক মুক্তোর ঝিলিক দেয় না। চৌবেজীর গদী, আটচালা, জগন্নাথের অন্নপূর্ণা টি স্টল জুড়ে আকন্দ সাঁইবাবলা কালকাসুন্দে আর বন-তুলসীর জঙ্গল। সুরিক্ষেপীর 'থানে', বাস স্ট্যাণ্ডের চত্বরে, হরেকরঙা গাঁদা ফুলের ঝাড়। এক সাধু এসে আশ্রম খুলেছেন। পিচের রাস্তায় কবে কারা ধানচাষ করেই ফেলবে। বিদ্যুতের শালকাঠের খুঁটি যে যা পেরেছে, উপড়ে নিয়ে গেছে। শুধু ঘাট আর শ্মশানের মাঝামাঝি জায়গায় সেই রাহুচণ্ডাল শিমুলটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখনও মাঘ মাসে সে মাথায় লাল পট্টি জড়াতে ভুল করে না।..

ওই একটু দূরে ষাট-সত্তর ফুট উঁচু পুলের ওপর দিয়ে ঝকঝকে এক রূপোলি বাস যাচ্ছে পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। ড্রাইভারটি মধ্যবয়সী। সারা পথ দুধারে যত গ্রাম আছে, যত মানুষ আছে সবার কাছে তার মোটরগাড়ি সময় জানিয়ে দেয়। ক্ষেতের মুনিশ বলে ওঠে, ফালতুর গাড়ি গেল। নাস্তা এল কই? ম্যাবে ধানশুকোতে দেওয়া চাষীবউ, ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়েটা, খুঁটি ও দুরমুষ

হাতে গাইগোরু বাঁধতে আসা বুড়ি—কার সঙ্গে না কথা বলে যাবে সে ! গাড়ির গতি কমিয়ে বলে যাবে—বোনটি ভালো আছ তো ? ও বুড়িমা, কাল দেখিনি কেন ? ও বউঠান, মাছ রেখো তো চাট্টিখানি—ফেরার সময় নিয়ে যাবো। ওরা বলবে—ফালতুদার খবর ভালো তো ? বাবা ফালতু, দুটো মাথাধরার বড়ি এনে দিস বাবা, আমার সোনার বাবা ! বিনোটির মাস্টারমশাই স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বলবেন—ফালতু ! প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে যা বাবা ! এই নে টাকা। বেশি লাগলে দিস, দোব'খন।

ফালতু এখনও ফালতু নামেই থেকে গেছে। যে তাকে নতুন নাম দিতে চেয়েছিল, রানীরঘাটের জগন্নাথের মেয়েটা, তার মতো নির্বোধ আর কেই-বা ছিল ! বাপ যেই না বলা তোরা ভাইবোন—হতভাগী আপন দাদার সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে মা গঙ্গার বুকে শুয়েছে, এই তীব্র পাপবোধে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বিষাক্ত করবী ফল, কেউ বলে ধুতরো, শিলে বেটে গিলে ফেলেছিল। বাপ কোন মতলবে কী বলছে, বুঝবি তো তলিয়ে !

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ফালতুর রাগ হয়। স্পিড বাড়ায়। পৃথিবীকে চাকার তলায় মাড়িয়ে শোধ নেয়।

বাগাল

ধান্ন মোড়লের খড়কাটার কুঠুরিতে ওপরে খড় নিচে খড় মধ্যিখানে বছর আষ্টেক বয়সের এক মানুষ শীতের লম্বাটে রাতগুলোকে ভোর করে। একখানা চটও আছে। গুটিয়ে পড়ে থাকে একপাশে। মোড়ল বলে, 'তু এত খ্যাদোড় ক্যানে রে হরিবুলা?'

সেই ক্ষুদে মানুষ শুধু দাঁত বের করে।

খ্যাদোড় মানে নোংরা। মোড়লগিন্নি সন্দিগ্ধভাবে খড়গুলোর দিকে তাকাতে আসে। মানুষের হিসিমাখা খড় গোরুকে খেতে দেওয়া অধর্ম। 'বল্ সত্যি করে, বিছানা নষ্ট করেছিস নিকি?' মোড়লগিন্নি তর্জনগর্জন করেন।

হরিবোলা নিজের কান ছুঁয়ে তিনসত্যি করলেও সন্দেহ ঘোচে না।

ধান্ন মোড়ল বলে, উই হুদ্মুসলোর তিনসত্যির কিছু মুইল্লো আছে? ছেড়ে দাও বরঞ্চ।'

হুদ্মুসলো মানে গোঁয়ার। এবার মোড়লগিন্নি তাকে মোক্ষম আখ্যাটিতে ভূষিত করে, 'হাসতে লজ্জা করে না রে ক্যালাগোবিন্দা?'

অর্থাৎ নির্বোধ। হরিবোলার এই তিন আখ্যা। খ্যাদোড়, হুদ্মুসলো, ক্যালাগোবিন্দা। আঞ্চলিক ভাষায় নিকৃষ্ট এই শব্দগুলি রোজ সকালে হরিবোলার উপহার লাভ। এরপর তার কাজ শুরু বাসিমুখে গোয়ালঘর থেকে গোরুগুলোকে বের করে বাইরে বেঁধে এসে ঘর পরিষ্কার। জমাট গোবর যাবে গোয়ালঘরের পেছনে—গোলাকার স্তূপ হয়ে থাকবে, চারদিক ঘিরে বড়ো বড়ো ফুলন্ত মেথো ঘাস। সেই ঘাসের মাথায় একটা গাব্দামোটা ধানফড়িং দেখতে পেলে সে তার শালিখ ছানাটির জন্য ধরার চেষ্টা করবেই। এতে দুদণ্ড সময় যাবে। তখন মোড়লগিন্নি খিড়কির দোরে উঁকি মেরে আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করবে। হরিবোলা গোবরমাখা ভাঙা বালতি আর ফড়িংটাকে মুঠোয় ধরে আবার দাঁত বের করবে। যখন সে তরল গোময় আর মেঝের কাদার মিশ্রণে বালতি ভরছে, তখন ফড়িংটা তার হাফপেন্টুলের দড়ির খোপে ঢুকে গেছে।

এরপর ডোবার ঘাটে হাত-পা ধোয়া। বাসনমাজার ছাই পড়ে থাকে সেখানেই। মোড়লগিন্নির ছায়া দেখলে সে ঝটপট সেই ছাই তুলে দাঁতে ঘষতে থাকবে। গিন্নিমা নোংরা একেবারে সইতে পারে না। বলবে, 'রগুড়ে মাজ্ দাঁতগুলান—নৈলে আজ খাওয়াদাওয়া বন্ধ।' কিন্তু গিন্নিমার নিজের দাঁতগুলো কালো কেন, সে কথা তুললেই রাক্ষুসী হয়ে তেড়ে আসবে।

একবোঝা খড় কেটে তবে খাওয়াদাওয়া। অর্থাৎ এককোঁচড় মুড়ি। একটু-খানি গুড়ের ডেলা। নৈলে আধখানা পেঁয়াজ।

গোরুগুলো রোদ্দুরে তখনও ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে পৃথিবী দেখছে। একটু তফাতে বসে হরিবোলা মুড়ি চিবোচ্ছে। শালিখছানাটি তার কাঁধে। তারও ঘাসফড়িংটা খাওয়া হয়েছে। তার চোখদুটোও নিষ্পলক পৃথিবী দর্শন করছে।

তারপর এল হেমা গয়লানী দুধ দুইতে। মোড়লগিন্নির কোমরে বাত বলে পা দুমড়ে বসতে পারে না ইদানীং। হেমা যতক্ষণ দুইবে, হরিবোলার কাজ বাছুরটিকে কান ধরে টেনে রাখা। বাছুরটি দু' পা ঠোকে। কান ছাড়িয়ে নিতে মাথা এদিক ওদিক করে। হরিবোলা খিটখিট করে হাসে।

কেন হাসে সেই জানে। হেমা ধমকায়, 'অত হাসি কিসের রে ছোঁড়া সাতসকালে?' তারপর দুধ দোহানো শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। হাতে পেতলের চোঙায় দুধের ফেনা। কী মনে করে হরিবোলাকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুর কি শীত-খরা বলতে নাই রে ড্যাকরা ছোঁড়া? এই শীতে মোষের শিঙ নড়ে যায়, আর খালি গায়ে দাঁত ক্যালাচ্ছিস কী করে বাপু?'

পেছন থেকে মোড়লগিন্নির অভিমানে আহত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'উয়াকে কি জামাকাপুড় দেওয়া হয়নি—জিগ্যেস করো না একবার! উটা কি মানুষ ভাবছ তুমি?' মোড়লগিন্নি ওর বিছানায় শোয়ার বিবরণ দিতে থাকে। সেই চটখানির গুটিয়ে পড়ে থাকার বৃত্তান্ত। ভিজে খড়ের কুচ্ছো। লাল গেঞ্জি কিনে দিয়েছিল, দুদিনেই ছিঁড়ে ফালাফালা। বড়োই হুদ্‌মুসলো। বেজায় খ্যাদোড়। একের নম্বর ক্যালাগোবিন্দা।

হেমা দুধের পাত্র সমর্পণ করে বলে, 'তাই বটে বাপু! হ্যাঁ গো, আঙাদাসীর কুনো খবর নাই?'

আঙাদাসী মানে রাঙা দাসী। এই হরিবোলার মা। গতবছর হঠাৎ মোড়লবাড়ি থেকে চলে গেল তো গেলই। গিন্নির সঙ্গে নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। গিন্নি বলেছিল, 'রোজ চাল চুরি করে বেচে আসতো। তার ওপর

খানকীর স্বভাব। কেমন সাজের ঘটা দেখতে না মাগীর? বাজারী! বেউশ্যে!'

এমন মেয়ে রাঙাদাসীর খবর রাখার দায় পড়েছে কার? মোড়লগিন্নি চটে যায় হেমার কথায়। 'আবার সাতসকালে ওই অলুক্ষণে পাড়ামাতানীর নাম? অত দরদ থাকলে তুমি লিয়ে এস খবর!' দুধের পাত্রটি নিয়ে থম থম করে বাড়ির ভেতর যায়। ভেতরে গিয়েও রাঙাদাসীর খেউড়।

হেমা বাঁকা মুখে একটু গুম হয়ে থাকে। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে চাপা গলায় বলে, 'আর তু ছোঁড়ারও বলিহারি যাই রে! হাজার হলেও মা জননী! ধন্যি বাবা, উই পক্ষীটিও মা মা করে চ্যাঁচায়।'

সেও চলে যায়। তখন হরিবোলার চোখ মাঠের দিকে। মাঠের ওপর কুয়াসা জমে আছে। ওই কুয়াসার ভেতর আছে এক নদী। নদীর পারে কাশফুলের বন, বিলবাঁওড়, হিজল ভাঁড়ুলে বাবলা গাছের টুঙ্গি। কখন সেখানে যাবে, সেই প্রতীক্ষা শুধু। নদী পেরুলেই তো হরিবোলা আর এই হরিবোলাটি থাকে না। তখন যেন চিতে বাঘের বাচ্চা। চেরা গলায় গান জুড়ে দেয়, 'দড়কা লধির উধারে / যৈবন পড়ো আছে হে···' যৌবনের বৃত্তান্ত না জেনেও।

ধানু মোড়ল নদী পর্যন্ত সঙ্গে যায়। হরিবোলার তখন পান্তা খেয়ে পেটটি ঢোল। বাকি দিনটার ক্ষিধের জন্য বরাদ্দ ফের এক কোঁচড় মুড়ি। কিন্তু হরিবোলা তার বদলে দু'মুঠো চালই পছন্দ করে। দুধসর নামে এক নালা আছে। তার ধারে ভাঁড়ুলেগাছের নেমে যাওয়া শেকড়বাকড়ে ন্যাকড়ার একদিকটা বেঁধে অন্যদিকে বাঁধা চালগুলো জলে ডুবিয়ে রাখে। দুপুর গড়িয়ে এলে সেই চাল তখন দুধের মতো শাদা, ফুলো খই যেন, আ··· কী স্বাদ! চড় মারলেও মুখ থেকে ছাড়ে না।

নদীর ধারে বাঁধের বটতলায় দাঁড়িয়ে মোড়ল হরিবোলার নদী পেরুনো দেখে তারিয়ে তারিয়ে।

গমক্ষেতের মুনিশকে শুনিয়ে বলে, 'ইঃ! যেন চিতেবাঘের বাচ্চা! যতক্ষণ লদির ইধারে, ততক্ষণ নিমুন্‌খো ষষ্ঠি—যেন ক্যালাগোবিন্দাই বটে। যেই লদিটি পেরুলো, আর উইরকম। চেহারিটিও বদলে যায়।'

মুনিশ মুখ তুলে বলে, 'কার কথা বুলছেন মুরোলমশাই?'

'এই হরিবুলা হে।'

'অ, হরিবুলা।'

হরিবোলার চেরা গলার গান ভেসে আসে ওপারের প্রান্তর থেকে, 'দড়কা

লখির উধারে / যৈবন পড়্যে আছে হে…' মোড়লমশাই প্রত্যঙ্গ চুলকোতে চুলকোতে খিকখিক করে হাসে। 'আই, শুনছ শালোব্যাটার রসের কথা? এখনও গুয়োর ডিম ভাঙেনি। যৈবন চিনেছে।'

মুনিশ বলে, 'আচ্ছা মুরোলমশাই, হরিবুলার মায়ের খবর কী?'

'শুনেছি টাউনে আছে—ওইটুকুনই।'

'হরিবুলা মায়ের কথা কিছু বুলে না মুরোলমশাই?'

'নাঃ!' ধানু মোড়ল মুখ বাঁকা করে গম্ভীর হয়। 'আমার কাছে কি কষ্টতে আছে? থাউক না। টিকতে পারলে বিভা দুবো। বাড়ির পেছনে জায়গা-থল দুবো। থাউক।'…

রাঙাদাসী এক আশ্চর্য মেয়ে। আশ্চর্য—কারণ তার গায়ের রঙটা ছিল বাবুবাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা। চোখদুটো কয়রা—বিড়ালচোখী বলে যাদের। সাজতে-গুজতে ভালোবাসত। ভালোমন্দ জিনিসটাতে ছিল প্রচণ্ড লোভ। গউরের মতো একটা লোক কেমন করে তাকে ভাগিয়ে এনেছিল, সেও এক আশ্চর্য। গউরও অবশ্য একটু শৌখিন এবং টাউনমুখো মানুষ ছিল। রিকশোও চালিয়েছিল মাসকয়েক। তারপর হাঁপের অসুখ বাঁধিয়ে ঝটপট মরে গেল। রাঙাদাসী কোলের ছেলেটাকে নিয়ে সেই থেকে ধানু মোড়লের বাড়ি কাজকর্ম করতো। ভিটেমাটি বেচে মোড়লবাড়িতে উঠেছিল শেষে। গিন্নির সঙ্গে কলহ করে টাউনে চলে গেল। গউর তাকে টাউন চিনিয়েছিল, নাকি সে গউরকে, এও একটা আশ্চর্য।

আরো কিছু আশ্চর্য আছে।

রাঙাদাসীর নাকি আরেক নাম ছিল হরিমতী। গউর ডাকত হরিমতী বলে। সেই শুনে সদ্য মুখফোটা ছেলেটাও হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ভিটেয় চরতে চরতে দুঃখকষ্ট পেলে চেঁচিয়ে ডাকত আধো-আধো 'হয়ি' বলে। রাঙাদাসী হাসতে হাসতে বলত, 'আরে আমার হরিবুলা সোনারে! হরি বলতে শিখেছে আমার ময়নাপাখি রে!' সেই থেকে ছেলেটা হরিবোলা হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে চাউর হয়, মেয়েটা ছিল মল্লারপুরের ঝুমুরদলের।—সেই যারা মেলার আসরে মাঝরাতে কোমর মুচড়ে নাচে এবং গায়, 'বঁধু, লাও বা না লাও/ মুখ দেখে যাও / বাসি কাচের আয়না।' বাসি ভাতের বা বাসি ফুলের মতো আয়নাও বুঝি বাসি হয়। নিঝুম দুপুরে মোড়লের ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে

আনমনে রাঙাদাসী বা হরিমতী গুনগুন করে গান গাইতো। মোড়লগিন্নি কান করে শুনে বলতো, 'গাইবি তো ঝেড়ে গা দিকিনি বাপু!' রাঙাদাসী থতমত খেয়ে বলতো, 'উ কিছু লয় গিন্নিমা!' সে বুঝতো, গিন্নি বলছে বটে মুখে, পরে তাই নিয়ে খোঁটা দেবে। বাজারী, গানেউলি, ঝুমরি-টুমরি বলতেও বাঁধবে না।

হরিমতী র‍্যাশংকাডে হয়েছিল রাঙাদাসী। সেই র‍্যাশংকাড ধান্নু মোড়লের জিম্মায় আছে। চিনিটা আর ক্যারাচ্‌তেলটার খুব আকাল পাড়াগাঁয়ে লেগেই আছে। লরেন্দ মাস্টের ডিলার। ঠাট্টা করে এখনও বলেন, 'কী মোড়লমশাই, রাঙাদাসীর কোটা আর কতকাল নেবে? ছেড়ে দিলে আরেক গরিবগুবরোর বেনিফিট হয়।'

মোড়ল হ্যা হ্যা করে হাসে। 'আঙাদাসী নাই। উয়ার ছেলেটা কি মিথ্যে মশাই? তার চিনিটা ত্যালটা লাগে না?'

লরেন্দ চোখের নৃত্যে বলেন, 'তোমার বাগালকেও চিনি দাও বুঝি? কিসে দাও মোড়ল? সরবতে, না গুড়ে?'

ধান্নু মোড়ল মনে মনে চটে। বলে, 'ক্যানে? চা। চা খায়।'

'বলো কী! চা খায় তোমার বাগাল?'

লোকে হাসলেও রাখাল-বাগাল, মুনিশ-মাহিন্দার আজকাল চা খায়, এও সত্যি। ধান্নু মোড়লের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু রাঙাদাসীও চা খেত। তার ছেলে হরিবোলাও মায়ের বাটির তলানিটুকু চুকচুক করে টানতো। পরে সেও মায়ের কাছে রোজ সকালবেলা বাটিভরা চায়ের দাবি তুলতো। তবে ছেলেটা যখন দ্বারকা নদীর ওপারে যেতে শিখলো, তখন তার কাছে চা তুচ্ছ হয়ে গেল। দিনে দিনে বদলে গেল সে। রাঙাদাসী অবাক হয়ে তার ছেলের বদলে যাওয়া দেখতো।

রাঙাদাসী গউরের কুঁড়েঘরের উঠোনে যে ছেলেকে পায়ের ওপর শুইয়ে তেলকাজল দিতে দিতে স্থর ধরে বলতো, 'আমার ধোন ইস্কুলে পড়বে রে! নেকাপড়া শিখে চাকুরি করে আমাকে খাওয়াবে রে!'—সেই ছেলে যায় দ্বারকা নদীর ওপারে গোরুর পাল নিয়ে। তার চুলে গোঁজা থাকে ট্যাসকোনা পাখির পালক। তার কাঁধে থাকে শালিখপাখির ছানা। নুড়ি দিয়ে ঘাসফড়িং খোঁজে। কতরকম নাম জানে ঘাসফড়িঙের—ঘরপোড়া, তল্লা, বাজ। রুক্ষ কাঁকরে ডাঙায় বেঁটে লালরঙের ফড়িংগুলো ঘরপোড়া। কুপির আলোয় বাঁশের চোঙা থেকে সারাদিনের সংগ্রহ সে মাকে দেখাতো। লম্বাটে সবুজ ফড়িং দেখিয়ে বলতো,

'ইণ্ডলান তল্লা।' বেঁটে, ধূসর ডানা, তলার দিকটা ফিকে সবুজ আর পেট জুড়ে ফুটকি—'ই দ্যাখো মা, বাজ।' তার পাখিটাও ছিল পেটুক। খাঁচা ছিল না বলে তাকে বেড়াল এসে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হরিবোলা দুদিন পরে আবার একটা নিয়ে আসবেই। তার তখন পাখি-ঘাসফড়িংদের পৃথিবীতে চলাফেরা। ইস্কুলের উল্টোদিকে সেখানে যাবার রাস্তা, সেই রাস্তায় রাঙাদাসীর চোখের সামনে হেঁটে গেল তার হরিবোলাটি। দেখতে দেখতে একটুকুন হয়ে মিলিয়ে গেল কাশকুশের বিশাল প্রান্তরে।

আর প্রতিদিন ফিরে এসে সে মায়ের কাছে সেখানকার গল্প বলতো। সিঙা-কুড়ির জামগাছটার কাছে কী ঘটেছিল, বাঁওড়ের ধারে কত কুল পেকেছে (সেই কুলের কিছু নমুনাসহ), আজ বলাই সিঙ্গির সঙ্গে মেছুনীদের ঝগড়া হয়েছিল কী নিয়ে—এইসব। সে বলতো কাশবনের কথা। বিলের জলে শাপলার ঝাঁকের কথা। একলা কোনো হিজলগাছের অন্ধ পক্ষীর কথা, বুড়ো যোগীবর আর একটা হাট্টিটি পাখির কথা। দিনমান সে টিট্টি করে ডেকে বেড়ায়। যোগীবরও জানে না তার বৃত্তান্ত। 'ক্যানে বেড়ায় মা? রাঙাদাসী জানে না। চিমটি কেটে বলতো, 'মুখ ধরে যায় না তুর? ইবারে লোক্ করে ঘুমোদিকিনি!'

হরিবোলা লোক্ (চুপ) করবে না। এরপর বলবে মাঠকুড়োনি মেয়েদের কথা। শেষে পরামর্শ দেবে। 'তু ক্যানে যাস নে মা লখির উধারবাগে! বাগদী-মাসিরা যায়। সব্বাই যায়। ভাদুর মা যায়। তু ক্যানে যাস্ নে মা?'

রাঙাদাসী রাগ করে বলবে, 'আমার মরণ!'

'ক্যানে মা, মরণ ক্যানে?'

রাঙাদাসী আস্তে বলবে, 'আমি মাঠঘাটে কখনো ঘুরিনি বাছা। ছরত্তে ওদবাতাস সয় না। চেরটাকাল টাউনবাজারে মানুষ হইছি—পারি না।'

প্রেম হরিমতীকে পাড়াগাঁয়ে ভাসিয়ে এনেছিল। সে রাঙাদাসী হয়েছিল। তার প্রেমের বয়স চলে যায়নি, কিন্তু প্রেমিকটি মারা পড়েছিল। এই ছেলেটা না থাকলে রাঙাদাসী আবার হরিমতী হবার জন্য পা বাড়াতো। কিন্তু কোলে ছেলে থাকলে হরিমতী হওয়া বড়ো সমস্যা। সে যেন হরিবোলার বড়ো হওয়ার দিন গুণছিল। বড়ো হতেই চলে গেল…

মাঘে যখন দ্বারকা নদীর শিয়রে বুড়ো শিমুল গাছটা মাথায় লাল ফেট্টি জড়ালো, ধানু মোড়লের আমের গাছে ফুটলো লালহলুদ শিসালো মুকুল, তখন একদিন

নরেন্দ্র' মাস্টেরের ভাই মলিন্দ এসে বলল, 'ও মোড়লমশাই, তোমার বাগাল কোথা ?'

ধানু মোড়ল মোড়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল ঢ্যারা ঘুরিয়ে। অবাক হয়ে বলল, 'ক্যানে বাবা মলিন্দ ?'

মলিন্দ চোখে ঝিলিক তুলে বলে, 'রাঙাদাসীর সঙ্গে কাল দেখা হলো মেদিগঞ্জের বাজারে।'

মোড়ল শুধু বলে, 'অ'।

মলিন্দ খিক খিক করে হাসে। 'সে রাঙাদাসী আর নাই মোড়লমশাই। এক্কেবারে ফিলিম-ইস্টার।'

'অ'।

'কী পরনের ডেরেস, কী জেকচার-পশচার ! ঠোঁটে লিপিষ্টিক ! বুঝলে তো ?'

'অ'।

মলিন্দ আরো হেসে বলে, 'ধুত্তেরি ! খালি অ অ করে। বুঝলে কিছু ?'

ধানু মোড়ল একটু হাসে। 'তা না হয় বুইলাম। কিন্তুক কী কথাবাত্তা হলো তুমার সঙ্গেতে ?'

প্রথমে তো চিনতেই পারে না, এমন ন্যাকামি মাগীর। তো আম্মো বাবা ছিনে জোঁক। শেষে নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।' মলিন্দ বারান্দার চৌকিতে গিয়ে বসে। বিস্তারিত বলার ইচ্ছায় একটা সিগারেট ধরায় এবং মোড়লকেও দেয়।

মোড়ল ফুকফুক করে টেনে বলে, 'হরিবুলার কথা জিগ্যেস কল্লে না ?'

'বলছি. শোনই না।' মলিন্দ লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলে। 'প্রথমে তো একথা-সেকথা—গাঁয়ের কার কী খবর; তারপর বললে, হরিবোলা কেমন আছে, কী করছে এইসব। আমি বললাম, মোড়লমশাইয়ের বাড়িতে আছে, ভালোই আছে। খারাপ থাকবার তো কথা না। তবে তুমি এখানে কী করছ, তাই বলো।'

'জিগ্যেসা কল্লে তুমি ?'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ। আমি বাবা ছিনে জোঁক। না শুনে ছাড়বো না। সেও কিলিয়ার করে বলবে না। শেষে বলল, এক বাবুর বাড়ি কাজ করছে। টাউনবাজারে আজকাল ঝিয়ের অভাব—ভালোই মাইনেকড়ি পাচ্ছে।'

মোড়ল বলে, 'মিথ্যে।'

'মিথ্যে তো বটেই—সে কি আমি বুঝি না? ঠোঁটে লিপিস্টিক!' মলিন্দ খ্যা খ্যা করে হাসে। শেষে বললাম, 'তা তুমি তো দেখছি ভালোই আছ। ছেলেটাকে দেখে আসবে না একবার? চলো আমার সঙ্গে।'

'ত্যাখন কী বল্লে?'

'বললে সময় পাই না—এত কাজ। পেলেই যাব। নিয়ে আসব।'

মোড়ল নড়ে উঠে সোজা হয়। 'কী বল্লে, কী বল্লে?'

মলিন্দ আশ্বস্ত করে বলে, 'নিয়ে যাবে কোথা? ছেলে সঙ্গে থাকলে ও বিজনেস তো পণ্ড। বুঝলে না? শেষে আমাকে সঙ্গে করে জামা-কাপড়ের দোকানে গেল। এই দেখ, কীসব কিনে দিয়েছে হরিবোলার জন্যে।'

এতক্ষণে ধানু মোড়লের চোখ পড়ে প্যাকেটটাতে। তাচ্ছিল্য করে তাকিয়ে বলে, 'কী আছে বলো দিকিনি?'

'একটা পেণ্টুল, একটা জামা। বললে, পায়ের মাপ জানা থাকলে জুতোও কিনে দিতাম। একবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও বললে। বলে আবার কী মনে হলো, বললে, থাক। নিজেই যাব একদিন।' মলিন্দ জামা আর হাফ পেণ্টুল মোড়লকে দেখিয়ে আবার ভাঁজ করে প্যাকেটস্থ করে। চাপা হেসে বলে, 'ঠিকানা নির্ঘাৎ বাগানপাড়ার গলি—সে ঠিকানা দেবে কোন মুখে? তাই আমাকে বলল।'···

যাবার সময় হঠাৎ ফিরে এসে একটা ছোট্ট ঠোঙাও দিয়ে যায় মলিন্দ। ভুলে গিয়েছিল, রাঙাদাসী তার ছেলের জন্য লজেন্সও কিনে দিয়েছে। নগ্ন চৌকিতে সেগুলো পড়ে থাকে কতক্ষণ। ছুঁতে ইচ্ছে করছিল না ধানু মোড়লের। মোড়ল-গিন্নি জানতে পারলেও সমস্যা। তার বড্ড ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক।

কিন্তু না জানিয়েও থাকা যায় না। দড়ি পাকানো শেষ করে আস্তে-সুস্থে উঠে দাঁড়ায় ধানু মোড়ল। কাঁচা-পাকা চুল আর গোঁফে হাত বোলায়। তারপর প্যাকেট দুটো বাঁ-হাতে তুলে চালের বাতায় গুঁজে রাখে।

নদীতে স্নান করে এসে খেতে বসার সময় মোড়ল ফিক করে হাসে। 'একটা খবর শুনলে গো? আঙাদাসী মেদিগঞ্জতে আছে। যা বলেছিলে তুমি, তাই। বেউশ্যেতে নাম নিকিয়ে বসে আছে। মলিন্দ বলে গেল।'

নাক বাঁকা করে মোড়লগিন্নি বলে, 'মরুক বারোভাতারি। খাবার সুময়ে উ কী কথা?'

'নাঃ—বলছি কী, হরিবুলার জন্যেতে জামা-পেণ্টুল আর লেবেনচুষ পাঠিয়ে

দিয়েছে মলিন্দর হাতে।'

মোড়লগিন্নির চোখ বড়ো হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, 'সত্যি নাকিন ?'

'সত্যি বৈকি। বাইরেকার ছাঁচবাতায় গুঁজে থুয়েছি। দ্যাখো গে—পেত্যয় না গেলে।'

মোড়লগিন্নি থম থম করে উঠে যায়। মোড়ল কতক্ষণ তার ফেরার অপেক্ষা করে। ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সন্দিগ্ধভাবে দ্রুত আহার শেষ করে নেয়। তারপর যখন উঠোনের কোনায় লেবুগাছটার কাছে ঘটি থেকে জল ঢেলে আঁচাচ্ছে, তখন মোড়লগিন্নি তেমনি থম থম করে ফিরে আসে। মুখখানা জ্বলছে দাউ দাউ করে। নাসারন্ধ্র স্ফীত।

মোড়ল একটু হেসে বলে, 'দেখলে ?'

প্রৌঢ়া জবাব দিল না। টিউকলে গিয়ে রগড়ে হাত ধুতে থাকল।...

কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যাবেলায় দ্বারকা নদীর ওপার থেকে গোরু চরিয়ে বাগাল হরিবোলা ফিরে এসেছে। চেরা গলায় বাইরে যথারীতি 'গিন্নিমা, আলো' বলে চিক্কুরও ছেড়েছে। গিন্নিমা লণ্ঠন দেখিয়েছে এবং সে গোরুবাছুর গোয়ালে বেঁধে ফেলেছে। তারপর অন্ধকারে ডোবার জলে হাত-মুখ-পা ধোয়া-পাখলা করে সর্ষের তেলটুকুনও চেয়ে নিয়েছে। গায়ে-গতরে মেখে উঠোনের কোনায় বসে তেমনি চিক্কুর ছেড়েছে, 'গিন্নিমা ! ভাত দ্যাও।'

উঁচু দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলছে নিচের উঠোনে সেই আলোর হলদে চকরা-বকরা ছটা খানিকটা। একটু তফাতে বাড়ির কুকুরটার বিরাট ছায়া পাঁচিলের গায়ে, লেজটা নড়ছে, মুখটা হাঁ। হঠাৎ একমুঠো গিলেই হরিবোলা আরেক চিক্কুর ছাড়ে, 'গিন্নিমা, গিন্নিমা ! আমার জামা-পেন্টুল ? আমার লেমুনচুষ !'

মোড়লগিন্নি গুম হয়ে বলে, খাবি তো খা দিকিনি বাপু ! পরে উসব কথা।'

হরিবোলা হদ্দমুসলো, সে তো মিথ্যে নয়। দিনমান জানোয়ারের সঙ্গে বনে-প্রান্তরে বাস, বাগাল। বাগালের গোঁ। একটু পিছিয়ে গিয়ে চ্যাঁচায়, 'আগে দ্যাও, তমে খাব !'

মোড়লগিন্নি ফুঁসে ওঠে। 'শুনছ, শুনছ তুমার বাগালের কথা ? কেমুন বুলি ফুটেছে শুনছ ?'

দাওয়ায় মোড়া থেকে ধানু মোড়ল খুক খুক করে হাসে। 'অ হরিবুলা ? কে

তুকে বল্লে জামা-পেণ্টুলের কথা ?'

হরিবোলার দাঁত চকচক করে। 'মাস্টেরের ভাই মলিন্দবাবু বুললে, তুর মা তুকে জামা-পেণ্টুল দিয়েছে। লেমুনচুষ দিয়েছে!' সুর ধরে আওড়ে সে এঁটো হাতটাও ওপরে তুলে নাচতে থাকে।

মোড়লগিন্নি বেগতিক দেখে চাপা গলায় বলে, 'উ জিনিস ছুঁতে নাই, হরিবুলা। বয়েস হলে বুইতিস, ক্যানে ছুঁতে নাই। ভাতগুলান খা দিকিন দয়া করে। মুড়োল তুকে লতুন জামা-পেণ্টুল কিনে দিবে।'

মোড়ল ঘোষণা করে, 'দুবো। কটা দিন অপিক্ষা কর! ক'বস্তা চাল বেচতে যাব আড়তে। তুকেও লিয়ে যাব। এখুন যা কচ্ছিস, তাই কর।'

ক্যালাগোবিন্দা বাগাল অমনি শান্ত হয়ে বলে, 'লিয়ে যাবা তো মুরোল?'

'হুঁ, হুঁ, লিয়ে যাব। তুর মা-জননীকেও দেখে আসবি।'

ঝোঁকের বশে ধানু মোড়ল একথাও বলে ফেলে এবং তারপর ভাবে, বলেই যখন ফেলেছে, মুখের কথা বৈ নয়। কোথায় রাঙাদাসী থাকে, সঠিক জানা নেই —মলিন্দেরও। তবে জানা থাকলেও সাধুগিরি করে মায়ে-ছেলেতে মিলিয়ে দিলে উল্টে হয়তো নিজেরই বিপদ বাধবে। পেটভাতায় এমন খাঁটি বাগাল পাওয়া সহজ নয়। বছর সন মাইনেকড়ি আছে, তার ওপর বাবা-মাকে ধান ধার দাও, এটা দাও ওটা দাও—সম্বচ্ছর ঝামেলা। হরিবোলার সে ঝামেলা নেই।

রাতে বিছানায় শুয়ে মোড়ল বউকে চুপিচুপি বলে, জিনিসগুলান আঁস্তাকুড়ে না পুঁতলেও পারতে। মেয়েটা বেউশ্যে হয়েছে, জিনিসগুলান তো হয়নি!

মোড়লগিন্নি গর্জন করে বলে, 'থামো তুমি! বুইতে পাল্লে না ক্যানে দিয়েছে, এত যে মুড়োলি মেরে বেড়াও গাঁয়ে।'

মোড়ল কেঁচো হয়ে বলে, 'ক্যানে দিয়েছে বলো দিকিনি?'

'নোভ দেখাতে। ক্রিমে ক্রিমে নোভ বাড়বে জামা-পেণ্টুল পরে। ত্যাখন আর তুমার বাগালী করবে ভেবেছ নাকিন? টাউনবাগে দৌড়ুবে না?'

মাথা নেড়ে মোড়ল বলে, 'ঠিক, ঠিক।'

'মাগী টোপ ফেলেছিল।' শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে মোড়লগিন্নি পাশ ফিরে বলে, 'তমে সত্যি যদি ই বাগে আসে, উয়ার চুল কেটে ন্যাড়া করে ফেরত পাঠাব। নখাই, যদু, মুকুন্দ—সবাইকে বলে রেখেছি। ই মাটিতে পা দিয়ে একবার দেখুক না কলঙ্কিনী!'

বিবেচক মোড়ল আস্তে বলে, 'আহা, ছেলেটা তো উয়ার। চাইলে আইনত

ধস্মত…'

মোড়লগিন্নি বাঘিনীর গর্জনে বলে, 'তুমি থামো! ভালোমানুষী কত্তে হয়, বারোয়ারিতলায় যাও।'

'আহা, হরিবুলা যদি যেতে চায়?'

'যাবে না।' হঠাৎ শান্ত অথবা নিস্তেজ হয়ে যায় প্রৌঢ়া মেয়েটি। 'লদির উধারে হরিবুলার মন বসে যেয়েছে। তুমি দেখো, উ কক্ষনো যাবে না।'…

যাবে না, কারণ দ্বারকা নদী পার হলেই সে এক অন্য হরিবোলাটি। দিনমান তার চোখে ছবির মতো আঁকা হয় কাশকুশের ধূসর ব্যাপকতা, দাগড়া দাগড়া হলুদ সর্ষে ফুলের ছোপ কাছে এবং দূরে, শালিক পাখির ডিম হয়ে থাকা চিত্রিত নীলাভ আকাশ, আর ওই একলা ওড়া হট্টিট পাখিটার টি টি টি ডাক। বিলের জলে আকাশ থেকে বাঁকা এক রেখা ঝপাং করে পড়তেই একঝাঁক জলহাঁস ফুটে ওঠে। কখনো বন্দুকের শব্দে বিশাল নৈঃশব্দ খানখান হয়ে যায়, এবং বাতাসে কিছুক্ষণ বারুদের কটু গন্ধ। তারপর আবার সব শান্ত, চুপচাপ। আবার ঘাস ফড়িংয়ের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে বাগালছেলের চেরা গলায় চিৎকার, 'বীণামাসি গো! নে-দে-ছে-এ-এ!' মোড়লের গোরু নাদলে বীণামাসি ছাড়া আর কাউকে দেবে না হরিবোলা। পা দিয়ে গোবরটা থুপথুপ করে গুছিয়ে রাখবে। মাঠকুড়োনি মেয়েটার আসতে দেরি হলেও ওটা আর কেউ ছোঁবে না। অলিখিত আইন এই মাঠের পৃথিবীতে।

এর মধ্যে দিনটা কেটে যায় হরিবোলার। তার ইচ্ছে করে একটা দলের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু মোড়লের কড়া নিষেধ। পাঁচজন বাগাল দল বাঁধলেই খেলতে মন দেবে। তখন গোরু গিয়ে কার ফসল খাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। তাই হরিবোলা একলা হয়ে ঘোরে। বাঁওড়ের ধারে গিয়ে যোগীবরের কাছে নানারকম গল্প শোনে। গোরুগুলো আপন খেয়ালে চরে বেড়ায়। ক্রমশ গোচর মাটির সীমানা কমে যাচ্ছে। আবাদ বাড়ছে। বুড়ো যোগীবর বহুদূর দৃষ্টি চালিয়ে বলে ওঠে, 'সব আবাদ হয়ে যাবে, বুইলি হরিবুলা? বাঁধ হবে-হবে শুনছি। হলে পরে উই উলেকাশের বন, উই বিল, হ বাঁওড়—সবখানে লাঙল পড়বে। ত্যাখন হরিবুলা, ত্যাখন গোরু চরাবি কতি রে, অ্যাঁ?'

খুব হাসে যোগীবর। হরিবোলা বলে, 'যাঃ!'

'যাঃ লয়। দেখবি কী হয়।'

হরিবোলা ওসব ভাবে না। কিন্তু বিলের জলে লাঙল পড়ার কথা শুনে সে ভারি অবাক হয়। বলে, 'যুগীকাকা, ওগো যুগীকাকা! বিলের জলে লাঙল পড়বে কেমুন করে? বলদ ডুবে মরবে না?' তার টানাটানা চোখ বিলের দিকে প্রসারিত হয়।

'ওরে বাছা, ত্যাখন কি জল থাকবে? বাঁধ পড়লে বছরে বছরে শুকিয়ে যাবে।'

হরিবোলা অত ভাবতে পারে না। সে যখন হবে, তখন হবে। 'অ যুগীকাকা, হেজলতলার পেত্নীটার কথা বুলো না! আর দেখা হয়নি তুমার সঙ্গে?'

যোগীবর হাসে। মাথা নেড়ে বলে, 'হয়েছিল বৈকি! তবে উহ দ্যাখ বাপ, তুর ধলি গোরুটা বুঝি মুখ দিলে গমের চারায়।'

হরিবোলা নড়ি তুলে চ্যাচাতে চ্যাচাতে দৌড়তে থাকে। মেহদু কসাইয়ের নাম করে শাসায়। বলে, 'মেহদুকে দুবো—হঁ্যা।'

গোরুগুলোকে সে ভালোবাসে। খুঁটিয়ে তাদের শরীর দেখে। ঘা থাকলে দুব্বো ঘাস কচলে ঘষে দেয়—যোগীবরের পরামর্শে। গোঁদল পোকা ছাড়িয়ে দেয় পেট থেকে। কমবয়সী বাছুর গোরুটাকে সে কোলে নিয়েই পার করে নালা খানাখন্দ। তখনো তার কাঁধে শালিখছানা। চুলে ট্যাসকোনা পাখির পর গোঁজা। কোথাও এই পর পেলে সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নেয়। মোড়লের খড়কাটার কুঠুরির নিচু চালে অনেক পর গোঁজা আছে।

এই জীবন হলো বাগালের। তারও আছে অনেক রীতিনীতি, অনেক প্রথা, ইতিহাস। হরিবোলা তার অন্তর্গত। তার কপালে আঁকা আছে রাখালফোঁটা। নড়ির ডগায় ঘষে ঘা করে সেই ঘা শুকোলে ওই গোল ফোঁটা কালো হয়ে ফুটে থাকে দুই ভুরুর মধ্যিখানে। এই ফোঁটা দিয়ে দ্বারকার ওপারে রাখালের একদিন অভিষেক হয়। হরিবোলারও হয়েছে। সে রাখালী ছেড়ে কোথাও যাবে না। গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলেই সে নদীপারের এই ব্যাপকতায় উড়ে বেড়ায় পাখপাখালির মতো। এখানে অবাধ স্বাধীনতা তাকে চিতাবাঘের বাচ্চা করে ফেলে। তার চলার ভঙ্গি যায় বদলে। চাহনিতে ফুটে ওঠে বন্য প্রাণীর চাঞ্চল্য। সে গলা ছেড়ে গান গায়, 'দড়কা লখির উধারে / যৈবন পড়ে আছে হে…' যদিও তার যৌবন এখনও বহুদূরে। সেই যৌবন এলে কি ঘটবে, তাও সে ভাবে না। ফাঁড়িঘাসের বনে, হিজল-জারুল-ভাঁড়ুলে গাছের জঙ্গলে, কিংবা বাঁওড়ের ধারে

সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে তার মনেও হয় না যে একদিন এই বাগালীজীবনের পর তাকে মুনিশ হয়ে ক্ষেতে নামতে হবে এবং তার এই সিধে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে ফসলের শীষের দিকে। যে মাটিকে সে পা দিয়ে ছুঁয়েছে, সেই মাটি হাত দিয়ে তাকে ছুঁতে হবে — একথাও বোঝে না সে।

এখন হরিবোলা সে-হরিবোলাটি নয়। তার আদুড় শরীরে এখন ঘাসের গন্ধ, বিলের জলের গন্ধ। খড়কাটা ঘরে কুঁকড়ে শুয়ে নিজের বুকের ওইসব প্রাকৃতিক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার অবচেতনায় সারা রাত দ্বারকা নদীর ওপারের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বুড়ো যোগীবরের মতো পাহারা দেয়।…

চৈত্রে ধানু মোড়লের মেয়ে-জামাই এসেছে। জামাই খুব সিগারেট খায়। সকালে হরিবোলাকে ডেকে বলে, 'অ্যাই ছোঁড়া, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দে তো! শোন্, এই প্যাকেটটা নিয়ে যা। বলবি এই সিগারেট দাও।'

হরিবোলা টাকা নিয়ে দৌড়ুতে থাকে। লরেন্দ মাস্টেরের ভাই মলিন্দ সম্প্রতি মনোহারি দোকান দিয়েছে গ্রামে। সিগারেট সেই বেচে। হরিবোলাকে দেখে বলে, 'দাঁড়া হরিবুলা, কথা আছে।'

হরিবোলা বলে, 'টক্ করে সেকরেট দ্যাও বাবু, গোচ্চরাতে যাব।'

মলিন্দ হাসে। 'দাঁড়া না বাঞ্চোত! কথা আছে।' সে হরিবোলার হাত থেকে টাকা নেয়। কিন্তু সিগারেট দেয় না। গলা চেপে বলে, 'সেই যে তোর মা জামা-পেন্টুল দিয়েছিল, পরিসনি?'

হরিবোলা মাথা নাড়ে। নির্বিকার মুখে বলে, 'মুরোলগিন্নি দেয়নি। লেমুনচুষও দেয়নি।'

'হুঁ। যাবি তোর মাকে দেখতে?'

হরিবোলা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে।

মলিন্দ চাপা ধমক দেয়, চোখে হাসি। 'বল্ না, যাবি নাকি মাকে দেখতে? তোর মায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। আমাকে বলে তোকে নিয়ে যেতে। যাবি?'

হরিবোলা আস্তে বলে, 'মুরোল বকবে।'

'ধুর ব্যাটা! লুকিয়ে যাবি।'

হরিবোলা একটু হাসে এবার, 'গোরুগুলান কে চরাবে?'

'আর কোনো বাগালকে গছিয়ে দিবি। তারটা একদিন চরিয়ে শোধ করবি।'

এমন প্রথা অবশ্য আছে। তবু হরিবোলা ভাবে। শেষে হাত বাড়িয়ে বলে, 'জামাইদাদার সেকরেট দ্যাও।'

'তাহলে যাবি না? অ্যাই ছোঁড়া, মাকে দুঃখু দিবি? তুই তো বড্ড নেমকহারাম।'

হরিবোলা মুখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো-আঙুলে মাটিতে আঁচড় কাটে।

মলিন্দ ফিসফিস করে বলে, 'তোর মা খুব কান্নাকাটি করছিল। গাঁয়ে আসতে সাহস পায় না মোড়লগিন্নির ভয়ে। তাছাড়া···ওসব তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। মোটকথা, তোর মায়ের আসা কঠিন। তুই আমার সঙ্গে যাবি, চলে আসবি দেখা করে। কেমন?'

হরিবোলা অবশেষে আস্তে মাথাটা দোলায়। তারপর গলার ভেতর বলে, 'কবে যাবা তুমি?'

'কাল মাল আনতে যাব। খুব সকাল সকাল যাব। নদীর ব্রিজে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তুই চলে আসবি।···'

এদিন হরিবোলার কেমন ভাবুক চেহারা। গোরু নিয়ে গেল কেমন তুম্বো মুখে। মোড়লগিন্নির থাপ্পড় খেয়েও সে মুখ খোলেনি। কিন্তু নদীর ওপারে গিয়ে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। যোগীবরের কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না। নিরিবিলি ঘুরে বেড়ালো গোরুর পালটা নিয়ে। মায়ের কথা ভেবে খুব খুশি হচ্ছিল হরিবোলা। মায়ের কথা বেশি করে মনে পড়ছিল। মায়ের সেই গান-খানাও গেয়ে ফেলল সে, 'বঁধু লাও বা না লাও / মুখ দেখে যাও / বাসি কাচের আয়না···'

তারপর গেল দুধসরের ধারে। বাগালদের জোট সেখানে ভাঁড়ুলে গাছে ঝালঝুল্লা খেলছে। নালার জলে চিহ্নিত শেকড় থেকে ভিজে চালের ন্যাকড়াটা তুলল সে। তারপর দলটার দিকে তাকালো।

পাতকুড়োকে খুঁজছিল সে। পাতকুড়োর সঙ্গেই তার যত বন্ধুতা। ছেলেটা খুব লক্ষ্মী। চোখে চোখ পড়তেই হরিবোলার চালের লোভে দৌড়ে এল খেলা ছেড়ে। দলপতি তাকে শাসাচ্ছিল, 'শালোকে পাল থেকে বেংড়ে দুবো!' কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে।

পাতকুড়ো হাসিমুখে বলল, 'ইদিক বাগে দেখেই বুঝেছি, হরিবুলার চাল ভিজুনো ছিল ন্যালায়। ইঃ, জানলে পরে খেয়ে শ্যাষ করে দিতাম।'

হরিবোলা মিঠে গলায় বলল, 'দিতিস তো দিতিস! এই লে।'

দুজনে কুড়মুড় করে চাল খায় নাটাকাঁটার ঝোপের আড়ালে। তারপর কথাটা তোলে হরিবোলা। যাবে আর বেলাবেলি ফিরে আসবে। মায়ের কাছে

বাসমোটরের ভাড়া চেয়ে নেবে। সাঁকোর কাছে নেমে সোজা এখানে চলে আসবে। গোরুগুলো বুঝে নিয়ে বেলা যদি থাকে, চরাবে—নৈলে ডাকিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে।

পাতকুড়ো রাজি। গেরস্থর চোখের আড়ালে বাগালে বাগালে এমন বোঝা-পড়া চিরকালের।...

পরদিন সকালে তর সইছিল না হরিবোলার। বাড়িতে জামাই বলে ধানু-মোড়ল আজ আর নদী পর্যন্ত আসেনি। নদীর ওপারে পাতকুড়োকে পালটা বুঝিয়ে দিয়ে হরিবোলা দৌড়ুতে থাকে নদীর ধারে ধারে।

ব্রিজের মাথায় মলিন্দ সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার বড়ো গরজ। রাঙাদাসী এখন মেদিগঞ্জের বাগানপাড়ার গলিতে মধুবালা হয়েছে। মলিন্দ তার প্রেম পেয়েছে। যখন রাঙাদাসী গ্রামে ছিল, তখনও মলিন্দ ঘুরঘুর করতো বটে, পাত্তা পায়নি। তাছাড়া মেয়েটার মতিগতিও অন্যরকম ছিল।

শুধু অবাক লাগে মলিন্দের, প্রস হয়েও ছেলের জন্য টান থাকে সে কল্পনাও করেনি। বাগানপাড়া গলিতে ঢোকার অভ্যাস তার অনেকদিনের। সেখানে গউরের বউকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু মোড়লকে তো এসব কথা বলা যায় না।

টাউনবাজারে এই প্রথম আসা হরিবোলার। সে একেবারে জড়োসড়ো, একটুকুনটি। মলিন্দ সাইকেল থেকে নেমে তার কাঁধ ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। অনবরত বোঝায়, যেন গ্রামের কাকপক্ষীটিও টের না পায়। বারবার বলে, 'কাউকে বলবি নে তো হরিবোলা? বললে তোকে কেটে ফেলব কিন্তু।'

বন্যপ্রাণীর চাউনিতে হরিবোলা রঙবেরঙের ঘর-বাড়ি আর মানুষজন দেখে। ভেবে কুল পায় না এখানে তার মা থাকে!

কতদুর হেঁটে একটা আড়তে সাইকেল জিম্মা দিয়ে মলিন্দ বলে, 'আয় হরিবোলা!'

এ-গলি ও-গলি আরো কতদুর গিয়ে একটু দাঁড়ায় সে। আবার বলে, 'আয়।'

গলির দু'ধারে খোপবন্দী ঘর। টালি বা খাপরুলের ছাউনি। দরজায় বসে ও দাঁড়িয়ে আছে নানাবয়সী মেয়েরা। হরিবোলা পিটির পিটির তাকিয়ে হাঁটে। একটা ঘরের দরজায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল এক মেয়ে, পরনে লাল রঙের শাড়ি। মলিন্দ আস্তে 'মধুবালা' বলে ডাকতেই সে ঘোরে।

সেই কয়রা বেড়ালচোখ। সেই রাঙা ছিপছিপে গড়ন। তবু হরিবোলা চিনতে পারে না। মলিন্দ বলে, 'কী রে ছোঁড়া? মাকে চিনতে পারছিস না! এ জন্যেই মোড়ল বলে ক্যালাগোবিন্দা।'

রাঙাদাসী খপ করে হরিবোলাকে ধরে একটানে ঘরে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে বলে, 'মলিন্দবাবু, তুমি এখন এস।'

মলিন্দ অবাক। খ্যা খ্যা করে হাসে। 'বাঃ! তোমার বেশ বিবেচনা মাইরি!'

'না, না। তুমি এখন এস তো। জ্বালিও না।'

'হরিবোলাকে মোড়লের কাছে পৌঁছে দিতে হবে না?'

'না। আমি বাসে তুলে দেব। তুমি যাও।'

'ঠিক আছে।'...মলিন্দ বেজার হয়ে পা বাড়ায়। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে রাঙাদাসী। মনে মনে মলিন্দ অশ্লীল গাল দিতে দিতে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। উদাস চাউনিতে তাকে দেখতে থাকা একটি মেয়েকে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'রেট?' মেয়েটি দু'হাতের দশটা আঙুল দেখায়।

'গরজ!' বলে মলিন্দ তার ঘরেই ঢুকে পড়ে।...

দরজা বন্ধ করে পেছনের একটা ছোট্ট জানলা খুলে দিয়েছে রাঙাদাসী। জানলার ওধারে খালে শুয়োর চরছে। ওপারে ঝোপঝাড়, তারপর একটা পুরনো বিশাল বাড়ি। ঘরের ভেতরটা ক্রমশ স্পষ্ট হলে হরিবোলা দেখে, তার মা তাকে জড়িয়ে মাথায় গাল রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মায়ের শরীর থেকে বা শাড়ি থেকে মিষ্টি গন্ধ মউমউ করছে। গন্ধটা তার চেনা লাগে। কিন্তু সে নির্বিকার মুখে ঘরের ভেতরটা দেখতে থাকে।

তক্তাপোশের ওপর পুরু বিছানা। এমন বিছানায় কখনো সে বসেনি। দেয়ালে অনেক ছবি ঝুলছে। মাকালীর ছবিটা সে চিনতে পারে। মোড়লের ঘরে এই ছবি আছে। মেঝের ওধারে একটা কেরোসিন-কুকার। এনামেলের হাঁড়িকুড়ি। একটা সাদা চওড়া থালা। কেটলি। অন্যপাশে ইটের ওপর বসানো সেই চেনা স্যুটকেস—তার ওপরে একটা বড়ো কালো রঙের থলের মতো—হয়তো বাক্স। তাতে কী আছে, দেখতে ইচ্ছে করে হরিবোলার।

দড়ির আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউস এইসব ঝুলছে। তারপর কোনার দিকে দুটো ইট এবং নর্দমার ঘুলঘুলিতে চোখ পড়ে হরিবোলার। ঘরের ভেতর পেচ্ছাপ করে বুঝি? তার মা এমন 'খ্যাদোড়' তো ছিল না।

'হরিবুলা !'

ধরা গলার ডাক শুনে হরিবোলা এবার মুখ তোলে।

'কী খেয়েছ সকালে ?'

'মুড়ি, গুড়। আর···' একটু ভেবে হরিবোলা বলে, 'মুরোলের জামাই মতিচুরের নাড়ু এনেছিল। তাই আধখানা দিয়েছিল।'

'ভাত খাওনি ?'

'হঁউ। পান্তা খেয়ে গোচ্চরাতে গেলাম। তাপরে···'

গালে গাল ঘষে রাঙাদাসী বলে, 'আমাকে তুর ঘেন্না করছে, বাছা ?'

'উঁ ?' হরিবোলা বোঝে না।

শ্বাস টেনে এবং ছেড়ে রাঙাদাসী বলে, 'চাট্টি ভাত খা। মাছ আন্না করেছি। আজই তুকে আনবে, জানি না তো !'

রাঙাদাসী মেঝেয় একটুকরো আসন পেতে ছেলেকে ভাত বেড়ে দেয়। হরিবোলা প্রথমে একটু অনিচ্ছা করে, পরে খুশি হয়ে খায়। রাঙাদাসী তাকে খাওয়ায়। মুখে ভাত গুঁজে দেয়। জামা-প্যাণ্টের কথা জিগ্যেস করে। হরিবোলা মোড়লের দোষ ঢাকতে মিথ্যা করে বলে, 'দিয়েছিল।'

'ই ছিঁড়া পেণ্টুল, খালি গা করে এলি যে ?'

হরিবোলা দুধের দাঁতে হাসে। 'মাঠ থেকে এলাম বুলছি না ?'

'খেয়ে নে। তাপরে লতুন জামা-প্যাণ্ট-জুতো কিনে দুবো।'

সেইসময় দরজায় খটখট শব্দ আর ডাক, 'মধু ! অ মধুবালা ! অসময়ে আবার কোন নরকখেকোকে ঢোকালি লা ? বিদেয় করে বেরো। বড়োমানুষ এনেছি।'

রাঙাদাসী গর্জন করে বলে, 'যাও তো মাসি। হবে না এখন।'

'আচ্ছা লা, আচ্ছা ! দেখব, গুমোর কদ্দিন থাকে।'

হরিবোলা জিগ্যেস করে, 'কে ঝগড়া করছিল মা ?'

'ওই এক মাগী।' বলে সে ছেলের মুখে গেলাস ধরে। হরিবোলা ঢকঢক করে জল খায়, কিন্তু গেলাসের দুপাশ দিয়ে দুটো বন্য চোখে মায়ের মুখখানা দেখতে থাকে। রাঙাদাসীর বুকটা ধক করে ওঠে চাউনি দেখে।

তারপর রাঙাদাসী ছেলের চুল আঁচড়ে দেয়। ভিজে তোয়ালেতে মুখ মুছিয়ে দেয়। আঙুলের ডগায় করে স্নো তুলে ঘষতে গেলে হরিবোলা মুখ সরায়। কিছুতেই মাখতে চায় না।

ঘরে তালা এঁটে ছেলেকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে বলে,

'যখন মন খারাপ করবে, তক্ষুনি চলে আসবি। যেমন আছ মুরোলবাড়ি, তেমুনি থাকো এখন। ভগবান যদি মুখ তুলে তাকায়, মা-বাছা মিলে টাউনে দোকান দুবো।'

এইসব কথা অনর্গল। হরিবোলা কিছু বোঝে না। টাউন বাজারের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে হাঁটে।...

বাঁওড়ের কাছে খানিকটা উঁচু টুঙ্গির ওপর যুগীবরের কুঁড়েঘর। খড়-বাঁশের একটা ঝুপড়ি, সামনে খানিকটা মাটি ঝকমক করছে। হিজলগাছের ডালে ঝুলছে দড়ির সিকে, তার মধ্যে দুটো হাঁড়িকুড়িতে তার খাদ্যদ্রব্য। গুঁড়িতে ঝুলছে তার হুঁকো। এই তার সংসার। বহু বছর আগে সে গ্রাম থেকে এখানে এসে নিরিবিলিতে এই সংসার গড়েছে। এক টুকরো খেত ছড়িয়ে আছে সামনে। এই তার সম্পত্তি। সারা বছর সে বিবিধ ফসল ফলায়। তাকে বেচতে যেতে হয় না, নিকিরিরা এখান থেকেই কিনে নিয়ে যায়। গ্রামে সে কখনো-সখনো যায়, সেও নুন-তেলা কিনতে। হাটবারে একখানি কাপুড় কিনতে। সেও এক হদ্দমুসলো—গোঁয়ার মানুষ। কোমরে কোনোরকমে গামছা জড়ানো। শীতকালে বড়জোর গেঞ্জির ওপর তুলোর কম্বল। মাথায় পুরনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে পাগুড়ির মতো একটা কিছু বানিয়ে নেয়। সে যখন তার ক্ষেতের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে এক দাম্ভিক সম্রাট। বাগালরা তাকে খুব ভয় পায়। শুধু হরিবোলাকে সে পাত্তা দেয়, পছন্দ করে এবং হরিবোলা কাছে এলেই তার মুখ খুলে যায়। হাঁটু দুমড়ে গমের চারার ভেতর বসে আগাছা ওপড়াতে ওপড়াতে সে মুখ তুলে বহুদূরে তাকিয়ে অন্বেষণ করে তাকে।

এদিন ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে ভাবছিল জরজ্বারি হয়েছে বুঝি। কিন্তু পড়ন্তবেলায় যখন সে হুঁকো হাতে পা ছড়িয়ে বসে সুখটান দেবার উপক্রম করছে, তখন তার গায়ে এক দীর্ঘছায়া। মুখ ঘুরিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চোখে রোদের ছটাও বটে। চিনতে পারে না।

হরিবোলার গায়ে রাঙা জামা, আনকোরা হাফপেন্টুল, পায়ে সত্যিকার স্যাণ্ডেল। ফিক করে হেসে বলে, 'যুগীকাকা, ইগুলান মা কিনে দিয়েছে। মেদিগঞ্জতে যেয়েছিলাম, বুইলা না যুগীকাকা?' সে দৌড়ে এসে হাঁটু দুমড়ে সামনেই বসে পড়ে। কলকল করে বৃত্তান্ত বলতে থাকে।

যোগীবর খালি 'হুঁ' দিয়ে যায়। তারপর হরিবোলা তার হাতে একটা

লেমুনচুষ গুঁজে দিলে সে মুঠোয় ধরে রাখে জিনিসটা। একটু পরে বলে, 'তুর মা মেদিগঞ্জতে থাকে ?'

হরিবোলা খিটখিট করে হাসে। 'তমে তুমি এতক্ষণ শুনলা কী ?' বলে সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখার পর জামা খুলে ফেলে। স্যাণ্ডেলদুটো খোলে। পেণ্টুলটা খুলতে যায় কুঁড়ের পেছনে। ফিরে আসে আগেকার বাগাল হয়ে। পরনে, ধানু মোড়লের ছেঁড়া পেণ্টুলখানা মাত্র। চাপা গলায় বলে, 'ইগুলান লুকিয়ে থোব তুমার কাছে। মুরোল জানলে মারবে, বুইলা না ?'

যোগীবর মাথা নেড়ে বলে, 'বুইলাম।'

হরিবোলা জামা-পেণ্টুল-স্যাণ্ডেল গুটিয়ে যোগীবরের হাতে গুঁজে দেয়। তারপর চিতেবাঘের বাচ্চার মতো দৌড়ুতে থাকে। তার চেরা গলার গান ভেসে আসে কুয়াশা-মাখানো নরম রোদের ভেতর থেকে, 'বঁধু লাও বা না লাও / মুখ দেখে যাও / বাসি কাচের আয়না…'

যোগীবর সাধুর মতো উদাসীন হেসে হরিবোলার জামা-পেণ্টুল-জুতো দেখতে থাকে। একবার শোঁকেও। নতুন কাপড়ের গন্ধটা বেশ। টাউনবাজারের কথা মনে পড়ে যায়। কতকাল সে টাউনবাজারে যায়নি। শিগগির একদিন যাবে।

দুধসরের নালার কাছে পাতকুড়ো মুখ চূণ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিবোলা কাছে গেলেও সে কথা বলে না। গোরু-বাছুরের পাল তখন সবে ঘরমুখো হচ্ছিল। বাগালরা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিল নালার এধারে। বাগালদের দলপতি এসে হরিবোলাকে দেখেই নিষ্ঠুর হেসে ঘোষণা করে, 'হরিবুলা, আজ তুর মরণ মুরোলের হাতে। তুর পাল ডাকিয়ে খোঁয়াড়ে লিয়ে যেয়েছে দ্যাখ্ গা যা! গম খেয়ে বিনেশ করেছে, যা তা কথা ?'

হরিবোলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালা পাতকুড়ো!' তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাতকুড়োর ওপর। দুজনে পড়ে যায় ব্যানার ঝোপে। জড়াজড়ি খামচা-খামচি চলতে থাকে। দলপতির বয়স বেশি। গায়ে জোর বেশি। সে দুজনকেই চাঁটি মেরে ছাড়িয়ে দেয়। দাঁত বের করে বলে, 'মা-সোয়াগির ব্যাটা হয়েছে! যাও, এখন মাকে বুলে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে লিয়ে এস।'

পাতকুড়ো কী বলতে যাচ্ছিল, দলপতির থাপ্পড় দেখে থেমে যায়। হরিবোলা কী বলবে ভেবে পায় না। সে শুধু চোখ কচলায়। বাগালদলের চোখে চোখে ইশারা আর বাঁকা হাসি দেখে সে শুধু আঁচ করতে পারে, যেন ইচ্ছে করেই তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। পাতকুড়োকে তার গোরুগুলো চরাতে দেওয়া হয়নি

হয়তো। তাই তারা গমক্ষেতে ঢুকেছিল।

যোগীবর হুঁকো টানা শেষ করে কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়িয়েছে, হরিবোলা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। যোগীবর বলে, 'কী রে বাছা? গেলি তো হাসতে হাসতে, উঁ?'

তারপর সব শুনে সে অভ্যাসমতো বহুদূরে দৃষ্টিপাত করে। গোরুর পাল নিয়ে বাগালেরা ফিরে চলেছে। সূর্য লাল চাকা হয়ে ডুবছে দোমোহানীর দিকে। দূরের ডহরে ধুলো, কাশবনের মাথায় কুয়াসা, বিল থেকে মেছুনীরা উঠে আসছে কাঁধে বিশাল প্রজাপতির ডানার মতো জাল নিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক—প্রতিদিন দিনশেষের একই ছবি। যোগীবর আস্তে বলে, 'মুরোলকে যেয়ে বুলগা বাছা, কী আর করবি?'

হরিবোলা ভাঙা গলায় বলে, 'মুরোল মারবে।'

যোগীবর ঘড় ঘড় করে কেসে এবং হেসে বলে, 'তাইলে মায়ের কাছে চলে যা বরঞ্চ।'

'মা বুলেছে মুরোলের কাছে থাকতে।' হরিবোলা আবার ফুঁফিয়ে ওঠে। 'মা বুলেছে, য্যাখন খবর দুবো, ত্যাখন আসবি—নৈলে আসবি না।'

'তুর মা বুলেছে?'

'হুঁ। তুলেছে য্যাখন-ত্যাখন কক্ষুনো আসবি না।'

যোগীবর বুঝতে পারে না। রাগ করে বলে, 'তাইলে যা ইচ্ছে কর্ গা বাছা! দেখি, কাঁওড়ে জালখানা পেতে আসি—রেতে যদি দুটো মাছ-টাছ পড়ে।' সে হিজলডালে টাঙানো খোপ জালখানা পেড়ে নিয়ে থপথপ করে চলে যায়। আর পিছু ফেরে না।

হরিবোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখ কচলায়।···

ধানু মোড়লের খবর পেতে দেরি হয়নি, দোমোহানীর লোকেরা তার পাল ডাকিয়ে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেছে। ছাড়াতে পনেরো-ষোলো টাকার ধাক্কা। এদিকে বাড়িতে জামাই, সেও মোড়লের মেয়েকে টাকার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। ধানু মোড়ল যত, তত তার গিন্নিও টাকা-অন্ত প্রাণ। ধানু মোড়লের মাথার ভেতর আগুন জ্বলে গেছে। গিন্নির তো গলা শুকিয়ে গেছে গাল দিতে দিতে। ঘরে জামাই, তাতে কী? দোমোহানীর খোঁয়াড় থেকে গোরুগুলো ছাড়িয়ে আনতে মাঝরাত হয়ে গেল।

মোড়ল গোয়ালে গোরু বেঁধে এসে টিউকলে হাত-পা ধুতে ধুতে চোখের কোনা দিয়ে কী একটা দেখতে পায় পেয়ারা গাছের লাগোয়া। ভিজে হাতে লণ্ঠন তুলে দেখার চেষ্টা করে বলে, 'উটা কী?'

মোড়লগিন্নি বলে, 'বেউশ্যের পুত থাউক বাঁধা।'

পেয়ারা গাছের সঙ্গে গোরুবাঁধা দড়িতে ক্ষুদে বাগালটা আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা আছে দেখে মোড়লও গলার ভেতর বলে, 'খানকির পুত থাউক বাঁধা।'

কিন্তু রাত আরো গভীর হলে সেই মোড়ল বিবিধ বিবেচনার পর লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে উঠোনে নামে। একটু বুক কাঁপে। মরে-টরে যায়নি তো? কাছে এসে দেখে বাগালের কঠিন প্রাণ—মাঠ-ঘাটে জল-জঙ্গলে রোদ-বৃষ্টি-শীতের ধারাবাহিক প্রহারে কালক্রমে শামুকের খোলের চেয়ে দড়।

তার লিকলিকে বাহু খামচে ধরে মোড়লমশাই তাকে খড়কাটার কুঠুরিতে ঠেলে দেয় এবং নিজের বিছানায় শুয়ে ফিরে যায়। ওপরে খড়, নিচে খড়, মধ্যিখানে কুঁকড়ে পড়ে থাকে হরিবোলা। আজ রাতে তার অবচেতনায় সেই বিশাল তৃণভূমি রাঙাদাসী হয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। তার চিমসে ফাটা ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে। ঘুমের ঘোরে সে মায়ের দেওয়া লেনুনচুষ চুষতে থাকে। তার দুই ভুরুর মধ্যিখানে আঁকা রাখালফোঁটাটি এখন অন্ধকার হারিয়ে গেছে। সে এখন প্রকৃতিই রাঙাদাসীর ছেলে হয়ে ঘুমোয়।…

গাবু বেঁচে আছে

একেক সময় এমন হয়, আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন গুণদাপ্রসাদ, যখন কারুর কিছু করার থাকে না। গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে এ বয়সে এমন কথা মানুষের মাথায় আসা স্বাভাবিক, বিশেষ করে হাতে যদি একটা ছড়ি থাকে এবং সমবয়সী সঙ্গী থাকেন। তাছাড়া সুনসান নিরিবিলি জায়গা, গাছপালা, আকন্দঝাড়, একটু নিচে অথৈ জল—যা বইছে অথবা বইছে না, তাকিয়ে কথা শুনছে বলে ভুল হয়। মানুষ যেমন জলের দিকে তাকায়, জলও মানুষের দিকে তাকায় হয়তো।

গুণদাপ্রসাদ রেলের গার্ড ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। প্রমথনাথ এখনও করেননি। শ্যামাসুন্দরী বিদ্যাপীঠে দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে গেল। মাস্টারিভঙ্গিতে উদাত্ত গলায় বললেন, আসলে সব কাগুজে বাঘ। পেপার টাইগার্স!

কী? গুণদাপ্রসাদ আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। কাদের কথা বলছ?

পুলিসের।

পুলিসেরও কিছু করার থাকে না অনেক সময়। গুণদাপ্রসাদ শান্তভাবে আগের স্বরে বললেন। এমন একেকটা বিচ্ছিরি সময় আসে, যখন আইনকানুন অকেজো হয়ে যায়। চোখ রাঙিয়ে বেটন চালিয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে, এমনকী গুলি ছুঁড়েও সিচুয়েশান কন্ট্রোলে আনা যায় না। একটু থেমে ফের শ্বাসের সঙ্গে বললেন, আমি দেখেছি। লক্ষ্মীপুর জংশনে একবার—

তুমি মবের কথা বলছ! প্রমথনাথ ছাতিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তখন মব কোথায়? ওই যে জায়গাটা দেখছ, ওখানে বডি। আর এই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুই সেপাই। উইদ আর্মস।

তুমি দেখেছ?

হুঁউ। স্কুলে ছুটির পর এখান দিয়ে শর্টকাট করা চিরদিনের অভ্যাস।

শুনলাম টিপটিপ করে বিষ্টি পড়ছিল।

পড়ছিল। সাইক্লোনিক ওয়েদার ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু তখন ফ্লাড

কোথায় ? ফ্লাড তো এলো পরদিন ভোরবেলা।

গুণদাপ্রসাদ পা বাড়িয়ে বললেন, কিছু বোঝা যায় না।

একটু দূরে এই নিচু বাঁধ-রাস্তার ভাঙন। ভাঙনে দু'খানা সবুজ বাঁশ লম্বালম্বি শুয়ে সাঁকো হয়েছে। দুই প্রবীণ ঝুঁকি নিলেন না। ঘুরলেন। পশ্চিমের লাল মেঘের ছটায় পুবের গঙ্গা রক্তগঙ্গা হয়ে গেল হঠাৎ। শিমুল গাছটার ঝাঁকড়া-লম্বাটে ডালে কয়েকটা শকুন পুরনো ভাস্কর্যের মতো স্থির। দূরের আশ্রমে মাইকে খোলকত্তালের শব্দ, ভক্তিগীতির ছেঁড়া কলি, একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে আবহমণ্ডলে মিস্টিসিজম ছড়াচ্ছে, মুঠো মুঠো রহস্যমিশ্রিত ভক্তি অথবা ভক্তিমিশ্রিত রহস্য—রক্তগঙ্গার ভয়াল শাক্ত রূপ ধীরে ঘষা খেতে খেতে ভৈরবী হতে হতে কানা বোষ্টুমী হয়ে গেল। ঘাটের মাথায় চায়ের দোকান অব্দি দুই বন্ধু চুপ। শেষে গুণদাপ্রসাদই বললেন, একটু চা খাই এসো।

প্রমথনাথের একটু-আধটু শুচিবাই আছে। সেটা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু একটু আগের আলোচনা তাঁকে ভেতর ভেতর এখনো ব্যাডমিন্টন খেলাচ্ছে। শাটলকক একবার তাঁর কোর্টে, একবার গুণদাপ্রসাদের। অগত্যা অনিচ্ছা অনিচ্ছা করে বসলেন। জানেন, এই প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড এক গেলাস চা না খেয়ে উঠবেন না। তাঁর সঙ্গে খেলা অসমাপ্ত রেখে যাওয়া ঠিক নয়। বললেন, আমি কিন্তু মাটির ভাঁড়ে।

ঘাটে ভিড়টা সন্ধ্যার মুখে বেড়ে যাওয়ার নিয়ম। এদিক-ওদিক থেকে, এমন-কী ওপার থেকেও মানুষজন এসে জোটে। কাজে এবং অকাজে। বেশিরভাগ নবীন যুবক। শ্যাম্পু করা চুল, পরনে জিনস পর্যন্ত, অজস্র হাতে ক্যাসেট প্লেয়ার ও ট্রানজিস্টার এবং ধ্বনি-প্রতিযোগিতায় বুড়োহাবড়ারা তিষ্ঠোতে পারে না। তবু মানিয়ে নিতে হয়। পাটের মরশুম। হাজি মেহেরুদ্দিন আড়ত থেকে ভেতর-পকেট ভারি করে বেরিয়ে প্রমথনাথকে দেখে আদাব দিলেন।

প্রমথনাথ খুশি হয়ে বললেন, এই যে!

মেহেরুদ্দিন গুণদাপ্রসাদকে চিনতে পেরে তাঁকেও আদাব দিয়ে বললেন, আরেব্বাস! বড়োবাবু কবে এলেন ? থাকছেন তো কিছুদিন ?

জবাব প্রমথনাথই দিলেন। গুনুবাবুকে আর আমরা যেতে দিচ্ছিনে। সিগন্যালের তার কেটে দিয়েছি। রেল গাড়ি কাঁটালিয়াঘাট রোডে আটকে রইল। আর সিগন্যালটি ডাউন হচ্ছে না।

হাজি মেহেরুদ্দিন কিছু না বুঝেই খুব হেসে বললেন, খুব ভালো। খুবই

ভালো।

কাঁটালিয়াঘাটের রায়চৌধুরী ভাইদের মধ্যে শুধু বড়োবাবু গুণদাপ্রসাদই টিঁকে আছেন। মেজবাবু অন্নদাপ্রসাদ হৃদরোগে কলকাতায় গত। সেজবাবু মোক্ষদাপ্রসাদ এই গঙ্গায় চান করতে গিয়ে তলিয়ে যান। ছোটবাবু রণদাপ্রসাদ ক্যান্সারে। চিরকুমার গুণদাপ্রসাদের বুকের ভেতর তিনটে শুকনো ক্ষত। এইসব ক্ষত থাকলে মানুষ নির্লিপ্ত এবং দার্শনিক হতে বাধ্য। প্রমথনাথ বুঝতে পারেন।

মেহেরুদ্দিন পাছে সেই ক্ষতে খুঁচিয়ে দেন, সাবধানী প্রমথনাথ দ্রুত বললেন, এই একজন প্রত্যক্ষদর্শী গুনু! হাজিসায়েব, তুমি ওকে বলো, ঠিক কী হয়েছিল ছাতিমতলায়!

কিসের? মেহেরুদ্দিন প্রশ্নটা করেই সেকেণ্ডে বুঝলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, হুঁ—গাবু!

গুণদাপ্রসাদ শুধু তাকালেন। মাছের চোখ। প্রমথনাথ বললেন, বলো হাজিসায়েব। দু-দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল কিনা? তাদের চোখের সামনে থেকে বডি উঠে গিয়েছিল কিনা?

মেহেরুদ্দিন চারপাশটা দেখে নিলেন। ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যার মুখে ভিড়টা ইদানীং কম। যুবকদের আনাগোনাও কমেছে। প্রথম কয়েকটা দিন বিকেল যেতে না যেতে খাঁ খাঁ অবস্থা ছিল ঘাটের। ক্যাসেট প্লেয়ার-ট্রানজিস্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে-ওখানে রাগী মারকুট্রে চেহারার খাকি পোশাক-পরা সেপাই, হাতে হাতে মাস্কেট। এখন তারা নেই। আবার আগের অবস্থা ফিরে আসছে দিনে দিনে। তাছাড়া পাটের গাঁট এসে জমছে পাহাড় হয়ে। জুট কর্পোরেশন হাওয়া চাগিয়ে দিয়েছে। মেহেরুদ্দিন চাপা স্বরে বললেন, আমার সন্দ আছে মাস্টারবাবু।

কিসের?

মরা মানুষ কি কখনো জিয়ন্ত হয়? হয় না। হাজিসায়েব একটু হাসলেন। তবে কথায় আছে 'কাঁটলেঘাটের মরা'!

প্রমথনাথ চার্জ করলেন, ওসব বোগাস! বডি গেল কোথায়? গঙ্গার উজোন-ভাঁটি তন্নতন্ন মোটরবোট নিয়ে খুঁজেছে।

মেহেরুদ্দিন তিন-তিনবার সউদি আরবে গেছেন। সেই যাওয়াকে তিনি বলেন, 'ফেলাই' করা। নিজেই রসিয়ে-ফেনিয়ে বর্ণনা করেন, কীভাবে শেষবার ভিসার মেয়াদ ফুরুলেও ছ-সাতটা মাস সে-দেশে ছিলেন। সউদি পুলিস খোঁজে

এলে কীভাবে পাহাড়ে-কন্দরে লুকিয়ে থাকতেন, সেটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। শেষে বলেন, আমার 'এজেং' বড়ো চালাক। এজেন্ট চালাক না হলে আজকাল মক্কেল জুটবে না। তেমনি চাপাস্বরে বললেন, কাল ভাঙা বাঁধের জন্যে এম এল এ বাবুর কাছে ডেপুটেশাং-এ গিয়েছিলাম! শুনলাম এংকুয়েরি রেপোর্টে লিখে দিয়েছে, ফেলাড। কিন্তু তখন ফেলাড কোথায় বলুন?

উত্তেজিত প্রমথনাথ বললেন, সেটাই তো বোঝাচ্ছিলাম তোমাদের গুনুবাবুকে। তখন ফ্লাড কোথায়? তবে এনকোয়ারি কমিশনের কথা বললে, সে-রিপোর্টের কথা আমিও শুনেছি। লিখেছে; ডিউ টু দা সাইক্লোনিক ওয়েদার অ্যাণ্ড ফ্লাড, দি প্লেস অফ অকারেন্স ওয়াজ ওয়াশড্ অ্যাওয়ে অ্যাণ্ড দি বডি কুড নট বি ট্রেসড্ এট্সেট্রা এট্সেট্রা'।

এই সংলাপ গুণদাপ্রসাদের উদ্দেশে। কিন্তু তিনি মাছের চোখে তাকিয়ে গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। এও খুব বিস্ময়কর দৃশ্য কাঁটালিয়াঘাটে, সামান্য মানুষ জগনের চায়ের দোকানে রায়চৌধুরীদের বড়োবাবুর চা-খাওয়া। জমিদার বংশ। ব্রাহ্মণ। তবে এটা রেলওয়েরই নিঃশব্দ বিপ্লব বলা চলে। গুণদাপ্রসাদ নিরুত্তর দেখে বিরক্ত প্রমথনাথ হাজিসায়েবের দিকে ঘুরলেন। কিছুদিন আগেও প্রসঙ্গটি নিয়ে মুখখোলা যেত না। শুধু দেয়াল নয়, বাতাসেরও কানের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়েছিল। প্রমথনাথ খাপ্পা হয়ে বললেন, ডেডবডি—বুকে বুলেটের ছ্যাঁদা, উঠে পায়ে হেঁটে চলে গেল আর দুই আর্মড সেপাই তাকিয়ে রইল!

জগন মুখ খুলল এবার! সেও একজন ভোটার। ভোটার লিস্টে নাম থাকলে সব ব্যাপারে মুখ খোলা যায়। বলল, গুস খাইতেও পারে ওনারা। তবে অনেক কিছু ঘটে, বাইখ্যা দ্যাওন যায় না। (যা-য়-না দীর্ঘ ধ্বনিযুক্ত)।

মেহেরুদ্দিন শুকনো হাসলেন। ঠিক, ঠিক রে বাবা! খোদাতালার দুনিয়ায় সব কিছু সহজে বোঝা যায় না।

জগন অনায়াসে বলল, এট্টু আগে একজন আইছিল—নাম কমু না, কইল কী, গাবুরে দ্যাখ্ছে।

প্রমথনাথ মাটির ভাঁড়টা জুতোর তলায় মডমড় শব্দে গুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেটে হাত ভরতে গিয়ে দেখলেন, গুণদাপ্রসাদ এক টাকার নোট গুঁজে দিচ্ছেন জগনের হাতে। আধুলি ফেরত নিয়ে ছড়িটি তুলে পা বাড়ালেন। মেহেরুদ্দিন বসে রইলেন। ভাগ্নে আরিফ মোটরসাইকেল রেখে ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যাকসিটে বসে বাড়ি ফিরবেন হাজিসায়েব,

ভেতর-পকেটে কয়েক শো নোটের বাণ্ডিল। দিনে দিনে কেমন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ভালোয়-মন্দয় দলাপাকানো। তফাত করা যায় না। শুধু ছমছমানি।

ঘাট থেকে কয়েকপা হাঁটলে চৌমাথা। সোজা এগোলে রেল-স্টেশন। বাঁয়ে গেলে এঁকে-বেঁকে পিচের সড়ক কাটোয়া পৌঁছে দেবে। ডাইনে গেলে বাজার পেরিয়ে পুরনো গঞ্জ, নতুন বাড়ি, রঙবেরঙের তাসের মতো। তাসের উপমা মাথায় আসে স্কুল-শিক্ষকের। অনুভূতির তীব্রতা থাকলে এমন ঘটে। বর্তমানের ভেতর অতীত এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। তাসের ঘর ভেঙে যায়।

গুনু! প্রমথনাথ ডাকলেন।

গুণদাপ্রসাদ শুধু হুঁ বললেন। বাঁধের ওপর ভ্রমণে দুজনেই এখন আস্তে হাঁটছিলেন না। ওদিকটায় বাঁধ সত্ত্বেও প্রকৃতি নৈকষ্য কুলীন। ঝোপঝাড়, গাছপালা, শ্মশান, গঙ্গা—প্রচণ্ড প্রকৃতি। গাবুর ব্যাপারটা সেই প্রকৃতিকে রহস্যে ছমছমিয়ে রেখেছে—দু'সপ্তা পরেও। ছাতিম গাছটাও জৈবতা পেয়েছে। সারা শরীরে চোখ। গুণদাপ্রসাদের, তার ওপর, ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাস। রেলের গার্ড ছিলেন। পাল্লা দিয়ে সাদা কাপড়পরা মূর্তি দৌড়ুতে দেখেছেন। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার। এ জিনিস কাউকে বোঝানো যায় না।

প্রমথনাথ বললেন, তাহলেই বোঝো।

কী?

গাবুর ব্যাপারটা। গাবুকে কে সদ্য দেখেছে কোথায়, জগন বলল। অতএব এবারে দুয়ে দুয়ে যোগ দাও।

সব সময় যোগে মেলে না হে।

প্রমথনাথ গ্রাহ্য করলেন না।···হাজিসায়েব বলল মড়া কখনো জ্যান্ত হয়? একজ্যাক্টলি। সত্যিকার মড়া কখনো জ্যান্ত হয় না। হি ওয়াজ উণ্ডেড, নট ডেড। গাবুর কথা বলছি।

গুণদাপ্রসাদ আস্তে বললেন, অংশু বলছিল, পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি।

অংশু দেখেছিল নাকি? প্রমথনাথ খিকখিক করে হাসলেন।···বরাবর দেখেছি, একটা কিছু ঘটলে ডজন ডজন আই-উইটনেসের অভাব হয় না। যাই হোক, অংশুকে সাবধান করে দিও।

গুণদাপ্রসাদ আনমনে বললেন, গাবুকে আমার মনে পড়ে। ছুটিছাটায় এসে দেখেছি। প্রণাম করে গেছে। লাজুক, নম্র ছেলে ছিল—দিস ইজ মাই ইম্প্রেশান!

'মাই' শব্দটার ওপর একটু জোর পড়েছিল। প্রমথনাথ বললেন তুমি বলতে

গেলে বরাবর আউটসাইডার। আমাদের ইম্প্রেশান উল্টো। না—তাকে মাস্তান বা সমাজবিরোধী বললে অন্যায় হবে। হি ওয়াজ এ ফাইটার? বলবে, আমি তাহলে প্রশংসা করছি কি? ফাইটার হলেই প্রশংসার যোগ্য, আমি একথা মনে করি না। ফাইটটা কিসের, সেটা আগে বিচার করতে হয়। মহাভারত-রামায়ণ-ইতিহাস সর্বত্র দেখ, অসংখ্য ফাইটার। দুর্যোধনও ফাইটার অর্জুনও ফাইটার। রাম এবং রাবণ—সুলতান মামুদ এবং শিবাজী···যাই হোক, কিসের সঙ্গে কী—গাবু বুঝতো না ফাইটটা কার বিরুদ্ধে এবং কেন।

কাগজে দেখেছি পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নকশাল নিহত।

প্রমথনাথ প্রচণ্ড হাসির চাপে লম্বাটে শরীর সামলাতে মোটাসোটা গুণদা-প্রসাদের কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, সেই তো বলছিলাম তোমাকে। আজকাল সবই 'পেপারে' দাঁড়িয়েছে। মানে কাগুজে হয়ে গেছে। কাগুজে নকশাল, কাগুজে বাঘ, কাগুজে বাঁধ—হ্যাঁ, ও বাঁধ নিয়ে কী কেলেঙ্কারি হয়েছিল জানো? কাগুজে মাপ দশ কিলোমিটার ইনটু পাঁচ মিটার ইনটু তিন মিটার। হেঁটে তো এলে। কী মনে হলো? পাঁচ মিটার চওড়া, তিন মিটার উঁচু। ভাই গুনু, পুরো দেশটা কাগুজে হয়ে গেছে। তুমি আছ কোথা?

গুণদাপ্রসাদ চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। বাজার ছাড়িয়ে বিদ্যুতের খুঁটি গেছে ভেতর দিকটায়, জালের মতো ছড়ানো মাথার ওপর সুসংবদ্ধ তার। বাজারের দিকটায় রাস্তায় আলো, তারপর সন্ধ্যার ধূসরতা ফুঁড়ে এখানে-ওখানে চৌকো হলুদ আলোর ফালি—ঘরের জানলায়, কোনো রোয়াকেও। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শেষ আশ্বিনের মিষ্টি হিম আর হঠাৎ শিউলির ঝাঁঝালো গন্ধ। আকাশে কিছু নক্ষত্রের গায়ে গা ঘষে যাওয়ার মতো বুনোহাঁসের ঝাঁক চলে গেল। গুণদাপ্রসাদ ছুটিতে এসে গঙ্গার বাঁওরে বন্দুক নিয়ে হাঁস মারতে যেতেন। আজকাল হাঁস বসে না খবর নিয়েছেন। তাছাড়া বন্দুক ছিনতাই হওয়ার ভয় আছে। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, চলি!

প্রমথনাথের আরো বলার কথা ছিল। শ্বাস ছেড়ে বললেন, এস। পরে কথা হবে'খন। আমার আবার টিউশনি আছে। যাই, দেখি।···

মেহেরুদ্দিন হাজি একটি কিংবদন্তী-সিদ্ধ বাক্য আওড়েছিলেন, 'কাঁটলেঘাটের মড়া' (মুসলিমরা মরা বলেন), প্রমথনাথ বলেছিলেন, 'ওসব বোগাস! সেটা তর্কের ঝাঁঝ। নিজের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করতে চাইলে মানুষ চোখ বুজে হাত চালাবেই।

অবশ্য ওই প্রবচনটির ধার ক্ষয়ে ক্ষয়ে নেতিয়েও গেছে। বিশ বছর আগেও তল্লাটে কোথাও কেউ কাঁটুলেঘাট যাচ্ছি বললেই তার মুচকি হাসি পাওনা হতো, তা যতই বাবুগিরি করে বলা হোক না 'কাঁটালিয়াঘাট' যাচ্ছি!' শ্মশানটার জন্য এই খ্যাতি-অখ্যাতি। বস্তুত পাড়াকুঁদুলিদের মুখে ওটি ছিল প্রথাসিদ্ধ গাল, হাজিসায়েবের বাক্যটি। সেই উদ্ধারণপুরের পর গঙ্গার উজোনে কাঁটালিয়াঘাট দ্বিতীয় মহাশ্মশান, ইদানীং যেখানে এক সাধুবাবার বিশাল আশ্রম। প্রহরে প্রহরে মাইকে খোল-কত্তাল, ভক্তিগীতির ছেঁড়াখোঁড়া একটু কলি গাঙ্গেয় বাতাস এপার-ওপার কতদূর টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এই মিষ্টিক ও কোমল ভক্তির বীজ পুঁতেছিলেন পুব থেকে আসা উদ্বাস্তুরা। নইলে ঘোর শাক্ত মাটি, মহাশ্মশান, ভৈরব-ভৈরবী, ত্রিশূল মড়ার খুলি, কারণবারি জটা ও হুঙ্কার, হাড়িকাঠ ও খাঁড়া; তাই রক্তে ও মৃত্যুতে ভয়াল কাঁটালিয়াঘাটে জীবন্মৃত্যুর মাঝের সীমারেখাটি টুঁড়ে পাওয়া যেত না। তিরিশ বছর আগেও ছিল লুপলাইনের হল্ট মাত্র। তারপর স্টেশন হলো। প্ল্যাটফর্ম উঁচুও হলো। শেষে ওভারব্রিজ পর্যন্ত। বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালু করে গেলেন স্বয়ং বিদ্যুৎমন্ত্রী। নিছক ঘাট অর্থাৎ শ্মশান থেকে গঞ্জ, গঞ্জ থেকে রীতিমতো টাউনশিপ। এখন কাঁটালিয়াঘাট যাচ্ছি বললে ভালোরকম একটা যাওয়াই বোঝায়। তার ফলে সেই রহস্যময় ঘটনাটিও আর ঘটে না, মড়ারা এসে জ্যান্ত হয়ে ট্যাঙস ট্যাঙস করে হেঁটে যায় না। এও প্রবাদ ছিল, 'কাঁটলেঘাটে কে মড়া কে জ্যান্ত, বুঝা কঠিন।' সব প্রবাদ পুরনো শিলালিপির মতো ক্ষয়ে দুষ্পাঠ্য হয়ে গেছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কিছু আগে রাধাপ্রসাদ রায়চৌধুরী জ্ঞাতিদের সঙ্গে লড়ে ফতুর হয়ে কাঁটালিয়াঘাটের পুরনো কাছারি বাড়িটাকেই জমিদার বাড়িতে রূপ দেন। ততকিছু ঝকমকে রূপ নয়, নেহাৎ দোতলা বাড়ি—শেষ ছাদটাও দেখে যেতে সময় পাননি। কপালীতলায় জ্ঞাতিরা আগাগোড়া হেসে অস্থির। চার জোয়ান ছেলের বড়ো ও মেজ চাকুরে। সেজ ও ছোট মাটি নিয়ে লড়তেন। সেজটি ছিলেন মারকুট্রে ভিলেন। তাঁকে সামলাতে বড়ো গুণদাপ্রসাদকে মাঝে মাঝে আসতে হতো। লোকের মতে, মাটির মানুষ বড়োবাবু। অথচ রেলের গার্ড হলে মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক নষ্ট হয়। শরীরে রেলগাড়ির মতো চাকা গজায়। একই যুক্তিতে বড়োবাবু সেজকে বলতেন, 'ছেড়ে দে' এবং চাষীদের সঙ্গে রফা করতেন। 'রফা করতে করতে কোথায় ঠেকছি লক্ষ্য করেছ?' সেজ মোক্ষদাপ্রসাদ বলতেন। বড়োবাবু চলে গেলে সেজবাবু আবার মাটিতে থাবা হাঁকড়াতেন। কাঁটালিয়া-

ঘাটে তখনো জ্যান্ত-মড়ার সীমারেখাটি 'বুঝা কঠিন ছিল।' মোক্ষদাপ্রসাদকে টেনে নিলেন গঙ্গা, মোক্ষ দিলেন হয়তো, কিন্তু আসল গণ্ডগোলটা অন্যখানে। কাঁটালিয়াঘাটে মাটি ভালো করে না আঁকড়ে ধরলেই বিপদ। জ্যান্ত-মড়ার সীমারেখাটি নিমিষে তছনছ হয়ে যায়। ফলে মোক্ষদাপ্রসাদ কিছুকাল দেখা দিতেন শেষরাতের ফিকে জ্যোৎস্নায় গমক্ষেতের কোনো বুড়ো চাষীকে, যে তার পাকা ফসল পাহারা দিতে ক্ষেতের শিয়রে কুঁড়ে বেঁধেছিল। কাঁটালিয়াঘাটে বিদ্যুৎ আসার পর ভূতের দৌরাত্ম্য কমেছে।

গুণদাপ্রসাদের আসা সাত দিন হয়ে গেল। মন কিছুতেই বসছে না। শরীরে চাকা ঘুরছে, সারাক্ষণ রাতের মালগাড়ির শব্দ, মাঝে সামনের দিক থেকে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসল। একটু পরে বোঝেন, আশ্রমের মাইক, এবং কামরূপ এক্সপ্রেস পাস করে যাচ্ছে, খই ফোটার শব্দটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল।

বড়োবাবু, কবে আসা হলো? গুণদাপ্রসাদ এ দিকটায় এলেই প্রণাম পান। এ দিকটায় চাষাভুষো ক্ষেতমজুর মৎস্যজীবী মানুষজন। বিদ্যুৎ এতটা আসেনি। বন্যার পর ত্রাণ ব্যবস্থা দেখতে আসা মন্ত্রীমশাইকে নাকি স্থানীয় বিদ্যুৎবাবু কৈফিয়ৎ দেন, 'উই আর অ'ফুল্লি সরি স্যার! নো ডিম্যাণ্ড স্যার! নোবডি অ্যাপ্লায়েড স্যার!' প্রমথনাথ মুডে থাকলে ক্যারিকেচারে পাকা। তাঁর সেই ক্যারিকেচার অনুসারে, মন্ত্রীমশাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে জিগ্যেস করেন, এখানকার কুটিরশিল্প কী? জনপ্রতিনিধি মুচকি হেসে এবং আস্তে বলেন, 'বোমা'! রাষ্ট্রীয় গাম্ভীর্য চিড় খায় এবং মন্ত্রীমশাই শুষ্ক হাস্যে বলেন, 'দেয়ার ওয়াজ এ রিপোর্ট অ্যাবাউট নকশাল অ্যাকটিভিটিজ।' জনপ্রতিনিধি আরো আস্তে বলেন, 'পরে বলব 'খন।' তারপর নাকি জিপের দিকে যেতে কথোপ-কথনের বাকি অংশ—

'সামবডি ওয়াজ কিল্ড্ ইন এ কনফ্লিক্ট উইথ দা পোলিস?'

'হ্যাঁ। গাবু।'

'কে সে?'

'ছিল একজন। আসলে—'

'এস পি-র রিপোর্টে দেখলাম হি ওয়াজ এ নকশাল অ্যাণ্ড হ্যাড বিন ক্রিয়েটিং টেরর অ্যামং দা পিপ্‌ল্।'

'বলছি। চলুন।'...

কাঁটালিয়াঘাটের এই লেজের অংশটাই পুরনো এবং বাঁওরের কাছাকাছি বলে মাটিটা নিচু। জল ও মাটি থেকে যারা সরাসরি খাদ্য সংগ্রহ করে, তারা জল ও মাটির ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘর বাঁধবেই। বাঁওরের সঙ্গে হাউলির প্রাগৈতিহাসিক নাড়ির বাঁধন বাঁধা। বাঁওরে মাছ না পেলে হাউলি বুক পেতে ছিল। শুধু মাছ কেন, হেঞ্চা-কলমি-শুসনি শাক, গুগলি-কাঁকড়া-ঝিনুক, পানিফল-পদ্ম-শালুক থরে বিথরে সাজানো। ক'বছর সরকারি ফিশারি হয়ে হাউলির দরজা বন্ধ। ওটা একটা গবেষণা-প্রকল্পের রূপায়ণ। তবে বাঁওরটা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পেয়েছে। তার চেয়ারম্যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তাই বলে খ্যাদোড় বাউরি তার সদস্য হতে আইনে বাধা আছে। সে মৎস্যজীবী নয়। হেতু কুনাইও নয়। বড়োবাবুকে অপ্রত্যাশিত দেখে দুজনেই উঠে এল। পোনাম বড়োবাবু। পোনাম বড়োবাবু! তারপর প্রবীণ বাউরি মানুষটি বাঁওরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে বলল, আর হাঁস আসে না বড়োবাবু!

গুণদাপ্রসাদ হাসলেন। হাঁস কি হবে? বন্দুক এনেছি?

খ্যাদোড় অপ্রস্তুত। হেতুচরণ বলল, 'ভরম' সহজে ঘোচে না মানুষের। বড়োবাবুকে দেখলেই কাঁধে বন্দুকটি দেখি। সেও হাসতে লাগল। হাতে সুতোর তকলি। বাঁওরে জাল ফেলতে দেবে না, মাগঙ্গা আছেন। তিনি গভরমেণ্টের।

গুণদাপ্রসাদ বললেন, গাবু মারা পড়ল!

আচমকা এই বাক্যটি·বড়োবাবুর বন্দুক ছোঁড়ার পুরনো আওয়াজ। তখন আওয়াজটি শুনলেই কেউ-না-কেউ ছুটে বেরিয়ে যেত বাঁওরের দিকে। বড়োবাবু হাঁস মেরেছেন। একটা-দুটো ছিটকে গিয়ে পানার ভেতর কী শোলার ঝাড়ে যদি লুকিয়ে থাকে, পাখনায় বা ঠোঁটে ক্ষত। তাঁর গুলিবিদ্ধ হাঁস কুড়োনোর জন্য মঘা ছিল বাঁধা। মঘা হালযানা। 'রাজবাড়িতে' তিন পুরুষের লোক। অবশ্য এটাই গুণদাপ্রসাদের মতে, 'হিস্টোরিক্যাল জোক'—জমিদার বাড়ি মানেই রাজবাড়ি, তা সে নেহাৎ ক্ষয়াখর্বুটে দোতলা কী একতলাই হোক।

হেতু ও খ্যাদোড় মুখ তাকাতাকি করে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। গুণদাপ্রসাদ ছড়িটি বগলে গুঁজে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করলেন। নাকে নস্যি গুঁজে রুমালে নাক মুছলেন। তখন খ্যাদোড় আস্তে বলল, কেউ মরতে চাইলে পরে তাকে ধন্বন্তরিও বাঁচাতে পারে না, বড়োবাবু!

কেন? গাবু মরতে চাইবে কেন?

খ্যাদোড় জবাব খুঁজে পেল না। হেতু তকলিতে একটা পাক খাইয়ে বলল,

গাবুকে মারে কে ?

গুণদাপ্রসাদ বললেন, ছাতিমতলায় পড়ে ছিল। পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল।

দিলে কী হবে ?

খ্যাদোড় একটু চটে গিয়ে বলল, হ্যাঁলি ছাড়ো দিকিনি! কাঁটলেঘাটে চিরটাকাল খালি হ্যাঁলি। শুনে শুনে কান পচে গেল।

হেতু হাসলো।···তুমি বলছো হ্যাঁলি, কতলোকের কাছে হ্যাঁলি না! সত্যি।

গুণদাপ্রসাদ বললেন, সত্যিটা কী? 'কী'-এর ওপর খুব জোর দিলেন।

গাবুকে মারতে পারেনি দারোগাবাবু!

তাহলে লাশটা পড়ে ছিল কার ?

গাবুরই। আবার কার ?

খ্যাদোড় এত চটে গেল যে ধপাস করে গাব গাছটার তলায় ভিজে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। দিন দশেক আগেও এখানে জল ছিল। খটখটে রোদ্দুরে মাটিটা শক্ত হয়েছে। এমনকী পচা ঘাসের গোড়া থেকে কচি আঁকুরও মুখ বাড়িয়েছে। আর দশটা দিন পরে সব আগের মতো সবুজে ছয়লাপ হয়ে যাবে। গুণদাপ্রসাদও একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু না হেসে পারলেন না খ্যাদোড়ের অবস্থা দেখে। বললেন, হ্যাবে! বুঝলাম না হয় কাঁটলেঘাটে কোনো-কোনো মড়া জ্যান্ত হয়! গাবুও কি জ্যান্ত হয়ে হেঁটে চলে গেল ?

তাই তো যেয়েছে। হেতুচরণ শক্তমুখে বলল। থানায় যেয়ে খবর করুন। জানতে পারবেন।

পুলিস বাধা দেয়নি ?

দিয়েছিল। বন্দুকও ছুঁড়েছিল। গুলি ফস্কে গেলে কী করবে ?

খ্যাদোড়ের মনে হলো, একটা রফা করা উচিত। গলা ঝেড়ে বলল, আসলে সেই সাঁজবেলা থেকেই সাইকোলোং। টিপটিপিয়ে বিষ্টি। খুব হাওয়া ছিল, বড়োবাবু। দেবেন গো, আমাদের দেবেন চৌকিদার। বাড়ি থেকে কেটলি নিয়ে পুলিসদের জন্যে চা আনতে যেয়েছিল। দারোগাবাবু তখন থানায় ফিরে ফোং পাঠিয়েছেন হাসপাতালে। অ্যামবুলেং আসবে। ডোম আসবে। বোডি তুলবে। নিয়ে যেয়ে মশাই, কাটাকুটি করবে-টরবে—মানে, যা-যা সব আইনে করে।

গুণদাপ্রসাদ বলেন, তারপর ?

খ্যাদোড় মুখে ঐতিহ্যগত রহস্য এনে গলার ভেতর বলল, গাবুর মাকে আপনি দেখেছেন ?

হুঁ, দেখেছি।

কালীতলায় হাটবারে ভর হতো। মাথায় জটা ছিল।

জানি, জানি।

মায়ের মোন, বড়োবাবু। মরে যাক কী বেঁচে থাক, মা। কিনা বলুন আপনি?

তাতো বটেই!

ছেলের বোডি বুকে তুলে কাঁদতে কাঁদতে মা যখন চলে যায়, তখন—দম ছেড়ে খ্যাদোড় বলল, 'তখন হাতের বন্দুক হাতেই থাকে বড়োবাবু! মানুষের কিছু করার থাকে না। দেবেনের কাছে শুনেছি, পুলিস দুজন 'এংকুরির' সামনে মুখ খুলতেই পারেনি। খালি ফ্যালফেলিয়ে তাকায় আর টসটসিয়ে জল পড়ে—এমন অবস্থা। শেষে সাসপেং।'

ঠিক এমন কিছুই গুণদাপ্রসাদ বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রমথনাথকে। খ্যাদোড়ের মুখে তার সায় পেয়ে খুশি হলেন। বললেন, হ্যাঁ—এমন হয়। আমি দেখেছি।

হেতুচরণ নড়ে উঠল। লম্বা নিঃশব্দ হেসে বলে উঠল, তাইলে দাঁড়ালোটা কী? হরেদরে এক।

খ্যাদোড় বলল, কক্ষনো এক লয়। তুমি অন্য কথা বলছিলে বড়োবাবুকে।

গুণদাপ্রসাদ তর্ক দেখে বললেন, ছেড়ে দাও। ঠিক যে-স্বরে বলতেন তার ভাই গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ মোক্ষদাপ্রসাদকে। পা বাড়িয়ে মনে মনে বললেন, সায়েন্স কতটুকু জানে? সে তুমি চাঁদেই যাও, আর মঙ্গলগ্রহেই যাও। ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছ? একবিন্দু বীজ থেকে অত বড়ো গাছ। এক্সপ্লেন করো, দেখি। কোথায় ছিল, কীভাবে এল?

বাঁধের দিকে যাচ্ছেন দেখে হেতুচরণ চেঁচিয়ে বলল, পারবেন না বড়োবাবু! বাঁশ আছে বাঁশ! ভাঙা বাঁধ।

হুঁ, সেই বাঁশের সাঁকো। মনে পড়ায় গুণদাপ্রসাদ সোজা বাঁওরের দিকে হাঁটতে থাকলেন। কিছুতেই মন বসছে না। কীভাবে কাটাবেন কাঁটালিঘাটে? শরীরে গতি নিলে এই ভুলটা হয়। যেন আর থামতে হবে না। থামলেও, ভেবেছিলেন, কাঁটালিঘাট তো আছে। গঙ্গা, বাঁওর, বন্দুক, প্রকৃতি। এক সপ্তাহেই টের পাচ্ছেন প্রকৃতিও মানুষের চরম সান্ত্বনা নয়, চূড়ান্ত ঠাঁই নয়—অন্তত যতক্ষণ বেঁচে আছেন। মরলে অবশ্য আলাদা কথা।

বাঁওরের গাঢ় হলুদ বর্ণের জলের সামনে পৌঁছে মনে হলো, না — মরার পরও একধরনের জীবন আছে। প্রেতজীবন। সেই জীবনে তিনি কী করবেন? ভাবলেই বুকে হাতুড়ির ঘা। জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা হতভাগিনী শ্বেতবসনাকে মনে পড়ে।···

বিকেলে গুণদাপ্রসাদ ভাবলেন স্টেশনে যাবেন। বসময় ধাড়া কাঁটালিয়াঘাট রোডে বদলি হয়ে এসেছেন, এ একটা দারুণ আবিষ্কার। সাহেবগঞ্জ, মোতিহারি, হাথিয়াগড় জংশনের দিনগুলো মনে পড়ে যায়। পারাপারের ঘাটের কাছে চৌমাথায় এসে পড়ে গেলেন ওতপেতে থাকা প্রমথনাথের পাল্লায়। প্রমথনাথ হাসলেন।···ওয়েটিং ফর ইউ। চলো, ছাতিমতলায় যাই। অংক কষে বুঝিয়ে দেব।

নাঃ। গুণদাপ্রসাদ বাঁকা মুখে বললেন। ছেড়ে দাও।

সব কিছু ছাড়া যায় না হে গুণু! হাম কমলিকো ছোড় দিয়া, লেকিন কমলি হামকো নেহি ছোড়া।

অগত্যা গুণদাপ্রসাদ বললেন, যাবে তো চলো বরং স্টেশনে যাই। আমার এক কলিগ আছে।

চলো! প্রমথনাথ পা বাড়ালেন। স্টেশন রোডের দুধারে শিরীষ, অর্জুন, অশত্থ, বটের সার। এই রাস্তাটুকু সায়েবরা পাকা করেছিল। একটা রেশমকুঠি ছিল গঙ্গার ধারে। সেটাই গরজ। এখন সেখানে হাটতলা। গঙ্গার পাড়ে পুরনো কালীমন্দির মেরামত করা হয়েছিল কাত্যায়নী অর্থাৎ গাবুর মায়ের শরীরে দেবীর অনুপ্রবেশের পর। কায়েতবাড়ির বিধবা। শ্যামলা রঙ, ছিপছিপে, কালো চুলে রাতারাতি কয়েকটা জটা। ভরের সময় প্রশ্ন করলে আমূল সঠিক উত্তর দিতেন। গাবু হাফপেন্টুল পরে জিলিপি খেতে খেতে হাটে ঘুরতো। প্রমথনাথই তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেই গাবু। ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন স্কুল শিক্ষক।

প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড এতক্ষণে হেসে ফেললেন। ইঞ্জিনের হঠাৎ-ফোঁস মনে পড়ায়।

কী হলো? হাসছ যে গুণু।

এমনি।

প্রমথনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, রিউমার বেড়ে যাচ্ছে। একটু আগে

হাজারিলালজির আড়তে শুনলাম, গাবুকে ওপারে তারাতলায় দেখেছে কে। শুধু দেখা নয়, মিটিং করছে বলেছে। লালজি সিরিয়াস লোক।

কিসের মিটিং?

তা বোঝা গেল না। গাবুকে তো আমি ভাই কখনো মিটিং-ফিটিং করতে দেখিনি। পার্টি-ফার্টি করতেও দেখিনি। মাঝে মাঝে দেখা হতো। প্রণাম করতো। বলতাম, ফাইনাল একজামিনেশানটা দিলিনে কেন বাবা? আফটার অল, একটা ডিগ্রি না থাকলে চাকরি-বাকরি—মানে, এমনিতেই ঘরে ঘরে এম এ পাশ করে—তো গাবু…

গুণদাপ্রসাদ ছড়ির ডগায় রাস্তার মাঝখান থেকে ইটের টুকরোটা ঠেলে ফেলে দিলেন। হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, কাতুকে তুমি বলতে কাতুরানী! একটা পদ্যও লিখেছিলে মনে পড়ছে।

প্রমথনাথ গালে থাপ্পড় খাওয়ার মতো চমকে উঠেছিলেন। তারপর মুখ উঁচু করে হা হা শুষ্কহাস্য হাসলেন।…তুমি ব্যাচেলার লোক। তোমার আবার এসবও আছে নাকি? রিসেণ্ট অ্যাটাক?

না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

প্রমথনাথ জনহীন রাস্তায় গাঢ় স্বরে বললেন, যৌবনের ধর্ম। তবে তুমি যতটা ভেবেছ বা ভেবেছিলে, অত কিছু নয়। কাতুকে নিয়ে পদ্য লেখা বা স্বপ্ন দেখার লোক কাঁটালিয়াঘাটে অনেক ছিল। গরিব ভদ্রলোকের বউ যৌবনে বিধবা হলে অনেক কিছু ঘটবার সম্ভাবনাও থাকে। সবাই তো তোমার মতো ব্রহ্মচারী নয়।

সরি! আই ডিডন্ট্‌ মিন ছাট, প্রমথ।

প্রমথনাথ বাল্যবন্ধুর কাঁধে ভালোবাসার হাত রেখে বললেন, না, না। আমি রাগ করিনি। জাস্ট একটা রিয়্যালিটির কথা বলছি—এ ক্রুড রিয়্যালিটি। কাতুকে সেটা কেন করতে হয়েছিল। অতএব কাতুও একজন ফাইটার ছিল। তুমি বলবে, দেবীর ভর। আর আমি বলব, সেটাই তার ফাইট। একটা জিনিস দুদিক থেকে দেখা আর কী!

কথা ঘুরিয়ে দিলেন গুণদাপ্রসাদ।…তুমি বলছিলে গাবুর ব্যাপারটা অংক কষে বুঝিয়ে দেবে!

প্রমথনাথ সতর্কভাবে চার পাশটা দেখে নিয়ে বললেন, ওই কালীমন্দির। গোবর্ধন চন্দ্রমশাই মন্দিরের নামে ছাতিমতলার উল্টোদিকে—কাল জায়গাটা তুমি

আশা করি লক্ষ্য করেছ, খানিকটা ধানক্ষেত, খানিকটা জঙ্গল হয়ে আছে—সামান্যই জঙ্গল অবশ্য।

করেছি। গুণদাপ্রসাদ আগ্রহে বললেন। চন্দ্রমশাই জমি দিয়েছিলেন নাকি?

হুঁ।

তারপর?

একলপ্তে সাত বিঘে পাঁচ কাঠা জমি। কাতু যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন একে-ওকে দিয়ে সাত বিঘে চষিয়েছিল। বাকিটুকু পারেনি। হঠাৎ মারা গেল। তারপর গাবু ভোগদখল করতো। পুজো আচ্চায় যা লাগে, রেগুলার দিত। মায়ের পুজোরি কাতুই বহাল করে গিয়েছিল—তুমি চিনবে, মোহনের ছেলে জিতেশকে। গাবু তো কায়েত—বামুন নয়।

বুঝলাম। বামুন-কায়েতে বিবাদ।

হাত তুলে নাড়তে নাডতে প্রমথনাথ বললেন, নো, নো। জিতেশ গাবুর রান্না পর্যন্ত করে দিত।

তাহলে চন্দ্রমশাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে?

এগেইন ইউ মিস্‌ড্ দা টার্গেট। স্কুল শিক্ষক চোখে ঝিলিক তুলে হাসলেন। চাষ জমির বর্গা করতো মুসলমানপাড়ার সোলেমান। তার নাম বর্গাদার বলে রেকর্ড হয়েছিল। না—বিবাদ তার সঙ্গেও নয়।

তবে কার সঙ্গে?

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। ফিসফিস করে বললেন। অনেক রথী-মহারথী জড়িত। এইটটি টুতে বারোয়ারি পুজো কমিটি হলো। ব্যস, সেই সূত্রপাত। গাবু রেকর্ড বের করে আনল। সিক্সটির রিভাইজড্ সেট্‌লমেণ্ট রেকর্ড। তাতে শ্রীমতি কাত্যায়নী দেবীর নাম। সবাই হতবাক।

কিন্তু সম্পত্তি তো দেবোত্তর।

কাতু ধূর্ত মেয়ে ছিল। প্রমথনাথ হাসতে থাকলেন। তাছাড়া তখন তার দাপট বলে দাপট, ইনফ্লুয়েন্স—প্রচুর। দম নিয়ে বললেন, এখন একটাই রাস্তা খোলা ছিল। চন্দ্রমশাইয়ের উইল নিয়ে মামলা লড়া। তবে তাতেও সুবিধে হতো কি না আই ভেরি মাচ ডাউট। গাবুকে যদি বা হটানো যেত, সোলেমান? সে বর্গাদার। শুধু তাই নয়, সে গাবুর চেলা বলতেও পারো। হিন্দু-মুসলিম রায়ট বাধতেও পারত। অতএব মেক গাবু এ নকশাল অ্যাণ্ড স্ম্যাশ হিম।

গুণদাপ্রসাদ আস্তে বললেন, মফস্বল গ্রামগঞ্জে আজকাল দেখছি বড্ড জটিল অবস্থা।

সে সর্বত্রই। কোথায় নয়? আসলে, হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, মানুষের সমাজের ভেতর পচ ধরলেই জটিলতা—

কিন্তু গাবু গুলি খেয়েও চলে যায় কী করে? দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল।

প্রমথনাথের আর হাসির ইচ্ছা নেই। বললেন, তোমাদের বাড়িতে তো টি ভি আছে? দিল্লি, বাংলাদেশ ক্লিয়ার আসে।

টি ভি-র কথা কেন? গুণদাপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন। খ্যাদোড় ঠিকই বলছিল। কাঁটালিয়াঘাটে হেঁয়ালি চিরাচরিত।

প্রমথনাথ অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমার জামাইবাবাজি সম্প্রতি একটা ছোট্ট টি ভি দিয়ে গেছে। আমার তত আগ্রহ নেই। তবে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। দেখি। হিরোকে গুলি করেছে। পড়ে গেছে। ভিলেন ভাবলো, দিয়েছি ব্যাটাকে খতম করে। ভেবে যেই কাছে না আসা, হিরো এক লাফে তাকে কাত করে দিল। মানেটা বুঝলে তো? গুলি লাগেনি। ভান করে পড়ে ছিল।

প্ল্যাটফর্মে উঠে গুণদাপ্রসাদ ফের বললেন, দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল!

থাকলে কী হবে? হঠাৎ চটে গেলেন স্কুল শিক্ষক। সাইক্লোনিক ওয়েদার। ছাতিমগাছের নর্থ ইস্টে বডি। সেদিক থেকে সাইক্লোন, বৃষ্টির ছাঁট। লজিক্যালি বলা চলে সেপাইরা ছাতিমগাছের সাউথ-ওয়েস্টে চলে এসেছিল। সেই ফাঁকে গাবু কেটে পড়ে। ইজি সলিউশান!

গুণদাপ্রসাদ ভাবলেন খ্যাদোড়ের বৃত্তান্তটি বলবেন। বললেন না। প্রমথনাথ গাঁজা বলে উড়িয়ে দেবেন। তিনি তো তাঁর মতো কোনো জ্যোৎস্না রাতে নির্জন প্রান্তরে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুনো শ্বেতবসনা নারীকে দেখেননি।...

কয়েকটা দিন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব, বাস্তব-অবাস্তবের গুলিয়ে যাওয়া, বারবার জ্যোৎস্না রাতের ভূতটি চোখে পড়া—গুণদাপ্রসাদ নিজের এই বিপন্নতার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন। মোক্ষদাপ্রসাদের বউ রমলার দুই মেয়ে। বড়োটি পাত্রস্থ হয়েছে বরানগরে, তার জেঠুর চেষ্টায়, ফলে রমলা বড়োভাসুরের প্রতি কৃতজ্ঞ। দোতলার একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে সেবাযত্ন করছেন। ছোট মেয়ে সোমার ক্লাস নাইন চলছে। ফেল করে করে নাইনে ঠেকে গেছে। একটু রগচটা স্বভাব। বাবার অনেকটাই পেয়েছে যেন। নিচের তলাটা রণদাপ্রসাদের ভাগে

পড়েছিল। তার বউ সুমিতা 'নিউট্রিশান সেণ্টারে' দুধ-মাইলো বিলিয়ে মাসে শ'খানেক টাকা পায়। দুই ছেলে অংশু ও রঞ্জু, এক মেয়ে দীপা। অংশু কলেজে এক বছর পড়েছিল। রঞ্জু এখন ক্লাস সিক্সে। দীপা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে উঠোনে তুলকালাম বাধায়। সুখের কথা, দুই জায়ে খুব মিলমিশ আছে। ছেলেমেয়েরা দুই বিধবার ঘরেই কাড়াকাড়ি করে খায়। সুমিতার সকালে ডিউটি। ততক্ষণ দীপা রমলার জিম্মায়। বেশ ভালো লাগে গুণদাপ্রসাদের। মোক্ষদাপ্রসাদের ভিলেনি কীর্তি শেষ দশ বিঘেয় বর্গাদারের নামে রেকর্ড ঠেকানো। নইলে ঝামেলা হতো। লাঙল যার, জমি তার, সেটা উচিত কথা— গুণদাপ্রসাদের হিসাবে। কিন্তু এতগুলো দ্বিপদ প্রাণীর অবস্থা শোচনীয় হতো। রমলা তাঁর দেবরের জমির তদারক করেন। মঘা হালসানা বুড়ো হয়েছে। তার ছেলে রতনের খেতাব মাহিন্দার। একজোড়া বলদ রেখে গেছেন মোক্ষদাপ্রসাদ। রমলার চেষ্টায় এইসব কৃষিব্যবস্থা টিঁকে আছে। কলকাতাবাসী প্রয়াত মেজ-ভাসুরের ছেলেমেয়েরা কৃষি বোঝে না। জেঠুর মতোই মাটি চেনে না। তাই মাটির ভাগ নিতে আসে না। কাকারা বেঁচে থাকায় সময় কালীপুজো দেখতে আসতো। কাঁটালিয়াঘাটে সাতখানা কালীপ্রতিমা ছিল তখন। দুর্গাপুজো খান দুই। তবে শাক্ত মাটিতে কালীপুজোর ধুমটাই বেশি। অতীতে নরবলির কথা শোনা যায়। এখন পাঁঠাবলির রেওয়াজও কমিয়ে দিচ্ছে পূর্ববঙ্গীয় মিষ্টিক ভক্তির প্রভাব। তবে বিধ্বস্ত রেশমকুঠির বুকে গজিয়ে ওঠা হাটতলার শিয়রে সুপ্রাচীন কালীমন্দির, ক'বছর থেকে যা নিয়ে বিরোধ, এখনও প্রচুর পাঁঠার রক্ত না দেখলে জেগে ওঠে না। বড়ো বেশি রক্ত, তাই যেন বড়ো বেশি বিরোধ— গুণদাপ্রসাদের ধারণা হয়েছে এতদিনে। ওই পুরনো দেবী-ভাস্কর্য বিসর্জনের নয়। বিসর্জিত হয় একটি পশুরক্তচিহ্নিত ঘট, যা প্রতীক, কাত্যায়নী জটার ওপর যেটি ধারণ করে গঙ্গার বুকে জলে নামতো এবং প্রতীকসহ ডুব দিত। উঠতো প্রতীকহীন সিক্ত জটা নিয়ে নাকি আধ ঘণ্টা পরে। আ-ধ-ঘ-ণ্টা! গুণদাপ্রসাদ শুনে অবাক। প্রমথনাথের মতে, প্র্যাকটিস। তুমি প্র্যাকটিস করো, তুমিও পারবে। যোগবল? দ্যাটস রাইট, গুনু! ওটা আদতে এক ধরনের এক্সাসাইজ। প্রমথনাথ বড়ো জ্বালাচ্ছেন দেখে গুণদাপ্রসাদ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন ক্রমশ। বাড়িতে বলা আছে, 'বেরিয়েছেন।'

তবে সত্যিই বেরলে টো টো করে ঘোরেন। শর্টকার্টে রেল কোয়ার্টারে রসময়ের কাছে, সেখান থেকে মাঠ ঘুরে বাঁওরে, কোনো সময় কাত্যায়নীর নামে

রেকর্ড করা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে সেই ছাতিমতলায়। বাঁধের নিচের সমতল একটুকরো জায়গায় ঝোপঝাড় ফের চিকন হয়েছে। পলির দাগ ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে। কালকাসুন্দে, আকন্দ, কুঁচফল, নাটাকাঁটা, শেয়াকুলের ভেতর হিজল, জাম, জামরুল, ভাঁড়ুলের উঁচু উঁচু উদ্ভব। সায়ন্টিস্ট ! এক্সপ্লেন করো।

আদাব বড়োবাবু !

গুণদাপ্রসাদ পিছু ফিরে দেখতে পেলেন মাঝখানে সিঁথি একরাশ চুল, কয়রা চোখ, তামাটে গড়নের জোয়ান। পরনে লুঙ্গি, হাফহাতা হাওয়াই শার্ট, খালি পা। একটা হাতে গামছায় কী একটা জড়ানো। তার পেছনে সমবয়সী. হাঁটু অব্দি গুটোনো ফুলপ্যান্ট জংলি ছাপমারা স্পোর্টিং গেঞ্জি, চুলে কেতা আরো একজন। সে বলল, নমস্কার বড়োবাবু। বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

প্রথম জন হাসল। আমার নাম মাতো, বড়োবাবু।

দ্বিতীয় জন বলল, সোলেমনের ছেলে, বড়োবাবু। আমাকে অবশ্য চিনবেন। আমি সেই কালো। সেজবাবুর বডিগার্ড ছিলাম।

গুণদাপ্রসাদের বুকের ভেতর হাতুড়ি পড়তে লাগল। মনে পড়েছে, মোক্ষদাপ্রসাদের সঙ্গে এইরকম সব ছেলে ঘুরতো। মোক্ষদাপ্রসাদ বলতো, বডিগার্ড ছাড়া আজকাল চলে না। গুণদাপ্রসাদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মাতো বলল, আপনি থাকলে এসব হতো না, বড়োবাবু ! বাপজি আপনার কথা খুব বলে। বলে, কাঁটালঘাটের মালিক ছিলেন বড়োবাবুরা। বলে, আপনার বন্দুকের টিপ ছিল। পাখি উড়িয়ে দিয়ে তবে গুলি করতেন।

কালো চোখে একটা ইশারা করে বলল, দেখা না একবার বড়োবাবুকে। মালটা কেমন বলতে পারবেন।

মাতো কাছে এসে গামছায় জড়ানো জিনিসটা বের করলে গুণদাপ্রসাদ চমকে উঠলেন। একটা লম্বাটে দিশি পিস্তল। দ্রুত বললেন, ভালো। কিন্তু এ দিয়ে কী করবে তোমরা ?

কালো হাসল। যাই করি, মালটা কেমন দেখলেন বড়োবাবু ?

ভালো।

মাতো ও কালো বাঁধের ভাঙা অংশটার দিকে পা বাড়ালে গুণদাপ্রসাদ কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন, শোনো, শোনো।

দুজনে ঘুরে দাঁড়ালো। চারের দশকে রমাপ্রসাদ যখন কাঁটালিয়াঘাটে আসেন, তখনো এ দিকটায় জঙ্গল। বাঘ ছিল। সেইরকম, বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ালো, চনমনে চাউনি। বাঘগুলো মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে। আবার বাস্তব-অবাস্তবে জড়িয়ে-মড়িয়ে যাচ্ছে। গুণদাপ্রসাদ মাথা ঠিক রেখে একটু হাসলেন …গাবুর ব্যাপারটা কী হয়েছিল হে?

কালো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, গাবুদার কী হবে? দারোগাবাবু তাড়িয়ে এনে ওকে ওইখানটাতে গুলি করেছিল। করুক না। এক গাবু যাবে, আরেক গাবু আসবে।

বর্গাদার সোলেমানের ছেলে মাতো বলল, তাই বলে ওই জমির ধান ষষ্ঠীবাবুদের ভোগে লাগবে না। গাবুদা বলেছিল, আমি না থাকলে আমার অংশ বিলিয়ে দিও। তাতে বাপজির আপত্তি নাই, বড়োবাবু!

ওরা চলে গেলে গুণদাপ্রসাদ গুম হয়ে পা বাড়ালেন। মাটির এত ঝামেলা। কিছু বোঝা যায় না। একবার মনে হচ্ছে, কাত্যায়নী কেন নিজের নাম রেকর্ড করিয়েছিল—করিয়েই নিজের ছেলের মৃত্যুর কারণ হলো, আবার মনে হচ্ছে, এসব কিছু ঘটতো না—যদি তিনি সাহস করে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ঝিরঝিরে বৃষ্টির রাতে…

জোরে মাথা দোলালেন গুণদাপ্রসাদ। না, না। তাহলেও ভুল হতো। দেবীর প্রাপ্য, দেবীর চয়েস—তাঁর মতো নিছক মানুষ গ্রহণ করে ভীষণ বিপদে পড়ে যেতেন। এদিকে কেলেঙ্কারির একশেষ হতো। রমাপ্রসাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে যোগ দিতেন কাতুর বাবা প্রভাকর ঘোষ। কাঁটালিয়াঘাটে তখন দুর্ধর্ষ মানুষ বলতে ঘোষবাবুই ছিলেন। রমাপ্রসাদের পাশে না দাঁড়ালে এই মাটিটুকুও চলে যেত অন্যের হাতে। তাছাড়া মাতাল মানুষ। তেমনি গোঁয়ার। মেয়ের পাত্র ঠিক করাই ছিল। অন্য কিছু হলে সহ্য করতেন বলে মনে হয় না।…

দুপুরে দোতলায় খাটে শুয়ে ভাতঘুমের রেশটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। তাহলে কী জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা শ্বেতবসনা কাত্যায়নীকেই দেখেছিলেন? বুকটা হু হু করে উঠল। বুঝতে এত দেরি হয়ে গেল!

জেঠু, ঘুমোলেন নাকি?

সোমাকে দেখে গুণদাপ্রসাদ বলেন, না রে! আয়! বোস এখানে।

সোমা বলল, জেঠু জানেন কী হয়েছে?

কী রে ?

গাবুদাকে বেলডাঙার হাটে মিটিং করতে দেখেছে। নাকুদা দিব্যি করে বলল, গাবুদা ! মুখে দাড়ি গজালে কী হবে, গলার স্বর ?

গুণদাপ্রসাদ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, খুব রিউমার ছড়াচ্ছে তাহলে।

সোমা সিরিয়াস হয়ে বলল, রিউমার নয়। তারাতলায় পোস্টার পর্যন্ত পড়েছে। অঞ্জলি স্বচক্ষে দেখে এসেছে। পোস্টারে বড়ো বড়ো লেটারে লেখা আছে, গাবুদা সামনের রোববার মিটিং করতে আসবে। খুব হিড়িক পড়ে গেছে —অঞ্জলি বলল।

গাবু দেখছি তোদের হিরো ছিল, না !

সোমা রাঙা হয়ে ভ্যাট্ বলে বেরিয়ে গেল। গুণদাপ্রসাদ উঠে বসে নস্যি নিলেন। আজকাল এই হয়েছে ; হিন্দি ফিল্মের ইমপ্যাক্ট। অবশ্য প্রমথনাথের মতে, গাবু মস্তান বা সমাজবিরোধী ছিল না। ফাইটারই ছিল। তবে শেষে বুঝেছেন ফাইটটা দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে। কেননা গাবু অর্জুন না দুর্যোধন, সেটা সাব্যস্ত করতে পারছেন না প্রমথনাথ। ফের বাস্তব-অবাস্তবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। খ্যাদোড় বলছিল, কেউ মরতে চাইলে ধন্বন্তরিও তাকে বাঁচাতে পারে না। এও গোলমেলে ব্যাপার। গাবু মরতে চেয়েছিল কেন ? আসলে হয়তো ব্যাপারটা যে-যার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। কিন্তু কাতুর ছেলে 'লেজেণ্ডারি ফিগার' হয়ে উঠছে কেন ? 'কেন'র চোটে প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড উত্যক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, এখানে থাকবেন না। কলকাতায় অন্নদা-প্রসাদের ছেলেদের কাছে গিয়ে থাকবেন। চেতনা-অবচেতনার এই সংঘর্ষ আর সহ্য হচ্ছে না।···

'জনগণ তৈরি থাকুন ! চাষীভাইরা তৈরি থাকুন ! কাঁটালিয়ার মাঠে ফসল পাকার সময় আমাদের সবার গাবুদা এসে যাবে।'

গুণদাপ্রসাদ থমকে দাঁড়িয়ে লাল হরফে ছাপানো পোস্টারটি পড়ছিলেন। মুখে ধীরে ধীরে উত্তেজনা ফুটে উঠল। পা বাড়ালেন বাজারের দিকে। আবার পোস্টার চোখে পড়ল। ডাইনে-বাঁয়ে শ্রেণীবদ্ধ পোস্টার—একটার পর একটা। মহাশ্মশানের দিক থেকে আশ্রমের মাইকে মিষ্টিসিজম এগিয়ে-পিছিয়ে পোস্টার-গুলিকে স্পর্শ করছে। পোস্টারগুলি সুপ্রাচীন শাক্তপ্রতীকে রূপ নিতে নিতে জটা, রক্ত, মড়ার খুলি, কারণবারি, কাত্যায়নীর ভৈরবী চেহারা হয়ে উঠেছিল।

ঝাপসা করে দিচ্ছে মিষ্টিক ভক্তি-বাষ্প। কালীপুজোর আর দুদিন বাকি। কালীপুজোটা দেখেই চলে যাবেন গুণদাপ্রসাদ। কলকাতায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। জবাবের জন্য অপেক্ষা শুধু। কারুর কাঁধে তো গিয়ে ভর দেবেন না, স্পষ্ট সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। এমন সময়ে ওই পোস্টারগুলি ডাইনে-বাঁয়ে সার বেঁধে তাঁকে অনুসরণ করছে। ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছে।

এই যে গুনু! প্রমথনাথ তৈরি ছিলেন কোথাও। আচমকা ঝাঁপিয়ে এলেন। চোখে কেমন পাগলাটে হাসি। চাপা স্বরে বললেন, দেখছ কাণ্ডখানা?

গুণদাপ্রসাদ ফোঁস করে উঠলেন। কাণ্ড কিসের? এটাই তো হয়।

কী হয়?

কারচুপি। প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড রাগী মুখে বললেন। লোকখেপানো চাতুরী! মিথ্যাকে সত্যি করা!

স্কুল শিক্ষক তাঁর একটি দীর্ঘ বন্ধুবৎসল হাত ওর কাঁধে রাখলেন।...নো নো। ফ্যাক্ট। ক্রুড রিয়্যালিটি! আমি তোমাকে বরাবর বলেছি, গাবু বেঁচে আছে।

কাঁধের হাত কোমল করল গুণদাপ্রসাদকে। আস্তে বললেন, তুমি ইতিহাস ইতিহাস করো। জানো না মরা মানুষের নাম ভাঙিয়ে জ্যান্ত মানুষেরা কী করে?

করুক। মোটভটা বুঝতে হবে, তাতে ভালো না খারাপ হবে! অবশ্য গাবুর ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। এ রেয়ার কেস।

উত্তেজনা এ বয়সে মানুষকে সহজে ক্লান্ত করে। গুণদাপ্রসাদ চা খেয়ে বেরিয়েছেন। তবু আর একবার চা দরকার মনে হলো। বললেন, এস, চা খাই।

জগনের দোকানের দিকে পা বাড়িয়ে প্রমথনাথ একটু হেসে বললেন, পোস্টার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অ্যালার্ট হয়ে গেছে। এম এল এ জিপে চেপে দেখতে এসেছিলেন। গুলি খাওয়া বাঘের মতো চলে গেছেন। তবে দিস মাচ। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ গুনু, পোস্টার কেউ ছিঁড়বে না। কারণ সবাই এটাকে তোমার অ্যাঙ্গল থেকে দেখছে। জোক ভাবছে। কিন্তু আমি জানি, এটা জোক নয়। লেট দা হার্ভেস্টিং সিজন কাম! স্বচক্ষেই দেখবে।

অগত্যা করুণ হাসলেন গুণদাপ্রসাদ।...গাবুকে?

ইয়েস—গাবুকে। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন প্রবীণ, ঢ্যাঙা, ধুতি-পাঞ্জাবিপরা স্কুল শিক্ষক।

চায়ের গেলাস এগিয়ে চা-ওলা জগন ফিক করে হাসল। কি মাস্টারমশাই?

আমি কি কইছিলাম?

ঘাটের মুখে আজ জমাট ভিড়। পাটের পাহাড়। ক্যাসেট প্লেয়ার, ট্রানজিস্টারের চিৎকারে কান পাতা যায় না। প্রমথনাথ মাটির ভাঁড়ের ঝটপট চা শুষে নিয়ে জুতোর তলায় স্বাস্থ্যবিধির কারণেই ভাঁড়টিকে মড়মড়িয়ে ভাঙলেন। গুণদাপ্রসাদের দেরি হচ্ছে। তাঁকে টেনে ওঠালেন। গুণদাপ্রসাদকে জোর করেই বাঁধে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

ভয়াল ও জৈব ছাতিম গাছটির কাছে গিয়ে প্রমথনাথ বললেন, ছড়িটা দাও। হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ছড়িটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হলো। গুণদাপ্রসাদ ছাতিম গাছের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, প্রমথনাথ নিচের মাটিতে ছড়ির দাগ টানছেন। এইখানে গাবু পড়েছিল। কেমন তো? এবার তুমি গাছটার পেছনে যাও। আহা, যাও না! না! তোমার মুখ উল্টোদিকে। দেখতে পাচ্ছ আমি কী করছি? পাচ্ছ না? আমি এই ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে গঙ্গায় পড়লাম। ব্যস্! এবারে তুমি এদিকে মুখ ফেরালে। দেখলে কেউ নেই। অতএব ধাঁধায় ভোগো। চাকরি যাবে দেখে গপ্প রটাও। চোখ থেকে টসটস করে জল ফ্যালো। বলো, 'একটা মেয়েছেলে এসে বড়ি তুলে নিয়ে গেল। তার গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধেনি।' কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে যেহেতু 'ভূত' টার্মটা নেই, তার ডেফিনিশনও নেই; সেই হেতু কমিশন তোমাকে—তোমাদের দুজনকে সাসপেণ্ড এবং মেণ্টাল হসপিট্যালে পাঠানোর রেকমেণ্ড করুন। ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত বদলিতে রফা হোক। কী? বুঝতে পারছ! ক্লিয়ার?

গুণদাপ্রসাদ নিচের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমথনাথের পেছনে, ঠিক জলের ধারে নুয়ে-পড়া হিজল-জাম-জামরুলের আড়ালে ঘন ছায়ার ভেতর একটা আবছায়ার নড়াচড়া দেখছিলেন? শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে সমান্তরালে ধাবিত শ্বেতবসনা কাত্যায়নী—হ্যাঁ, কাত্যায়নী ছাড়া আর কে হতে পারে, অবশেষে এই সন্ধ্যায় আবার এসে দাঁড়ালো কী? গুণদাপ্রসাদ মাটিতে দাঁড়িয়ে, অতএব সেও মাটিতে দাঁড়িয়ে—সমান্তরালে। ব্যবধান রেখে চলা ওর স্বভাব ছিল।

প্রমথনাথকে অবাক করে প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড ভিজে মাটিতে নেমে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শ্রেণীবদ্ধ, ঝুঁকে-পড়া, জলে শেকড়বাকড় মরিয়া হয়ে আঁকড়ানো গাছপালার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাঁরই ভাইঝি

সোমা! এখানে কী করছিল? এমন করে পালিয়ে গেল কেন?

প্রমথনাথ ডাকছিলেন। গুণদাপ্রসাদ দ্রুত ফিরে এলেন। প্রমথনাথ বললেন, কী ব্যাপার?

কিছু না।

স্কুল শিক্ষক আগের কথায় ফিরে এলেন। তাহলে এবার বুঝলে তো গাবু বেঁচে আছে?

আছে। প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড অতি কষ্টে শব্দটা উচ্চারণ করলেন। আসলে একেকটা সময় এমন হয়, যখন কারুর কিছু করার থাকে না।···

সরাইখানা

মেহগিনিতলায় গোলাপি ওত পেতে বসেছিল। শাড়ির আড়ালে বগলদাবা একটা ছাগলছানা, কুচকুচে কালো। এ বয়সে বড্ড বেশি ছটফটে। কিন্তু যে-গোলাপি আজ সকালেও তার জন্য মায়ের আদর নকল করেছে, সেই গোলাপির হাতে এখন নিষ্ঠুরতা। নিষ্পলক চোখের তারা কোণঠাসা করে শাদা রঙের মোটরগাড়িটা দেখছিল, দূরে। গাড়িটা, শাদা রঙের গতিশীল জিনিসটা সবুজ মাঠের পারিপার্শ্বিকে প্রচণ্ড চোখে পড়ে। যত কাছে আসে, গোলাপির সঙ্গে তার একটা হিংস্রতার কার্য-কারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কাছাকাছি এসে পড়তেই সে ছাগলছানাটা গড়িয়ে ফেলার ভঙ্গিতে সামনে ছুঁড়ে দেয়। ব্রেকের বিচ্ছিরি শব্দ হয়, তারপর শাদা মোটরগাড়িটা এসব কিছুই নয়, এমন একটা ভাব দেখিয়ে ছিটকে চলে। আর গোলাপির গলা শিবতলার ছোট্ট বাজার ভিড়ভাট্টা ছিঁড়েখুঁড়ে গনগনে নীল আকাশে নখের আঁচড় কাটতে থাকে, মেরে দিলে গো! জানে মেরে দিলে গো! বাটপাড় হারামি গাড়িওলা গো! এর সঙ্গে পোঁচের পর পোঁচ কুচুটে কান্না দিন-দুপুরের ঝলমলে বাজার জায়গাকে শোকে কালো করার চেষ্টা।

অমনি অ্যাকশন শুরু। একটা দঙ্গল বাজারের দিকে হৈ রৈ মার মার কাট কাট তুলকালাম জুড়ে দেয়। তদুপরি বাম্প। বাম্প ডিঙিয়ে চলা মরিয়া বেচারা গাড়িটার, ঝকঝকে শাদা গতিশীল জিনিসটার সামনে খানিকটা অন্তর ফটাস ফটাস আওয়াজ দিতে দিতে অন্তত খানতিনেক কাঠের বেঞ্চি পড়ে। সড়ক দফতরের খালি একটা পিচের ড্রামও ঢন ঢন করে গড়িয়ে আসে। বেঞ্চিগুলো অবশ্য চায়ের দোকানের। জাতীয় মহাসড়কের এখানটাতে ঐতিহ্য-সম্মত ব্যারিকেড।

কাজেই গাড়িটা থেমে যায়। চারদিক ঘিরে মারমূর্তি ছেলেছোকরার দল, নেতার নাম কালী। আর থ্যাঁতলানো রক্তাক্ত ছানাটি বুকে নিয়ে এবার দৌড়ে আসছে শোকাকুলা গোলাপি, মুখের বিলাপে হিংস্রুটে খিস্তি। চেরা চোখে ঝরঝরিয়ে জল। শাড়ি রক্তে মাখামাখি।

গাড়িচালানো যুবকের চোখে সানগ্লাস। সেটা খুলে ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার জন্য মুখ খুলতেই হুঙ্কার, সেই সঙ্গে গাড়িটারও পেটে লাথি, ভড়কে গিয়ে পার্স বের করে। টুকটুকে ফর্সা গোলগাল পুতুল চেহারা, গর্দানে থলথলে মাংস বচ্চনছাঁটের আড়ালে বেরিয়ে পড়ছিল, কারণ দুপুরবেলায় আজ হাওয়াটা খুব ঝাঁঝালো। পাশে তার সঙ্গিনী, তারও চোখে সানগ্লাস। ফুরফুরে চুল উড়ছিল। কালীর দলের যারা তার পাশে, তারা সুগন্ধে জ্বালাপোড়া হচ্ছিল, কিঞ্চিৎ ভাজা-ভাজাও। ফলে ওইদিক থেকে হাঁকরানি উঠল, টাকা দ্যাখায়! টাকা! বাটপাড়ি করে···ইঃ! মেয়েমানুষ লিয়ে ফূর্তি মেরে···এই শুনে যুবতীর গাল লাল এবং ইংরেজিতে আধো আধো বলে, ব্ল্যাকমেলিং! ডোণ্ট বদার অ্যাবাউট মানি, প্লি-ই-ই-জ!

যুবকটি শক্ত মুখে তার পাশের দলটিকে বলে, কত দিতে হবে?

দলটি হাঁকে, গোলাপি! তখন গোলাপি তার বুকেধরা রক্তাক্ত ছোট্ট প্রাণীটিকে দেখিয়ে চিলচ্যাচাঁনিতে বলে, তুমরাই বিচের করো। ইটা বড়ো হতো। খাসি হতো। খাসি হলে ই বাজারে কী রেট হয়, হিসেব করো!

কালীর দল একগলায় হাঁকে, হাজার হয়। পাঁচশোতে রফা।

যুবকটি ভিড়ে 'ভদ্রলোক' খুঁজতে চেষ্টা করে। কিছু কিছু চোখে পড়ে, এদিকে-ওদিকে, তবে তফাতে। সে তাদের ডাকবে ভাবছিল। কিন্তু মুখগুলো পাষাণখোদাই। পেছনে একটা বাস কানফোঁড় আওয়াজ দিচ্ছে। তার পেছনে ট্রাক, টেম্পো। বাসের কণ্ডাক্টার জ্যামের কারণ খুঁজতে এসে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, কা ঝুটঝামেলা করেন সার? সেটেল করে লিন না। যুবকের সঙ্গিনী ফের বলে ওঠে, ডোণ্ট বদার অ্যাবাউট মানি! এবার কথাগুলো ফোঁপানিতে ভিজে। সুতরাং পাঁচখানি একশো এগিয়ে দেয় তার প্রেমিক।

কালী গম্ভীর ডাকে, গোলাপি। এবার সে ঈষৎ শালীন হয় গাড়িওলা সম্পর্কে। বলে, সার যা দিচ্ছেন, লিয়ে লে। তখন গোলাপি নোটগুলো অনিচ্ছার ভঙ্গিতে নেয়। কান্নাটা ছিল। ওদিকে ব্যারিকেডও উঠতে শুরু করেছে। টিনের ড্রাম ঢনঢন করতে করতে সরে যাচ্ছে। শাদা মোটরগাড়িটা ছাড়া পেয়ে প্রথমে আস্তে পরে দ্বিতীয় বাম্প ডিঙিয়ে আচমকা পিছলে চলে। গতিটি রুষ্ট দেখায়। বুঝে গেছে গট-আপ কেস। আর কালীর দল কেমন গম্ভীর, হাসা উচিত ছিল এবার। স্বাভাবিকই ছিল। কালী প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেছে আসলে। পাঁ-চ-শো দিয়ে দিল? সত্যিই দিয়ে দিল! কালীর দলও মুখ

তাকাতাকি করে।

পান-বিড়ির দোকানের মোজাম্মেল হ্যা হ্যা করে হাসছিল। তার সামনে দিয়ে যাবার সময় গোলাপি মুখ ঝামটা দেয়, এত হাসি কিসের রে? যার গেল, তার গেল। তোদের কী?

এই কথায় কাপট্যের সঙ্গে কিছু সত্যিকার শোকও ছিল। আহা রে! আজ সকালেও সবুজ ঘাসের ওপর কালো ছাগলছানাটার প্রজাপতি-নাচ দেখেছিল। বটতলার পেছনে গভীর নয়ানজুলির বুকে বাঁধ। ওপারে উঁচু টাঁড় জমি। সেখানে সারবন্দি কয়েকটা ছোট মাটির ঘরের একটি গোলাপিবালার। সামনে একটুকরো করে খটখটে ন্যাড়া উঠোন। সেখানে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। গোলাপিকে ফিরতে দেখে যে-যার কাজে হাত লাগায়।

গোলাপি লাল-কালো মাংসের দলাটা নয়ানজুলির খাদের জলে ছুঁড়ে ফেলে। এবার সে গম্ভীর, শক্ত মুখ। কারণ একটু পরেই একটা হ্যাপা-সামলাতে হবে। টাকার অঙ্কটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। সেও খুব অবাক হয়েছিল। চলতে চলতে আনমনে ভাবছিল, গাড়িওলা বাবুরা এত টাকা কোথায় পায়? খোলাম-কুচি টাকা? সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল! এতগুলো টাকা দেওয়ার সেও একটা কারণ হয়তো। বাবুরা, গাড়িওলা বাবুরা মেয়ে নিয়ে ফুর্তি ওড়াতে যায়, কালীর কাছেই শুনেছিল। বোঝা যাচ্ছে, কথাটা খুবই সত্যি। নোটগুলো ব্লাউসের ভেতর থেকে ছোট্ট অর্ধবৃত্তাকার পার্স বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে গুঁজে দেয় গোলাপি।

একটু পরে এসে নয়ানজুলির বাঁধের যে দিকটাতে গভীর জল, রক্তমাখা কাপড় ধুতে গোলাপি হুড়মুড়িয়ে নেমে যাবে।···

এই ধান্দাটা প্রথম মাথায় আসে গত বর্ষার এক বিকেলবেলায়। গোলাপির দুটো হাঁস ছিল। নয়ানজুলির জলে দিনমান চরতো। কী খেয়ালে একটা হাঁস উঠে গিয়ে আত্মহত্যা করে। গাড়িটির মালিক ছিলেন এক প্রৌঢ় মারোয়াড়ি। হয়তো জীবহত্যার পাপের কারণের চেয়ে বড়ো এক কারণ ছিল সামনে রথযাত্রার ভিড়। নিজে থেকে কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কালীর দল এসে পড়ে। গোলাপির বুদ্ধি খুলে যায়। পঞ্চাশ বলে চিল-চিৎকার ছাড়তে ছাড়তে শেষে মোটরগাড়ির পেটে কালীর দলের লাথি, এবং ভয়কাতুরে থলথলে মাংসের প্রকাণ্ড পিণ্ডটি তিরিশ ওগরায়। সন্ধ্যায় সেদিন গোলাপির ঘরে ফিস্টি হয়েছিল।

লালু নিজের পয়সায় একটা বোতলও এনেছিল। গোলাপি হাঁসটার ন্যায্য দামবাবদ পনেরো পায়। তবে বৃষ্টির সন্ধ্যায় একলা মেয়ে গোলাপির সেই প্রথম শক্ত মাটি আবিষ্কার, যেখানে দাঁড়িয়ে সে জোর লড়তে পারে।

মাসখানেক পরে সেই আত্মহত্যাকারীর সঙ্গিনীটিকে ইচ্ছে করেই গোলাপি নিষ্ঠুর মুখে একটা নীল রঙের মোটরগাড়ির সামনে ফেলে দেয়।

শিবতলার বাজারে বর্ষা থেকে শরৎকাল জাতীয় মহাসড়কের দশা শোচনীয় ফর্দাফাঁই। আর গোলাপির গলাটাও বড্ড বেশি খর। এই দুর্ঘটনার গাড়ির বাবুটি ছিলেন রাগী মারকুটে চেহারার লোক। পরনে লাল শার্ট, শাদা প্যান্ট।

তর্কাতর্কি করতে করতে বেরুনোর চেষ্টাতেই জানলার কাচ ভাঙল, তার সঙ্গে চোয়ালে কালীর ঘুসি। ভিড়ের বাবুরা বেগতিক বুঝে পঞ্চাশে রফার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

লাল শার্টপরা বাবু মাইল পাঁচেক এগিয়ে থানায় বলতে গিয়ে উল্টে ধমক খান। তাছাড়া ডায়েরি লেখার লোকও নাকি ছিল না। তবে বাবুটির জেদ ছিল। কলকাতায় ফিরে একটা কিছু করেন এবং থানা থেকে এক দারোগাবাবু আসেন তদন্তে। সেখানেই শেষ।

কালীর বাবা হরিনাথের একটি ধাবা আছে শিবতলার মোড়ের কাছে। জাতীয় সড়ক বা মহাসড়ক যখন, তখন দূরপাল্লার মালবোঝাই ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক। মধ্যযুগের সরাইখানাগুলোর চেহারা-চরিত্র ধাবায় বর্তেছে। এখন শুধু তফাত, বণিক-সওদাগরের দল শহরে-গঞ্জে গদিতেই আঁটো হয়ে বসে থাকেন। উট-গাধা-খচ্চরের কারাভাঁর বদলে ট্রাক-টেম্পোর ঝাঁক গড়িয়ে চলে। চলতে চলতে ক্লান্ত চালক আর তাদের সঙ্গীরা হরিনাথের ধাবায় জিরেন খেয়ে যায়। জিরেন খাওয়া মানেই নানারকমের খাওয়া, ভাত-রুটি-মাংস-মদ এবং মেয়েমানুষও। গোলাপির মা ফুরনকেও হরিনাথ পাতে তুলে দিত। ফুরনের মতো মেয়ে হয় না। কোনোকিছুতে না বলতে জানতো না, অথবা বলতে পারতোই না। হরিনাথ তাকে দিয়ে চোলাই তৈরি করাতো। ফুরনের রাঁধুনি-প্রতিভার তুলনা ছিল না।

কিন্তু ফুরন অকালে পুড়েছে চিতের আগুনে। হরিনাথের পুড়তে দেরি হচ্ছে। এখনো পাষাণ-পাথর মানুষ। থানার বাবুরা, আবগারি বাবুরা, পার্টির বাবুরা সবাই তাকে নমস্কার করেন। মধুর হেসে বলেন, খবর কী, হরিবাবু? হরিনাথও শিবতলায় ক্রমে ক্রমে বাবু হয়েছে। তার একটাই ভীষণ দুঃখ, কালীটা

মানুষ হলো না। মেজাজে থাকলে বলে, তুই আমার ব্যাটা না, শালা। বেরো বেজন্মা, চলে যা!

কালীরও মেজাজ হয় কোনো কোনো সময়ে। বলে, শালা, বাবা আছ, আছ। আর একটা কথা বললে ঘেঁটি ধরে খালে ফেলে দেবো।

হরিনাথ ফুরনের গার্জেন ছিল, সেই স্বত্ববলে গোলাপিবালারও গার্জেন। তাকে পাতে দেবার সাধ কালীর হুঙ্কারে ক্রমশ ঘুচে গেছে। তবে ফুবন ছিল এক, তার পেটের মেয়ে গোলাপি আরেক প্রাণী। হরিনাথ ভেবেই পায় না, কেন ওই কালকুট্টি বাঁকামুখীর নাম ফুরন গোলাপিবালা রেখেছিল! গো-লা-পি-বা-লা! হরিনাথ তার ধাবার সামনে দাঁড়িয়ে কুচুটে দৃষ্টিতে টাঁড় জমির ছোট্ট বসতিটিকে দেখে। তখন গোলাপি উঠোনে দাঁড়িয়ে বিকেলের রোদে চুল শুকোচ্ছিল। শুধু ওই চুলই আছে, আর কী? ওতেই কালী হারামজাদা মজে গেল, এইরকম সন্দেহ হয় হরিনাথের। এসব সময় গোলাপি এসে মরা মায়ের লাইনে বরাবরকার মতো বাবা ডাকলে হরিনাথ তাকে থাপ্পড় মারবেই মারবে, তাতে কালী তাকে নয়ানজুলির জলে ফেলে তো, তাও ফেলুক! আর সহ্য হয় না।

ওই টাঁড়ের ওপর হরিনাথের চোলাই তৈরির ডেরা, কাঁটাগুল্মের ভেতর চালাঘর। সামনে কয়েকটি বছরেই ঝাঁপালো হয়ে ওঠা আকাশমণির আড়াল। এই ফুলেল তরু ঝটপট বেড়ে ওঠে। হরিনাথ বনসৃজন প্রকল্পের ব্যাপারটা বুঝেছিল, পাষাণ নিরামিষ মূর্তির মানুষ হলেও বুদ্ধির দীপ্তি তার কাজকর্মে ঝলমলায়। শুধু গোলাপির বেলায় দীপ্তি প্রতিহত হলো। কালীর জন্য, একান্তই কালীর জন্য! হরিনাথ কতবার আভাসে বলেছে, ওরে গাধা, রামপাঁঠা! আমি মলে সকলই তোর। এই ধাবা, একতলা বাড়ি, পয়সাকড়ি। কখনো জড়িয়ে-মড়িয়ে মাতালদশায় বলেছে, কালী। তোর এই বাবাকে শালারা আড়ালে বলে জাতনাশা হোরে। তুই যদি বাবার ব্যাটা হবি, বড়ো জাতের মেয়ে উঠিয়ে আন, দেখি। যাঃ! নিয়ে আয়, দেখি তোর মুরোদ। হুঁঃ, তুই বড়ো বীর হয়েছিস শুনি। কর দেখি এই কাজটা, তবে বুঝি।···আর যদি বলিস, বাবা! তুমি এনে দাও, দেখি। বল্, মুখ ফুটে বল্। তাও পারি।

শেষে টাঁড়ের দিকে আঙুল তুলে বলে, তাই বলে ওই ফুরনের মেয়ে যদি এ সংসারে আসে, জ্বালিয়ে দেবো! পেটরোল এনে জ্বালিয়ে দেবো। হুই দ্যাখ, রতনবাবুর পাম্প। দেখছিস?

কালী তার মাতাল বাবার জামার কলার খামচে ধরে বলেছিল, ফের যদি

এই কথা শুনি, বাবা-টাবা মানব না। শালা নেমকহারাম।

খাটিয়া থেকে সর্দারজিদের একজন উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। না গেলেও কালী ছেড়ে দিত। বাবার সঙ্গে এর বেশি লড়তে তার বাধে। লোকেরা আড়ালে হাসাহাসি করবে, এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ অবশ্য আছে। ধাবা ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। এই মহাসড়কে অনেক ধাবা আছে কালী দেখেছে ধাবাওলাদের খুন হয়ে পড়ে থাকার ঘটনা আকছার ঘটে। হরিনাথেব কিছু ঘটলে তার ঘাড়েই দায়টা পড়বে। ভাবতেই কেমন কষ্ট হয় কালীর। গা গুলোয়। তার নেমকহারাম বাবাটা বুঝেও বোঝে না, তাকে কে আড়াল থেকে সবসময় গার্ড দিচ্ছে। এও বোঝে না, কালী শিবতলা থেকে সরে গেলেই চাঁদুবাবুর দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কালীর দল শিবতলা বাজার দখলে রেখেছে তিন বছর ধরে। ফলে হরিনাথকে আর একটা পয়সাও বাড়তি খোয়াতে হয় না। আবগারি, থানা, পার্টির বাবুদের কথা আলাদা। আর চাঁদুবাবুর দলের খাঁকতির বহর কত ছিল, হরিনাথ জানে। জেনেও ভুলে থাকে। সেই জামার কলার ধরার দিন কালী কেন আস্তে নেমকহারাম বলে চলে গিয়েছিল, মাতাল হরিনাথ বোঝেনি, এ একটা দুঃখ কালীর।···

লম্বা উঁচু টাঁড় জমিটার শেষদিকটায় সাবেকি শিবতলা গ্রাম। নিচের সমতলে পঞ্চায়েতের কৃৎকৌশলের তৈরি রাস্তা, যেটি বাজারগামী। লাল হয়ে আছে সুরকি গুঁড়োয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে গোলাপি রাস্তাটি পেরোয়। সামনে চাঁদুবাবুর বাড়ির গেট। ভেতরে ফুলবাগিচার সৌন্দর্য। চোখে চোখ পড়তেই চাঁদুবাবুর ভুরু কুঁচকে যায়। গলার ভেতর বলেন, কী রে?

গোলাপি একটু হাসে। বাবুর কাছে এলাম রাখলে রাখুন, মারলে মরুন।

কালীর ফাঁদ ভেবে একটু দোনামনায় পড়ে যান চাঁদুবাবু। বলেন, জার্মান! শোন তো কী বলে। জার্মান বাইরের বারান্দায় তাঁর মোটরসাইকেল সাফ করছিল। করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে দেখে সেও অবাক।

গোলাপি বলে, গেট খুলে দিবি না নাকি রে? এমন করে তাকাচ্ছে, যেন আমি এক ভূত না টাঁড়ের পেত্নী।

জার্মান খ্যা খ্যা হাসে এবার। জানেন বাবুদা? গোলাপি আজ পাঁচশো টাকা আদায় করে ছেড়েছে। এইটুকুন একটা ছাগলের বাচ্চা। পারে মাইরি!

উঠে এসে গেটটা অবশ্য খুলে দেয়। গোলাপি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বড়ো

খবর হয়েছে। চাঁদুবাবু খবর এবং ফাঁদ, এ দুয়ের মধ্যে জেরবার। কারণ ফুরন আর তার মেয়ে এক নয়। জার্মানটা আবার গেটও খুলে দিল। শেষে ঠিক করেন, ফাঁদ তো ফাঁদই। বাজিয়ে দেখা যাক। বারান্দার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, কী? কালী কেড়ে নিয়েছে তো? তোর মা চিনতো বাপ-ব্যাটাকে। তুই চিনিসনি! এতে আমি কী করব, বল?

গোলাপি ফিসফিসয়ে বলে, গোলামকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, সন্ধেবেলা ফিষ্টি করতে আসবে। বাবুর কাছে এই নোট চারখানা রাখতে এলাম। নৈলে পরে হারামির পাল সবগুলানই খচ্চা করিয়ে ছাড়বে। কালী কিচ্ছু বলবে না, জানেন বাবু? বলতে পারবেই না।

চাঁদুবাবু ফাঁদ পরীক্ষার ছলে বলেন, থাপ্পড় খাবি। কালী তোর বডিগার্ড!

বুঝলেন না! গোলাপি মুখটা করুণ করে বলে। হারামির পাল মাতাল হলে কালী সামলাতেই পারে না। পাঁচখানা নোটই খচ্চা না করিয়ে ছাড়বে না। আর কালীকে তখন কিছু বলতে গেলেই বলবে, ছেড়ে দে! সে ফুঁপিয়ে ওঠে। নাক মুছে বলে, ইদিকে যার গেল তার গেল। এইটুকুন থেকে পেলেপুষে এতবড়টা করলাম। দুটো বিয়োলে। মুখবাগে তাকাতে পারছি না, বাবু গো!

সে ছাগলটির কথা বলছিল। চাঁদুবাবু হাসেন এতক্ষণে। বলেন, টাকা যে রাখতে এলি, না হয় রাখলাম। সন্ধ্যাবেলার আসরে শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে সামলাবি কেমন করে? যদি বলে, পুরোটাই ঝাড়। যদি তোকে—

গোলাপি ততক্ষণে তার বুকের কাছ থেকে ছোট্ট পার্সটি বের করেছে। চারখানা একশো হাতে গুঁজে দিতেই বাবু চুপ। জার্মান আবার মোটরসাইকেলে ন্যাকড়া-কানি প্রয়োগ করছে। মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীরভাবে তাকায়। গোলাপি ভিজে চোখ কটমটিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, এই ছোঁড়াটাকে সামলান বাবু। ওদের কানে গেলেই আমার শতেক খোয়ার হবে।

জার্মান বলে, আরে না না! তোর মাথা খারাপ? আদায়-কাঁচকলায় সম্পক্ক।

একথা বলার কারণ, সে বুঝেছিল বাবু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কালীকে টিট করার জন্য বাবু কত তাল করে বেড়াচ্ছেন, সে সবই জানে। বিশেষ কথা, সে বাবুর বডিগার্ড। বাবু ঘুম থেকে উঠে ফের ঘুমুতে ঘরে ঢোকা পর্যন্ত যা যা করেন, যেখানে যেখানে যাতায়াত, কথাবার্তা, সকলই তার চেতনায় থাকবন্দি সাজানো আছে।

শুধু এই খবরটা তার জানার উপায় ছিল না যে, এই গোলাপির মা ফুরনও

বাবুর কাছে টাকাকড়ি লুকোতে আসতো। কারণ তখন সে ছিল হাফপেণ্টুলান পরা বালক। কাজেই ফুরনের মেয়ে হয়েও কালীকে লুকিয়ে কালীরই শত্রুপক্ষের লিডারের কাছে টাকা রাখতে এসেছে, এই ঘটনা তাকে ভড়কে দিয়েছিল।

গোলাপি পাখির পায়ে চলে গেলে চন্দ্রকান্ত ওরফে চাঁদুবাবু খিকখিক করে হাসেন। বুঝলি জার্মান? কালী হারামির সঙ্গে গোলাপির একটা কিছু বেঁধেছে। গন্ধ পাচ্ছি। বাঁধুক। গোলাপি ফুরন নয়। ফুরনকে দেখিসনি তুই?

দেখেছি। জার্মান আনমনা হয়ে বলে। কষ্ট পেয়ে মরেছিল, তাও শুনেছি।

হুঁ, হোরে ওকে ধাবায় ভাড়া খাটাতো। চাঁদুবাবু মহাপুরুষের গলায় হরিনাথের পাপের বৃত্তান্ত শোনাতে থাকেন। শেষে শ্বাস ছেড়ে জ্ঞানীর গলায় বলেন, হোরেরও সেই দশা হবে রে, দেখে নিস। আগে কেলোর একটা ব্যবস্থা করতে দে, তারপর দেখবি।

জার্মান আস্তে বলে, কবে তাকে অ্যাদ্দিন···খালি আপনি—

চাঁদুবাবু থামিয়ে দেন। ধুস্ শালা! খালি এক কথা তোর···সবসময়। আগে-পরে ভাবিস না।

ভাবাভাবির কী আছে?

বডিগার্ডের চ্যালেঞ্জ শুনে বাবু ফের হাসেন। ওরে! মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। কালীর খুঁটির কথা ভাবিস না। খালি ওই কথা।

কালীর খুঁটির কথা মনে পড়ায় হঠাৎ-রুষ্ট বডিগার্ড চুপ করে যায়! ঠিকই বলেছেন বাবু। সে ভাবতে থাকে। বড়ো বড়ো খুঁটি ধরেছে কালী। থানার দারোগা-পুলিশও তার দিকে পা বাড়াতে ভয় পায়। এমন কি ওই খুঁটির কারণেই বাবুর দল থেকে তার প্রিয় বন্ধুরা একজন-দু'জন করে খসে কালীর পায়ের তলায় জড়ো হলো! কিন্তু জার্মান এক বাপের জন্মো। বাবু তাকে এইটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছেন। বাবু তাকে দয়া করে ঠাঁই না দিলে তাকে রিকশো চালিয়ে খেতে হতো। কারণ তার বাবা ছিল এক রিকশোওলা, তার চেয়ে বড়ো কথা, তারাপুরের মাঠে এক সন্ধ্যাবেলায় বাবুর ওপর হামলা ঠেকিয়েছিল জার্মান, দু'খানা বোম ঝাড়তেই আততায়ীরা নিপাত্তা হয়ে যায় এবং বাবু বাড়ি ফিরে কাঁদেন আর তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আজ থেকে তুই আমার মায়ের পেটের ভাইরে! দাদা ডাকবি। বাবু তখন মাতাল বটে, কান্নাটা ছিল ভয়ের। বাবু পৃথিবীর বিপজ্জনক বলতে শুধু একটি জিনিসই বোঝেন, তা হলো নিজের মরণ। জার্মান কিন্তু নিজের মরণকে ভয় পায় না। এজন্যই কালী, কালীর দল কেন,

এলাকার সমস্ত খুনে আর বোমবাজরাই জার্মানকে ভয় পায়, জার্মানের নিজের সিদ্ধান্ত এরকম।...

গোলাপি লাল রাস্তাটি পাখির পায়ে ডিঙিয়ে কেয়াঝাড়ের টাঁড়ের ঢালে উঠে আপন মনে হাসছিল। সে জানতো, চাঁদুবাবু টাকাগুলো রাখবেন। তার মাও এমনি করে বাবুর কাছে টাকা জমা রাখতো। মায়ের মরার পর বাবুই গোপনে তাকে ডেকে পাঠিয়ে চল্লিশটে টাকা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর মায়ের টাকা।

সেই থেকে চাঁদুবাবুকে সে মনে মনে শেষ আশ্রয় গণ্য করে। কালী তাকে নিজের বাবার হাত থেকে 'গার্ড' দিলেও দলের ছোঁড়াদের প্রতি বড্ড নরম। তাই বলে এমন নরম নয় যে, দলের কেউ গোলাপিকে ছুঁতে হাত বাড়ালে চুপ করে থাকবে বা বলবে, ছেড়ে দে! টাকাকড়ির বেলায় যেমন বলেছিল।

এটাই কালীর অপছন্দের একটা দিক গোলাপির কাছে। বাদ-বাকি সবই পছন্দ। কালী ইচ্ছে করলেই তাকে শুতে ডাকতে পারে, ডাকে না। একবার গোলাপি কয়েক ঢোক চোলাই গিলতে বাধ্য হয়েছিল কালীর জেদে। প্রথমে অপছন্দের ব্যাপার হলেও পরে খুব মজা পেয়েছিল এবং সিনেমার নাচন নাচার খুব ইচ্ছেও চাগিয়ে উঠেছিল। শেষে কিছু না পেয়ে চাঁদের আলোয় কালীকে হঠকারী উন্মাদনাবশে টানতে গিয়েই ধমক খেল। অ্যাই ছুঁড়ি। তোর নেশা হয়েছে। ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়্। এই বলে কড়া হুকুমের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলেছিল, তোকে কে লেবে? তাতে গোলাপি প্রথমে রেগে যায়। শেষে নেশা কমলে একলা ঘরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, লজ্জায় পরিতাপে। সকলের সামনে কী কেলেংকারি করে বসেছে। সত্যিই তো সে কালীকে প্রেম বিলোতে চায়নি। আর তোকে কে লেবে? দুঃখে মাথা ভাঙতে ইচ্ছে করে। কালী তার 'গাড'। কিন্তু কালী তার প্রেমিক নয় সেটা পরে জানলো। ফলে সেও কালীর প্রেমিকা নয়। যাকে অবশেষে প্রেমিক হিসেবে তার পছন্দ হলো সে কালীর ভয়ে কাছে ঘেঁষতে পারে না। কালী জানলে তাকে শিবতলা বাজার থেকে হয়তো ছুঁড়ে ফেলবে, এই তার ভয়। কারণ সে বোকার মতো ভাবে, কালী গোলাপিকে 'গাড' দেয় বলেই গোলাপি কালীর সঙ্গে শোয়। গোলাপি ঠারে-ঠোরে কতবার তার বিস্কুট পাউরুটির দোকানে বসে খাঁটি প্রেম বোঝাতে চেষ্টা করেছে, বুঝেছে প্রেম ষোলোআনা পাওয়ার চান্স আছে এখানে। কিন্তু ওই ভয়। বড্ড ভিতু

আর বোকা ওই হান্নাদা—হরেন।…

টাঁড়ের মাথায় যে-কয়েক ঘর বসতি, তার বাসিন্দারা কেউ কেউ রিকশো চালায়। কেউ কেউ ট্রাক-টেম্পোর মজুর। হরির চোলাই কারখানারও কর্মী-কর্মিনী আছে তাদের মধ্যে। ধাবার জিরেনখাওয়া ড্রাইভারদের খাদ্যদ্রব্য নারী শরীরও এই বসতি-জাত। বিকেল থেকে সেই শরীরগুলোর সাজগোজের ঘটা পড়ে যায়। বাঁকা চোখে তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে গিয়েই গোলাপি শোনে, নয়ানজুলির ওপারে মহাসড়কের ধারে একটা কান্নাকাটি হচ্ছে, যেখানে কালীর বাবার ধাবা। দিনের শেষ আলোয় থোক থোক ভিড়ও চোখে পড়ে। মানুষ চাপা পড়ল নাকি, এই ভেবে গোলাপি পা পাড়ায়। বাঁধ থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে সোয়াগিকে সবে উঠতে দেখে বলে, একসিডেং নাকি রে? হারামি ডাইভারগুলান দিনে তারা দেখছে। আমার অমন সোন্দর দুধের ছানাটা!

সোয়াগি, ফ্রকপরা বালিকা ফুঁপিয়ে উঠে বলে, কালীদার বাবা গো!

খুশিতে গোলাপি লাফ দিতে দিতে নামে বাঁধে। চাপা পড়েছে তো? বেশ হয়েছে। বেদের মরণ সাপের হাতে!

সোয়াগি ফোঁসফোঁস করে বলে, না গো গোলাপিদি! এমনি মরেছে। চ্যারে বসে ছিল। হঠাৎ পড়ে গেছে। ডাক্তার এসে বললে ইস্টোক।

গোলাপি থমকে দাঁড়ায়। ঠিক করতে পারে না, খুশি হবে না দুঃখিত হবে। বাবার ধাবায় কালী এবার বসবে, নাকি সত্যিই বসবে না, যেমন বলেছিল, 'ধাবা না ভাগাড়, শালা! ইচ্ছে করে, দিই বোম মেরে উড়িয়ে। আমার বাবাটা এক ঢ্যামনা!' ধাবায় যদি বসে, কালী কি বদলে যাবে? হরিনাথ হয়ে উঠবে? ধাবা চালাতে হলে তা তাকে হতেই হবে, যতই বড়ো বড়ো কথা মুখে ঝাড়ুক।

ধাবাকে বড়ো ভয় গোলাপির, সেই ফ্রকপরা বয়স থেকেই। মায়ের অনেকটাই মনে পড়ে যায়। এও মনে পড়ে, মা তাকে কীভাবে মুর্গিবাচ্চার মতো আগলে রাখতো। মরণকালেও বলেছিল, গোপগাঁয়ে পালিয়ে যাস। সেখানে তোর বাবা থাকে।

কিন্তু খানকি হয়েও স্বামীর নাম বলেনি, এমন ধর্মভয়! অথবা বলতে গিয়ে মরণ গলা চেপে ধরেছিল। অঁক আওয়াজ উঠেছিল, এবং খেঁচুনি, স্পষ্ট মনে পড়ে।

হিম, গম্ভীর গোলাপি ধাবায় যায়। সবে খাটিয়ায় উঠেছে হরিনাথ, পাশে টেম্পো তৈরি। টাঁড়ের খানকিরা চেরাগলায় সুর ধরে শোনার মতো একটা

কান্না কাঁদছে। খাটিয়ার ফুলের ভেতর হরিনাথের মুখ দেখে মনে হয়, মরেনি। ওই পাষাণ মুখ মরার পরও একই থেকে গেল। খাটিয়ায় কালীর দল কাঁধ লাগাতেই প্রথমে গোলাপির মনে হয়, এত ফুল এল কোত্থেকে এবং শেষে হরিধ্বনি, খানকিদের শোকের চূড়ান্ত চ্যাঁচানি, এসবের ধাক্কা খেয়েই গোলাপি চিক্কুর ছাড়লো, নিজের অবশে, ও বাবা—আ-আ! বাবা গো—ও-ও!

কিংবা ফুরনের আত্মা মেয়ের আত্মায় খুঁচিয়ে দিয়েছিল। খোঁচা খেয়ে একটা অনেকদিনের চাপা যন্ত্রণা শরৎকালের দিনশেষে বেরিয়ে গেল। গোলাপির কান্না আর থামতে চায় না। কেঁদে বড়ো সুখ এতদিনে।...

বাবা মরার ঘণ্টা তিনেক আগে কালী মনে খুব জোর দিয়ে কামনা করেছিল, বাবাটা মরে যাক। মরলেই যখের ধনের মালিক হবে এবং একটা শাদা মোটরগাড়ি কিনবে। চোখে সানগ্লাস, পাশে সেন্টমাখানো মেয়েছেলে। জাতীয় মহাসড়কে স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে দূর থেকে দূরে। পার্সের ভেতর অগুনতি নোট।

তিন ঘণ্টা পরে সত্যিই বাবা মরে অবাক করেছিল তাকে। আরো অবাক, যখের ধনটা নিছক মায়া। তিন মাইল দূরের গ্রামীণ ব্যাংকের একটা পাসবইতে হাজার দুয়েক টাকা, ধাবার ক্যাশবাকশোতে শ'দেড়েক, আর বস্তায় চাল ডাল আলু কুমড়ো এইসব। দু-তিনটে দিনেই কালী বুঝে ফেলে, একতালা দু-ঘরের বাড়িই হরিনাথের জীবনের সব কড়ির রূপান্তর। সংলগ্ন ধাবা ঘরটা দরমা বাতা, টালি, বাঁশের খুঁটি এসব জিনিসে তৈরি। কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ, খানকতক খাটিয়া। বস্তুত হোটেল, চোলাই ও মেয়েমানুষ পরিবেশনের কারণে প্রাচীন-যুগের সরাইখানাই বটে। কেউ বলে ধাবা, বেশি বলে 'ঠেক।' শেষে কালী ভাবছিল বেচে দেবে পছন্দসই কাউকে এবং চাঁদুবাবুর মতো ট্যাকসো আদায় করবে মাঝে-মাঝে।

কিন্তু চারদিনের দিন সকালবেলায় কানে এল, চা-সন্দেশের দোকানের যশোদা হোটেল খুলবে, তার মানেই 'ঠেক', এবং কালী ঠাণ্ডা মাথায় বাবার ধাবায় বসে হুকুম পাঠালো যশোদার কাছে, যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। পা বাড়ালে ঝাড় খাবে। যশোদা জিভ কেটে বলেছিল, ই কী কথা, ই কী কথা? যা আছে, তাই নিয়েই ঝামেলা, ওসব উড়ো কথা কারা রটাচ্ছে বলো-দিকিনি?

টাঁড়ের খানকিরা খুশি হয়েছিল। তাদের ধারণা, পাষাণ হোরেবাবুর চাইতে কেলো ছোঁড়াটা কম বুঝদার, তাছাড়া জ্যান্ত মানুষ। আর অমন কাঠখোদাই চেহারার সৌন্দর্য, ভিড়ের ভেতর চোখে পড়ার যোগ্য. বুকে পেলে নারীজীবন বর্তে যেত। কিন্তু পোড়াকপাল, নারীজীবন বলতে যেসব ভালো জিনিস বোঝায়, তাদের মধ্যে আর ছিটেফোঁটাও নেই। পাষাণ যখটাকে, নাকি নিজের পেটটাকে শাপমন্ত্রি করবে, ঠিক করা কঠিন। টাঁড়ের কঠিন গুল্ম-কণ্টকিত বুকে দূর দুর থেকে কত নারীজীবন এসেছে, ছিবড়ে হয়ে নেতিয়ে পঞ্চভূতে মিশে গেছে, জাতীয় মহাসড়কের এমন টান, টাঁড় থেকে ছিটকে এসে পড়তেই হবে। এ সড়ক এক অজগর সাপ।

আর কালীও দিনে দিনে বুঝতে পারছিল, বউ ছেড়ে চব্বিশঘণ্টা রাস্তায় চলা জীবন যাদের, তাদের এই ঠেক দরকার, তার চেয়ে আরো দরকার মেয়ে-মানুষ। তবেই মাথা ঠাণ্ডা থাকবে, স্টিয়ারিং ধরা হাত বেগড়বাঁই করবে না। এভাবে ক্রমে ক্রমে কালীর আত্মায় আসলে হরির আত্মা ঢুকে পড়ছিল, এক-পা দু-পা তিন-পা করে, চতুর প্রাণীর পায়ে। অথবা যেভাবে সাপ ঢোকে। ফলে কালীর ক্রমশ চোখে পড়ছিল, তার বাবা পুরোদস্তুর একটা বড়ো সংসার গড়ে তুলেছিল, একটা পরিবার বলা চলে। এই বড়ো জিনিসটার মালিক এখন সে, কালীনাথ। শিগগির তাকে বাবু ডাক শুরু হয়ে যাবে, ঠিক তার বাবারই মতো। কালী সবদিক সমঝে চলছিল। বিশু, কেতো, লোটন, কানু, গ্যাদা এইসব নামের পৌনে পাঁচ ফুট থেকে ছ' ফুট উচ্চতার বিপজ্জনক দ্বিপদ প্রাণীগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিবতলা বাজারে ঘুরতো, এখন ধাবায় কেন্দ্রীভূত। কালী এতদিনে মাটি পেয়েছে অথবা নিয়েছে যখন, তখনো তাদেরও এটা মাটি পাওয়ার ঘটনা। হরির রেখে যাওয়া ধাবা দেখতে দেখতে একটা জমকালো চেহারা পেয়ে যায়। জেল্লা বাড়তে থাকে দিনে দিনে। এবার কালীর ইচ্ছে, নিজেই একটা গ্যারেজ গড়বে।

গোলাপি প্রথম প্রথম ভাবতো, ঢঙ। কালী তার এত চেনা, হরিতে কালীর রূপান্তর কল্পনায় ছিল না। দু' সপ্তা'র মধ্যে গোলাপির চোখে ব্যাপারটা খাঁটি দেখায়। একতিল মেকি নয়, এ কালী সত্যিই হরি। গোলাপি তারপর ভড়কে যায়। সতর্ক হতে থাকে, এই বুঝি কখন ধাবা থেকে রাতের ডাক আসবে!

বিস্কুটওলা হরেনের কাছে ভয়ের কথাটা, ঠারে-ঠোরে প্রেমের কথা তোলার পুরনো ভঙ্গিতেই একদিন তোলে গোলাপি। বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিল আসলে। ও হরেদা, বড্ড ভয় লাগে! এই বলে সূত্রপাত হয় কথাটার।

হরেন মিটিমিটি হেসে বলে, ক্যানে ? তুমার ভয় কিসের অ্যাদ্দিনে ? কালী তো তুমার গাড।

কালী বাবার টাটে বসল।

বাবার টাটে ছেলে বসবে না তো কি তুমি বসবে ? হরেন খুবই হাসে।

গোলাপি রাগ করে বলে, হেসো না তো ! ইদিকে আমার যা হবার হচ্ছে।

হচ্ছেটা কী শুনি, বলো।

গোলাপি আস্তে বলে, কালীর বাবা আমার মাকে খানকি করেছিল। আমি খানকি হবো, বলো তুমি ?

ও। এই কথা ? হরেন গুম হয়ে যায়। একটু পরে কেমন হাসে সে। বলে, টাকাগুলান কী কল্লে ? অতগুলান টাকা ! কালী শালারা কেড়ে না নিয়ে থাকলে —সে হঠাৎ চুপ করে !

টাকার খবর ক্যানে ? গোলাপি খুব অবাক হয়েছিল।

গম্ভীর হরেন বলে, ছাগলটা বেচেবুচে দাও। আরো অনেক টাকা হবে।

তা'পরে ?

টাউনে-ফাউনে চলে যাও। হরেন তেতো মুখে পরামর্শ দেয়। ই শালা শিবতলায় মানুষ থাকে ? আমারই মাঝে মাঝে মনে হয় কী পালিয়ে বাঁচি। কিন্তু সাধ্যি নাই। বাবা-মা, নাবালক ভাইগুলান, উদিকে তুমার বোনটার বিয়ে দিলাম তো জ্বালাপোড়া খেয়ে ফেরত এল।

হরেন খুব অন্তরঙ্গ হয়েছিল এই সাতসকালে। সবে হেমন্তের হলদে আভা লেগেছে চারপাশে। হাওয়ার গরম ঝাঁঝটা নেই। বরং মধুর হিম। মানুষজনও এসময় কম। বাজারের শেষমুড়োয় তার এই ঘুপচি দোকান, বিশ-তিরিশ টাকাও পুঁজি নয়। পেছন দিকটায় মাটির ঘর, খড়ের চালের ফুটো ঢেকে রিলিফের তেরপল চাপানো। এই উঁচু তল্লাটে বানবন্যা হয় না, তবু রিলিফের জিনিসপত্র কীভাবে এসে পৌঁছয়। ধাপবন্দি ধানখেতের পর দূরে নাবাল মাটিতে অথৈ জল এখনও, সেটাই কারণ হতে পারে এই সরকারি করুণার। তাছাড়া পার্টির বাবুরা আছেন। শিবতলা গ্রামেই এম এল এ বাবুর পৈতৃক ভিটে।

সব শুনে আস্তে করে শ্বাস ছাড়ে গোলাপি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে বলে, আচ্ছা হন্নাদা ! গোপীনাথপুর কোথা গো, চেনো ?

গোপীনাথপুর ? হরেন ভেবেচিন্তে বলে, ক্যানে ? এক গোপীনাথপুর শুনেছি সেই নলহাটির কাছে। আরেকটা হলো তুমার ঢিপেডাঙ্গা-গোপীনাথপুর। সেও

অনেক দূর। গোলাপি চলে যাচ্ছে দেখে সে বলে, ক্যানে উ কথা?

গোলাপি বলে, এমনি।

আনমনা, শেষে হঠকারিতায় কালীর ধাবার দিকে যায় সে। অজমুড়োয় ধাবা। পুরনো সড়কের ধনুক-বাঁকা অংশটা এখন পোড়ো। সড়ক সোজা হয়েছে যেখানে, তার লাগোয়া ধাবা। পোড়ো সড়কে তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কলকব্জা বিগড়ে গেলে ওখানেই রতনবাবুর গ্যারেজের লোকেরা সারাতে আসে। ওখানেই খানকিদের পাতে পরিবেশন করতো হরিনাথ। তাকাতে ঘেন্না করে গোলাপির। কালীও তাই করে চলেছে। ভাবতে গিয়ে কষ্ট হয়, সেই কালী!

ধাবার পেছনে সড়ক আইন বাঁচিয়ে হরিনাথের ঝকমকে একতলা বাড়ি নয়ানজুলিতে, সরু বাঁধ এখানেও। টাঁড়ে যাওয়ার বাঁধ আর এই বাঁধের মাঝখানের জলাটা সড়ক দফতরের ইজারা দেওয়া ফিশারিজ কো-অপারেটিভের অনেকগুলো জলার একটুকরো। এই টুকরোর উৎপাদন অনেকটাই হরির ধাবায় যেত, কালীর দলের প্রতি সেলামিস্বরূপ। বাঁধ পেরিয়ে যেতে যেতে গোলাপি আনমনে ভাবছিল, কালীর ধাবায় এবার মাছগুলো পুরোটাই যাচ্ছে কি না। হেমন্তের শুরুতে এই সদ্য সকালে চৌকো জলটা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে মনে হয়। পাকা ঘাট বানিয়ে গেছে হরি। ধাপে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল কালীনাথ, পরনে ডোরাকাটা পাজামা আর গেঞ্জি। একদলা ফেনা মুখ থেকে ফেলে ভুরু কুঁচকে বলে, কী রে? খুব সতী-সাবিত্তিরি হয়েছিস। দেখা দিস না।

গোলাপি নরম হাসে। তুমি এখন বাবু হয়েছ, তোমাকেই দেখতে পাই না।

কালী ঘাটের জলে মুখ ধোয়। তারপর ভিজে মুখে বলে, কদিন থেকে তোর কথা ভাবছিলাম।

সে বাড়ি ঢুকছিল। গোলাপি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ধক করে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। যেচে পড়ে বাঘের গুহায় ঢুকতে এল! তাকে দাঁড়াতে দেখে কালী বলে, আয় কথা আছে।

গোলাপি কাঁপতে কাঁপতে বাড়িটাতে ঢোকে। চৌকাঠে একটু ঠোক্করও লাগে পায়ে। রবার স্লিপারের একটা ফিতে ছিঁড়ে যায় এত সহজেই। উঠোনে গিয়ে স্লিপার দুটো খুলে হাতে নেয় সে। বারান্দায় কালী তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলে, টাকাগুলান কী করলি?

সেই হরেনের মতোই কথা! টাকার খবর। গোলাপি আলগোছে নিচের ঠোঁট কামড়ে বলে, তুমার কি টাকার অভাব? ভারি তো পাঁচখানা নোট। পেট

নাই, পরনে কিছু দোব না—হুঁঃ! সাধ-আহ্লাদও থাকতে নাই মানুষের! যেখানে যাই, খালি এক কথা, টাকাগুলান কী কল্লি···টাকাগুলান কী কল্লি!

কালী একটু হাসে। শাড়ি কিনেছিস দেখছি। চেহারা খুলে গেছে, মাইরি! বলে গম্ভীর হয় হঠাৎ। আমার ধাবায় লক্ষীশালা পান-সিগারেট বেচতো। ঘেঁটি ধরে তাড়িয়ে দিয়েছি, জানিস?

গোলাপি লক্ষ্য করেনি। অবাক হওয়ার ভান করে বলে, ক্যানে?

শালা চাঁদুবাবুর লোক ছিল। কালী চুল আঁচড়ায় চিরুনি দিয়ে। আমার বাবাটাকে তো জানিস, সাপ চিনতো না, বিষেল না ঢোঁড়া। তুই ধাবায় পান-সিগারেটের দোকান দে। বেশি পুঁজি লাগে না। কত আছে হাতে?

গোলাপি ঢোক গিলে শুকনো গলায় বলে, ব্যাংকের লোণে ছাগল কিনেছি। শোধ দিতে হলো না?

লোনটা পাইয়ে দিয়েছিল কালীই। তবে পার্টির বাবুরা বলেছিলেন, শোধের জন্য ভাববার কিছু নেই। কালীও তাই ভেবে রেখেছিল। এমন কথা শুনে সে চটে যায়। বলে, আমাকে না জানিয়ে শোধ দিতে গেলি? তোকে মাইরি··· মেয়েছেলে না হলে···দাঁড়া! খবর নিচ্ছি, লোন শুধেছিস না কী করেছিস।

সে ঘরে ঢুকে প্যান্ট পরতে থাকে। গোলাপি উঠোনে শক্ত কাঠের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাবায় পান-সিগারেটের দোকানের প্রস্তাবটা সে মনে মনে বাজিয়ে দেখছিল। বিপজ্জনক দিকটাও চোখে পড়ছিল। সেজেগুজে ঘর থেকে বেরিয়ে কালী দরজায় তালা আঁটে। তখন গোলাপি বাঁকা হেসে বলে, তুমি এখন ধাবার মালিক হয়েছ। গরজ তুমারই। তুমি পুঁজি দাও।

কালীও হাসে। তবে বাঁকা নয়, সিধে। বলে, ব্যাংকের লোন শুধেছিস। এখন ছাগল তোর। আবার একখানা অ্যাকসিডেন করে দে। তেমন গাড়ি হলে হাজার পেয়ে যাবি।

ওরে আমার! ছটফটিয়ে ওঠে গোলাপি। জন্মের পর একটা ছানা মরেহেজে গিয়ে ওই একটা ছিল। এখন মা-ছাগলটার জন্য তার মনে মমতার সাগর। বলে, বলেছ ভালো! নিজের পালা জিনিস হলে কষ্টটা বুঝতে।

কালী থাপ্পড় তোলে। চালাকি? পালা জিনিস, খুব কষ্ট হয়, না? ই কালীর চোখ সব দিকে জানিস?

গোলাপি মুখ নামিয়ে আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়ায়।

কালী বলে, বাবা মরার দিন চাঁদুশালার বাড়ি গিয়েছিলি।

গোলাপি তাকায়। বুকের ভেতর ধড়াস করে শব্দ। এমনি করে একটার পর একটা থাপ্পড় খেতে যেচে এল, কী বোকামি !

তোর পায়ে সুরকির রঙ দেখেছিলাম। কালী গলার ভেতর বলে। আমার বাবাটা ছিল গাধা। তোর মায়ের পায়ে সুরকির রঙ লেগে থাকতো। আমি দেখেছি। মায়ের লাইন ধরেছিস।

গোলাপি ফুঁপিয়ে ওঠে। একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কালীর মুখটা দেখে ভয়ে থেমে যায়।

কালী পা বাড়িয়ে বলে, টাঁড়ে ক্যানে, ই শিবতলা বাজারে থাকতে হলে কালীর অডার মানতে হবে। তুই আমার ধাবায় পান-সিগারেটের দোকান দিবি। তোর পানিশমেং। তারপরও যদি পায়ে সুরকির রঙ দেখি—

গোলাপি হাহাকারের মতো বলে, তুমার ধাবা। তুমি করে দাও দোকান।

তোর পানিশমেং। আঙুল তোলে কালী। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। সদর-দরজায় তালা আঁটার সময় গোলাপি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ানো, ভেতরে কান্নার চাপ। বাঁধে গিয়ে কালী ফের বলে, পানিশমেং। ছাগলটার অ্যাকসিডেং কর। দোকানের পুঁজি পাইয়ে দেবো।

গোলাপি ডুকরে কাঁদে এবার। তার পরে বলবে খানকি হ।

কালী ঘুরে তার আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে-শরীর জরিপ করার ভঙ্গিতে দেখে নিয়ে হঠাৎ হাসে। তোকে কে লেবে ? বলেই চলে যায় ধাবার দিকে। সেই পুরনো কথা, 'তোকে কে লেবে ?' গোলাপি কাঁদতে থাকে।...

এবারকার গাড়িটার রঙ ছিল লাল টুকটুকে। এদিন শিবতলা বাজারে হাটবারও ছিল। কালীর দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। মেহগিনিতলায় গোলাপি, তার কালো ছাগলটা হাঁটুর পাশে মুখ তুলে পাতা খাচ্ছে, গোলাপির হাতে পাতাভরা একটা ছোট্ট ডাল। বাম্পের আগেই ব্রেককষার তীক্ষ্ণ শব্দ। ফলে তৈরি দলটা হই হই করে তেড়ে এল। পাবলিক প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরে চ্যাচাতে চ্যাচাতে দৌড়ে এল। কালীর দল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত জিনিসটা মানুষ। একটা মেয়েমানুষ। ফুরনের মেয়ে গোলাপিবালা।

ছাগলটা মেহগিনি ছায়ায় আপনমনে পাতা চিবুচ্ছে। লাল টুকটুকে মোটরগাড়ি বুড়োবুড়ি যুবতী কাচ্চাবাচ্চা সমেত একটা পরিবারে ঠাসা, ড্রাইভারকে টেনে নামিয়ে প্যাঁদানো চলত ; কিন্তু জাতীয় সড়কে ছাগল পড়ার

বদলে গোলাপি পড়াটা কালীর দলকে ধাঁধায় ফেলেছিল। এছাড়া গাড়ির ভেতরে ভয়ার্ত স্ত্রীলোক আর শিশুর কান্না। পাবলিক চেঁচিয়ে উঠেছিল, মার! মার! জ্বালিয়ে দে! কালীর দলের বিশু দু-হাত তুলে গর্জায়, চোপ শালারা! চো-ও-প! সে বুঝতে পেরেছিল, অ্যাকসিডেং নয়।

কালীর কাছে খবর গেলে সে ফোঁস করে শুধু একটি শ্বাস ছাড়ে। আজকাল তার মুখে হরির পাষাণ মুখের ছাপ, এবং সেই রাত্রে ধাবায় ড্রাইভারদের পাতে যে মাংস পরিবেশিত হয়, তা বস্তুত একটি ছাগলের। গোলাপি মহকুমা শহরের মর্গে তখনো শুয়ে আছে, সেলাইকরা মাংস। এতদিনে প্রকৃতই বেওয়ারিশ। কারণ কালী আর তার গার্ড নয়। কে তোকে লেবে, গোলাপি?…

সাপ বিষয়ে একটি উপাখ্যান

সাপটিকে আমি প্রথম দেখি লালীর জন্মদিনে। রঙচঙে চিত্রিত এক সুন্দর বিভীষিকা, কারণ সাপটি ছিল নিস্পন্দ, কয়েক মিনিটের জন্য যেন লালী আর আমার মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল হয়ে উঠেছিল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। জিভ ব্লটিং পেপারের মতো লালীর জন্য ক্ষরিত সমস্ত গ্রন্থিরস শুষে নিয়েছিল। লালীর জন্মদিনে একগোছা রজনীগন্ধাই শ্রেষ্ঠ উপহার ভেবে সেই শরৎকালের ভোরবেলায় যখন আমি বাগানের দিকে হেঁটে যাই, এখনো মনে আছে, সারারাতের শিশিরের মতো আমিও প্রচুর সিক্ত ও কোমল ছিলাম। অথচ রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর সাপটিকে দেখামাত্র টের পেলাম কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। তাই আমি নিমেষে শুকনো বিবর্ণ টেপাকোটার মতো সময়ের দেয়ালে সেঁটে গিয়েছিলাম।

একটু পরে লালীর বাবা দয়াময় দোতলার ছাদ থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করেন, আমি এভাবে দাঁড়িয়ে কী করছি। দয়াময় ছিলেন বড়ো কুটিলমনা আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মানুষ। তাঁর প্রশ্নের জবাবে আমি ভাঙা গলায় বলি, সাপ। তখন দয়াময় ছাদ থেকে অদৃশ্য হন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের বাগানে এসে ঢোকেন। তাঁর হাতে বন্দুক ছিল। কিন্তু তাঁকে একটুও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল না। খুব শান্ত গলায় তিনি সাপটিকে দেখিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যেটুকু সময় লেগেছিল, সাপটির লুকিয়ে পড়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট এবং আর তন্নতন্ন খুঁজে তাকে আমরা দেখতে পাইনি। তখন দয়াময় বাগানের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলেন, বাগানটা একেবারে জঙ্গল করে ফেলেছ তোমরা।

আসলে গ্রামের প্রান্তে পুরনো একটা নালার ধারে এই বাগানটা করেন আমার ঠাকুর্দা। কিছু ফলের গাছের সঙ্গে ফুলের গাছও পুঁতেছিলেন তিনি। আমার বাবা ছিলেন ভ্যালাভোলা মানুষ। প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন এক শহুরে কেরানি। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর মা কোনো কারণে প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরান।

তাঁকে যখন-তখন এই বাগানের ভেতর দেখতে পেতাম। শীতের সময় নিজের হাতে ঝাঁটা ধরে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরাতেন। আগাছা ওপড়াতেন। টিনের ঝারিতে প্রতি বিকেলে জল ঝরাতেন ফুলফলের গাছপালার মূলে এবং গাছটি তাঁর তুলনায় নিচু হলে তার সর্বাঙ্গ ধুইয়ে দিতেন। তাঁর চোখে বাৎসল্যের উজ্জ্বলতা ঝলমল করতে দেখেছি।

আর দয়াময়কে দেখতাম দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বাগান-পরিচারিকা আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। স্কুল থেকে ফিরে প্রতি বিকেলেই জানতাম মাকে কোথায় দেখতে পাব। বাবা সাইকেলে চেপে শহরের আপিসে যেতেন। তাঁর ফিরে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। কোনো কোনো মধ্যরাতে পাশের ঘর থেকে মায়ের চ্যাঁচামেচি শুনতে পেতাম। তারপর আমার ন্যালাভোলা, শান্ত ও মৃদুভাষী বাবাকে এক বসন্তকালের ভোরবেলায় এই বাগানের ঈশানকোণের আমগাছের উঁচু ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। সেই প্রথম বাবাকে আমি উলঙ্গ দেখি। আমার বয়স তখন সাত বছর।···

দয়াময়ের মেয়ে লালী ছিল আমার সহপাঠিনী। লালী চুপিচুপি আমাকে বলেছিল, জানিস বীরু, কেন পানুকাকা গলায় দড়ি দিয়েছেন? আমার বাবার সঙ্গে তোর মায়ের ভাব ছিল।

ওই বয়সে 'ভাব' ব্যাপারটা আমার বোধগম্য ছিল না। অথচ পরে বুঝেছিলাম মেয়েরা কত আগে জীবনের অনেক গূঢ় জিনিস টের পেয়ে যায়। আর লালীই একদিন মুক্তকেশীর ভাঙা মন্দিরতলায় কল্কেফুলের জঙ্গলে কল্কেফুল তুলে কীভাবে মধু চোষা যায় শেখানোর সময় হঠাৎ মুখ টিপে হেসে বলেছিল, বীরু, আমিও তোর সঙ্গে ভাব করব—রাজি?

কিছু না বুঝেও বলেছিলাম, রাজি।

তারপর কত দিনভর রাতভর ভেবেছি, ভাব কী জিনিস জেনে নিতে হবে লালীর কাছে। অথচ বাবার ন্যালাভোলা ধাতটি আমার মধ্যে এমনই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, জিগ্যেস করতে সাহস পেতাম না। লালী ছিল তেজি ছটফটে মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে স্কুলের ময়দানে খেলাধুলো করতো। ছেলেদের মধ্যে মাতব্বরি করতো। সংস্কৃত পণ্ডিত মশাইয়ের ঘুমন্ত হাঁ-করা মুখে সে একটুকরো চক ফেলে দেওয়ায় ক্লাসসুদ্ধ বেতের ঘা খাওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম করে দেয়নি। তার বাবা দয়াময় স্কুলের সেক্রেটারী, সেজন্যও নয়। আসলে লালীকেই যেন সবাই ভয় পেত।

তো এই লালীর জন্মদিনে ফুল উপহার দেওয়ার কথা কেন আমার মাথায় এসেছিল, জানি না। আমি তখন রীতিমতো যুবক। মেয়েদের জন্য কামনা-বাসনা অথবা ভালবাসার বোধে জরো জরো। যে আবেগে পাখিরা বাসা গড়ার জন্য খড়কুটো কুড়িয়ে বেড়ায়, সেইরকম জীব-জাগতিক আবেগ আমাকে সবসময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পাঁড়াগাঁয়ে প্রচলিত 'ভাব' শব্দটি কী, ততদিনে আমার ওতপ্রোত জানা হয়ে গেছে। অথচ তখনো সাহস পাই না যে লালীকে স্মরণ করিয়ে দিই মুক্তকেশীর মন্দিরতলার সেই বিস্ময়কর মুহূর্তটিকে।

লালীর চেহারায় রুক্ষতাময় লাবণ্য ছিল। যত বয়স বাড়ছিল, তত তার লাবণ্যকে ক্ষইয়ে দিচ্ছিল সেই উগ্র রুক্ষতা। তাই কি তার বিয়ে হচ্ছিল না? বুঝি না। পাড়াগাঁয়ে জন্মদিন পালনের ব্যাপারটা মোটেও ছিল না। আসলে আমাদের গ্রামের একটি প্রান্ত ঘেঁষে হাইওয়ে এবং বিদ্যুৎ আসার পর এই ব্যাপারটা শহর থেকে আরো সব আধুনিক পণ্যের সঙ্গে চলে আসে। শুনেছিলাম লালীর জন্মদিনে অনেক সরকারি কর্তাব্যক্তি সস্ত্রীক আসবেন। আসবে লালীর কলেজের মেয়ে ও পুরুষ বন্ধুরা। আর তার আগের দিন সন্ধ্যায় লালী এসে আমাকে নেমন্তন্ন করে যায়। বাড়িতে আমি একা ছিলাম। মা গিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ দাদাকে দেখতে। সেই সন্ধ্যায় লালীকে জনহীন বাড়িতে একা পেয়ে আমি কি কিছু করতে পারতাম! অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, লালীর রুক্ষ চেহারায় ঠিকরে পড়ছিল কী এক দুর্দান্ত চঞ্চলতা, যার সামনে হয়তো পৃথিবীর সেরা সাহসী যুবকেরাও নেতিয়ে যেত ভিজে বেড়ালের মতো।

সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি লালীর জন্মদিনে কী উপহার দেব ভেবে। ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে যেই মনে পড়েছিল আজ লালীর জন্মদিন, অমনি মনে হয়েছিল, আরে তাই তো! ফুলের চেয়ে সুন্দর উপহার আর কী থাকতে পারে তার জন্য, যে আমার সঙ্গে প্রথম কৈশোরে 'ভাব' করতে চেয়েছিল?

কিন্তু রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর ওই চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকা আমাকে ও লালীকে নিমেষে দুদিকে বিশাল দূরত্বে সরিয়ে দেয়। আমি লালীর জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাইনি। লালীও কৈফিয়ত চাইতে আসেনি। আর বাবার আত্ম-হত্যার পর মা কে জানে কেন প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত উল্টোদিকে সরে এসেছিলেন। বাগানটি সত্যিই জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। মা ফিরে এলে তাঁকে সাপের কথা বলায় গম্ভীর মুখে এবং আস্তে বলেন, এ বাড়িতে একটা বাস্তুসাপ আছে।...

সাপটিকে দ্বিতীয়বার দেখি, নালার ধারে জরাজীর্ণ পাঁচিলের কাছে। আর একটু হলেই তার ওপর পা ফেলতাম। পা ফেলতে গিয়ে কেন জানি না কোথায় পা ফেলছি দেখতে গিয়েই তাকে আবিষ্কার করি। পাঁচিল থেকে ভেঙে পড়া ছোট্ট ইটের স্তূপে কিছু বুনো কচুর ঝোপ গজিয়েছিল। সাপটি তার ওপর খুব আস্তে ওঠার চেষ্টা করছিল। সেবারও আমি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে পড়ি এবং সাপটিকে ইটের স্তূপের ভেতর ঢুকে যেতে দেখি। মা মৃত্যুর আগে বহুবার বলে গিয়েছিলেন, বাস্তুসাপ মারতে নেই। বাস্তুসাপ কখনো বাড়ির লোককে দংশায় না।

তারপর কোনো কোনো রাতে সাপটিকে আমি স্বপ্নে দেখতে পেতাম। তার চিত্রবিচিত্র শরীর, জলজ্বল নীল দুটি চোখ, চেরা লকলকে জিভ অবিকল দেখতে পেতাম। আমি তাকে পার হবার জন্য পাখির মতো উড়ে যেতাম। একরাতে দেখলাম, তাকে পেরিয়ে উড়ে যেতে যেতে যেখানেই নামবার চেষ্টা করি, সেখানেই মাটির ওপর তাকে দেখতে পাই। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠি। ঘুম ভেঙে যায়। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ এবং আলো জেলে কুঁজোর দিকে পা বাড়াতে সাহস পাই না। তন্নতন্ন খুঁজি, সাপটা কোথাও আছে কি না। কোনো কোনো রাতে হঠাৎ মনে হয়, সাপটা আমার পাশে এসে শুয়েছে। কোনো রাতে সবে তন্দ্রার ঘোর এসেছে, মনে হয় সাপটি আমার বুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ফণা তুলে উজ্জ্বল নীল চোখে আমাকে দেখছে।

সাপটির কথা লালীকে বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু বলতে পারিনি তার বিদ্রূপের ভয়ে। লালী ছিল বড্ড ঠোঁটকাটা মেয়ে। এমনিতে সে সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলতো। তার বাঁকা হাসিটি ছিল ব্লেডের চেয়ে ধারালো। প্রতিবেশীরা বলতো, অমন পুরুষালি ঢঙ আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা—কে বিয়ে করবে অমন মেয়েকে? দয়াসিঙ্গি সোনা দিয়ে মুড়েও গছাতে পারবে না কাউকে।

একদিন সকালে হাসিমুখে দয়াময় এলেন আমার কাছে।···বীরু, কী করছ-টরছ বলো শুনি?

তাঁকে খাতির দেখিয়ে বসিয়ে বললাম, কিছু না জ্যাঠামশাই।

কিচ্ছু না? অবাক হবার ভঙ্গি করলেন দয়াময়। তাহলে চলছে কী করে তোমার?

কয়েকটা টিউশনি করছি। ওতেই চলে যাচ্ছে।

শুনে একটু গুম হয়ে থাকার পর দয়াময় বললেন, তুমি আমাদের স্কুলে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো। একজন সায়েন্স টিচার দরকার।

কিন্তু আমি তো আর্টস গ্র্যাজুয়েট।

তাতে কী? দয়াময় একটু হাসলেন। সে আমি দেখব'খন। তুমি আজই অ্যাপ্লিকেশন লিখে হেডমাস্টারমশাইকে দিয়ে এস।...

দয়াময়ের কথামতো দরখাস্ত দিয়ে এলাম। হেডমাস্টারমশাই কেমন মুখ করে দরখাস্তটা হাতে নিয়ে শুধু বললেন, ঠিক আছে।

দিনকতক পরে দুপুরবেলায় হন্তদন্ত হয়ে লালী এল। তার চেহারায় খুনীর আদল। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সে বলল, বীরু, তোকে একটা কথা বলতে এলাম।

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কী রে?

লালী ক্রুদ্ধস্বরে বলল, তোর বড্ড বাড় হয়েছে। তোকে আমি ভালো ছেলে বলে জানতাম। তোর পেটে পেটে এত—

হঠাৎ সে থেমে গিয়ে রাক্ষসীর মতো কটমটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ভয়-পাওয়া গলায় বললাম, কী ব্যাপার খুলে বল্ না লালী। আমি তো কিছু জানি না।

জানো না! নেক্! লালী ভেংচি কাটল। তোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

লালী, কী হয়েছে?

লালী হিসহিস করে বলল, এ লালী তোর জন্য জন্মায়নি জেনে রাখিস। ইশ! আমি যেন গাছের ফলটি—হাত বাড়িয়ে টুপ করে পেড়ে নিবি।

বলেই সে তেমনি জোরে বেরিয়ে গেল। আমি ভ্যাবলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। পরে মনে হলো, ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পারছি। দয়াময় কি তাহলে লালীর সঙ্গে আমার—

বাস্তুসাপটাকে আমি তৃতীয়বার দেখি বন্যার বছর এবং সেবারই সাপটির সঙ্গে আমার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সেবারকার মতো ভয়ঙ্কর বন্যা কখনো আমরা দেখিনি। তিনদিন তিনরাত একটানা বৃষ্টিতে আমাদের বাগানের পেছনের খালটি এমনিতেই কানায় কানায়

উপচে পড়ছিল। চতুর্থ রাতে ডুমডুম ঢোলের বাজনায় আর কোলাহলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সুইচ টিপে দেখি আলো জ্বলল না। বাইরে এ রাতে ঝোড়ো হাওয়ার শনশন শব্দের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ মিশে একটি প্রাকৃতিক অস্থিরতার শব্দচিত্র আঁকা হচ্ছিল। আর তার সঙ্গে অন্ধকারের রঙ, বজ্রবিদ্যুতের রঙ, মানুষের আর্তি, ঢোলের ঘোষণার সঙ্গে পঞ্চায়েতি খবর জড়িয়ে-মড়িয়ে শব্দ-বর্ণময় দুর্বোধ্য একটি চিত্রকলা—যা মানুষ ও প্রকৃতি যথেচ্ছ ভাবে এঁকে যাচ্ছিল, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

কিছু পরে বিদ্যুতের আলোয় কয়েকটি পলকের জন্য উঠোনের জল দেখতে পাই। তখনই আমার টর্চের কথা মনে পড়ে। ঘরে ঢুকে বালিশের পাশ থেকে টর্চটি তুলে নিই। বারান্দায় বেরিয়ে টর্চটি জ্বালি এবং আমার পা থেকে কয়েক হাত দূরে সেই চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকাকে আবিষ্কার করি।

আলোর মধ্যে ধরা পড়ে সাপটির আঁকাবাঁকা ছন্দময় গতি রুদ্ধ হয়। দ্রুত সে মাথা তোলে। তার ফণা দুলতে থাকে। চেরা লকলকে জিভ আর দুটি নীল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে আলোর আড়ালে সম্ভবত আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করছিল।

এবার তার সঙ্গে আমার এক বিপজ্জনক লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। টর্চ নিভিয়ে ফেলি। আবার জ্বালি। মধ্যেকার কয়েকটি সেকেণ্ড সে ফণা গুটিয়ে আবার এঁকেবেঁকে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু যেই টর্চ জ্বালি, সে হিসহিস শব্দ করে ফণা তোলে ও থমকে যায়।

কতক্ষণ এই খেলা চলছিল বলা কঠিন, শেষবার টর্চের ক্ষয়াটে আলোয় তাকে বারান্দার কোনায় জমিয়ে রাখা আসবাবপুঞ্জের ভেতর ঢুকে যেতে দেখেছিলাম। যে ঘরটাতে আমি শুই, তার দরজা থেকে দূরত্বটা ছিল হাত দশেকের মতো। কাজেই ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে এবং সাপটার এ ঘরে ঢোকার মতো ফাঁক বা ফাটল আছে কি না সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে যখন আমি শুয়ে পড়লাম, তখন আমার শরীর পাথরের চেয়ে ভারি আর নির্জীব। আমার স্নায়ুকোষগুলি নিষ্ক্রিয়। নেপথ্যের প্রাকৃতিক ও মানবিক যাবতীয় শব্দচিত্র নিতান্তই প্রাতিভাসিক হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায় আছি, কিংবা জীবিত না মৃত, নাকি এতদিনকার দেখা ঘুমের অন্তর্বর্তী সমস্ত স্বপ্ন একত্রিত হয়ে আমাকে অবচেতনায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিভাসময়, প্রায় জড় আমার অস্তিত্বের ভেতর সারাক্ষণ ফণা তুলে হিসহিস করছিল ওই সুন্দর বিভীষিকা—তার কুণ্ডলীপাকানো শরীর আমার বুকের

ভেতরটা ঠাণ্ডা হিম করে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির গভীর এক সন্ধিস্থলে, যেখানে জড ও প্রাণের সীমান্তরেখা, সেই জীবন্মৃত্যুময় রেখাটির ওপর আমি শুয়ে আছি।

শেষরাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ ডাকছিল। তিনি দয়াময়। দরজা খুলতেই একরাশ জল ঢুকে পড়ল ঘরে। পায়ে সাড়া ছিল না বলেই দরজার নিচের সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়া জলে ঘরের মেঝের সিক্ততা টের পাইনি, অথবা স্বপ্নাচ্ছন্নতাই এর কারণ। দয়াময়ের হাতে টর্চ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কী বোক? পৃথিবী ভেসে গেলেও চিরদিন তোমার হাঁটু জল।

দয়াময় আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে সাপের কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু উনি কান করলেন না। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামালেন। উঠোনের জল দুজনেরই কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। নীলধূসর আলোয় একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু নিষ্প্রভ নক্ষত্র দেখতে পেলাম। বাতাস বন্ধ। চারদিকে শুধু জলের শব্দ। মাঝে মাঝে মানুষজনের চিৎকার। দয়াময় যখন আমাকে তাঁর দোতলায় পৌঁছে দিলেন, তখন প্রথমেই আমি লালীকে খুঁজলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। দয়াময় আমাকে একটা লুঙ্গি পরতে দিলেন। আবার আমি সাপের কথাটা বলতে গেলাম। অমনি দয়াময় চাপা স্বরে স্পষ্টভাবে বললেন, সাপ তোমার মাথার ভেতর।

আলো আরো স্পষ্ট হলে দয়াময়ের গেটের কাছে রিলিফের নৌকো এল। দয়াময় তখন রিলিফের কাজে বেরিয়ে গেলেন।···

সাপটির সঙ্গে আমার চতুর্থবার দেখা হয় বন্যার জল গ্রাম থেকে নেমে যাওয়ার ক'দিন পরে। বারান্দার কোনায় রাখা আসবাবপত্র ফেলে দেবার জন্য যে লোকটিকে ডেকে এনেছিলাম, তার নাম ছিল শুকুর। সে ছিল নিতান্তই এক ক্ষেতমজুর। কিন্তু সাপ মারতে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। গ্রামের বহু সাপ সে মেরেছিল। আমাদের এলাকায় দু'চারজন ওঝা ছিল বটে, কিন্তু সাপধরা বেদে ছিল না। তাই কোথাও বিষাক্ত সাপ দেখতে পেলে শুকুরকে ডাকা হতো। শুকুর বারান্দার কোনা থেকে সব বাতিল জিনিস সরিয়ে ফেলে রায় দিয়েছিল, সাপটা চলে গেছে। আর ঠিক সেদিনই বাগানে আগাছার ঝোপের ভেতর হঠাৎ সাপটিকে আমি দেখতে পাই।

বাগানের ঘাসেভরা মাটিটা তখনো ভেজা ছিল। আকাশে ছিল গনগনে

সূর্য। ঝলমল করছিল গাছপালা। আসলে আমি সাপটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আগাছার তলায় স্যাঁতসেঁতে নগ্ন মাটিতে তার চিত্রিত সুন্দর শরীর একেবারে নিস্পন্দ। তার গলার নিচেটা স্ফীত দেখে বুঝলাম সে কিছু গিলেছে, তাই এমন চুপচাপ আর ক্লান্ত।

খুব দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। সাপটিকে মেরে ফেলা এখন হয়তো খুবই সহজ। ছায়ার ভেতর ভিজে মাটিতে ছত্রাক আর খড়কুটোর পাশে সামান্য বাঁকাচোরা তার শরীর প্রাকৃতিক লাবণ্যে ও কোমলতায় বড়ো উজ্জ্বল। তাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওর ওই সৌন্দর্যের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকাও ওতপ্রোত। প্রতি সেকেণ্ডে বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছে স্ফীত হতে হতে আমাকে স্বয়ং জীবন এসে ভূতের মতো পেয়ে বসল। আমি জীবনচেতনায় অস্থির হয়ে দৌড়ে একটা লাঠি আনতে গেলাম।

আর সেই সময় ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে লালীকে আসতে দেখলাম। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। লালী সোজা বারান্দায় উঠল এবং আমার ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে গিয়ে দেখি, সে আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে। খাটের একটা বাজু আঁকড়ে ধরে সে মুখ নামিয়ে আছে। খোঁপা ভেঙে তার চুল উপচে পড়ছে একদিকে। তার পিঠটা কাঁপছে। আমি আস্তে বললাম, কী হয়েছে রে?

লালীকে সেই প্রথম আমি কাঁদতে এবং ভেঙে পড়তে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে সে সোজা হয়ে বসল। চুলগুলো খোঁপা করে বেঁধে নিল। ভিজে চোখ মুছে ফেলল। তখন আবার জিগ্যেস করলাম, লালী, কী হয়েছে?

লালী শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমার একটা কথা রাখবি বীরু?

কী কথা রে?

লালী আমার চোখে চোখ রেখে বলল, আগে আমার গা ছুঁয়ে বল, রাখবি।

কিন্তু কথাটা কী, আগে বলবি তো?

লালীর ভিজে চোখ জ্বলে উঠল, বীরু, তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি।

খুব হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, তুই মরবি কেন?

লালী শক্ত মুখে বলল, মরব। আর মরার আগে লিখে রেখে যাব আমার মরার জন্য তুই দায়ী।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কেউ বিশ্বাস করবে না।

লালী উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, এবার যদি আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি?

এবং একথা বলেই সে ঝটপট শাড়ি খোলার ভঙ্গি করল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম সে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। ঝটপট বলে ফেললাম, ঠিক আছে। কথা রাখব। বল কী কথা?

লালী নিষ্ঠুর নিঃশব্দ হেসে বলল, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তারপর সে কয়েক পা এগিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো। ফিসফিস করে বলল, আমার গা ছুঁয়ে বল।

ওর কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, ঠিক আছে। বল।

লালী ষড়যন্ত্রসংকুল কণ্ঠস্বরে বলল, তুই এখনই বাবাকে গিয়ে বল— স্ট্রেটকাট বল গিয়ে, আমাকে বিয়ে করবি।

ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, লালী! সেবার তুই নিজে এসে—

আমার কথা কেড়ে লালী বলল, তুই একটা ইডিয়েট বীরু! সত্যি সত্যি তো তুই বিয়ে করছিস না। শুধু—মুখে গিয়ে কথাটা বল।

কিন্তু ব্যাপারটা খুলে বলবি তো?

লালী শান্তভাবে আবার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর পা দোলাতে দোলাতে বলল, বাবা একটা লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছে। সে কে জানিস? স্কুলে যে নতুন একজন টিচার জুটিয়েছে—ভূতের মতো দেখতে। আচ্ছা, তুই বল তো বীরু, আমি কি দেখতে খারাপ?

কক্ষনো না। সায় দিয়ে বললাম। তুই সত্যি সুন্দর। তোর কেন যে বিয়ে হচ্ছে না!

লালী একটু হাসল। হচ্ছে না নয়। আমি নিজেই বাগড়া দিই—জানিস?

বলিস কী!

হুঁ। দেখেশুনে পছন্দ করে যায়। তারপর আমি বেনামে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, মেয়ের চরিত্র খারাপ। কতজনের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে নষ্ট হয়েছে। একটা চিঠিতে তোর নামও করেছিলাম।

লালী চাপা হাসিতে অস্থির হলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অসম্বৃত শাড়ির আড়ালে ওর মেয়েশরীরের কথা ভেবে আমার শরীরে যৌবনের দুর্দান্ত লোভ গরগর করে উঠল। আর দরজাবন্ধ ঘর। জানলার একটা পাশ খোলা। আবছা আলো এবং নির্জনতা। হঠাৎ আমি দুঃসাহসে বলে উঠলাম, তোর কথা আমি রাখছি। কিন্তু—

লালী ভুরু কুঁচকে তাকাল, বলল, কিন্তু কী রে?

লালী ! ছোটবেলায় মুক্তকেশীর মন্দিরতলায় তুই বলেছিলি আমার সঙ্গে ভাব করবি ।

হুঁ, বলেছিলাম ।

লালীর কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ততা ছিল । আমার শরীর কাঁপছিল । উরু ভারি হয়ে উঠেছিল । নিজের ঘামের বিকট গন্ধ টের পাচ্ছিলাম । তারপরই হঠকারিতায় ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম ।

লালী আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একই কণ্ঠস্বরে বলল, পাবি । আগে কথাটা বলে আয় বাবাকে । আমি এখানেই থাকছি । বাবা বাড়িতে আছে । গিয়ে স্ট্রেটকাট বলবি ।

আমি বেরিয়ে গেলাম । ভারি শরীর টানতে টানতে দয়াময়ের দোতলা বাড়ির গেটে পৌঁছুলাম । আর তখনই মনে পড়ল সাপটার কথা । বিস্ময়কর ও ভিন্ন এক হঠকারিতা লালীর শরীরের চেয়ে সাপটার শরীরকে আমার চোখের পর্দায় সেঁটে দিল । দয়াময় সামনের দিকে দোতলার ব্যালকনিতে বসে বন্দুকের নল সাফ করছিলেন । বন্দুক দেখামাত্র জোরে চেঁচিয়ে ডাকলাম ওঁকে, জ্যাঠা-মশাই ! সেই সাপটা বেরিয়েছে ।

দয়ামম উঠে দাঁড়ালেন । ব্যস্তভাবে বললেন, চলো ! যাচ্ছি ।···

সাপটি সেদিনও অদৃশ্য হয়ে যায় । হাট করে খোলা আমার ঘরের দরজায় উঁকি মেরে লালীকেও অদৃশ্য দেখতে পাই । আর ঠিক যে ভঙ্গিতে দয়াময় সাপটির গতিরেখা তন্নতন্ন খুঁজছিলেন, আমিও একই ভঙ্গিতে আমার বিছানায় এবং মেঝেতে লালীর গতিরেখা অন্বেষণ করেছিলাম । শুধু এটুকুই তফাৎ যে, দয়াময় সাপটির গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করেননি কিংবা করলেও পেতেন কি না সন্দেহ—আমি ঘরভরা লালীর গন্ধে কিছুক্ষণ আবিষ্ট ছিলাম । আর লালীর শরীরের গন্ধের সঙ্গে আমার শরীরের গন্ধও মিশে ছিল । ক্রমশ সেই মিশ্রিত গন্ধ উবে গেলে প্রচণ্ড উত্তেজনার পর ঠাণ্ডা, হিম এক অবসাদ এসে আমাকে ছুঁলো । আমি ভিজে পুতুলের মতো নেতিয়ে গেলাম ।

সারাদুপুর বিছানায় শুয়ে সেদিন যতবার লালীর কথা ভাবতে যাই, ঝলমলে রোদে চেকনাই সবুজ আগাছার ঝাড়ের তলায় রহস্যময় ছায়ার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকাটি অবচেতনা থেকে হিসহিস শব্দে সাড়া দেয় । তার চেরা জিভ, নীল দুটি চোখ আমার চোখে প্রতিবিম্বিত হয় । প্রকৃতির নিজের হাতে

আঁকা আল্পনা দিয়ে সাজানো তার ফণাটি দুলতে থাকে। তাকে বলতে ইচ্ছে, তুমি এত সুন্দর! অথচ আমার মুখে কথা সরে না। আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি তো জানি, তার সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি তাকে মনে মনে আশ্বাস দিই, আর কোনোদিন দয়াময় বা শুকুর সেখকে ডাকব না। তুমি বেঁচে থাকো। আমিও বেঁচে থাকি।

পঞ্চম ও শেষবার সাপটির সঙ্গে আমার দেখা হলো এক বিকেলবেলায়। সেদিন আকাশ ছিল নির্মেঘ। ফিকে লাল-হলুদ আলোয় নিসর্গকে দেখাচ্ছিল কনে-বউয়ের মতো সলজ্জ আর কোমল। বাগানের কোনায় কেয়াঝাড়ের গোড়ার খাঁজের ভেতর থেকে সে সবে মাটিতে নেমে আসছিল, সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমি এক পা পিছিয়ে আসতেই সে ফণা তুলল। মাটিতে আমার পায়ের শব্দের স্পন্দন সে টের পেয়েছিল। কিন্তু আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেলে সে ফণা গুটিয়ে নিল। তারপর চলতে শুরু করল। ঘন ঘাসের ভেতর সে গা ঢাকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে দয়াময়ের ডাক শুনতে পেলাম। দেখলাম উনি বাড়ির ভাঙা গেটের নিচে বাঁশের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন, বললেন, ওখানে কী করছ?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

দয়াময় একটু হাসলেন। সাপ দেখছ নাকি? তোমার মাথায় আসলে—তো শোনো। সামনের রোববার লালীর বিয়ে। এই নাও—

দয়াময় আমার হাতে একটা সুন্দর খাম এগিয়ে দিলেন। তাতে প্রজাপতির ছবি আঁকা। কোনায় একটু হলুদ ছোপ। বললেন, আসবে যেন। না না, নেমন্তন্ন খেতে নয়, সব দেখাশুনো করবে-টরবে। বলতে গেলে তুমি একরকম বাড়িরই ছেলে।

আমি চুপ করে থাকলাম। দয়াময় কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত। দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে একটু কাসলেন। তারপর ধরা গলায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ভবিতব্যের ওপর মানুষের হাত নেই। তোমার মায়ের বড়ো ইচ্ছে ছিল—আমারও। তো তুমি বেঁকে বসলে। আমি তো তোমাকে বাধ্য করতে পারি না—

বলেই মুখ তুললেন। চোখে চোখ পড়ামাত্র আমি আস্তে বললাম, জ্যাঠা-মশাই! আমি জানি লালীর এ বিয়েতে মত নেই।

দয়াময়ের মুখটা তখনই বদলে গেল। যেন আমার কথা বোঝেননি এমন

ভঙ্গিতে বললেন, কোন বিয়েতে ?

এই বিয়েতে।

দয়াময় নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বললেন, দয়াসিঙ্গি যার জন্ম দিয়েছে, তার মতামত নিয়ে মাথা ঘামায় না।

একটা আবেগ—হয়তো প্রতিবাদেরই আবেগ, কিংবা হয়তো লালীকে বাঁচানোর জন্য একটা জোরালো তাগিদ আমাকে সাহসী করে দিল। বললাম, লালী শিক্ষিতা মেয়ে। তার মতামতের একটা মূল্য দেওয়া উচিত নয় কি জ্যাঠামশাই ? যাকে সে পছন্দ করে না, তার সঙ্গে সে কীভাবে ঘর করবে, ভেবে দেখা উচিত নয় কি ?

দয়াময় চাপা গর্জন করে বললেন, হুম ! তুমি যে এত লম্বা-চওড়া কথাবার্তা আওড়াচ্ছ, তার বেসিস কী ? লালী তোমাকে বলেছে বুঝি ?

মুখ নামিয়ে বললাম, হুঁ।

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর দয়াময় বললেন, আমি যেমন জানতাম, তোমার মাও তেমনি জানতেন, লালীর সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক ছিল। ঠিক এ জন্যই আমি কথাটা তুলেছিলাম। কিন্তু তুমি—ইউ কাওয়ার্ড। আমার মেয়ের সর্বনাশ করে ছাড়লে ! তারপর তুমি—

প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, জ্যাঠামশাই ! বিশ্বাস করুন, আমি লালীর কোনো সর্বনাশ করিনি !

দয়াময় দ্রুত ঘুরে গেটের দিকে পা বাড়ালেন। কয়েক-পা এগিয়ে পিছু ফিরলেন এবং আমার কাছে ফিরে এলেন। ভাঙা গলায় বললেন, তোমার একটা চাকরিবাকরি না জোটা পর্যন্ত কথাটা বলব না ভেবেছিলাম। তাছাড়া আমার ইচ্ছে ছিল, লালীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে কথাটা বলার দরকারও হবে না। কিন্তু এখন মনে হলো, বলার সময় হয়ে গেছে।

একটু অবাক হয়ে বললাম, কী কথা জ্যাঠামশাই ?

দয়াময় নির্দয়মুখে বললেন, তোমার পড়াশুনো আর সংসার খরচের জন্য তোমার মা এই বাস্তুজমির পুরোটাই আমার কাছে একরার-নামা ডিড করে দিয়ে গেছেন। পাঁচ বছরে সুদসমেত টাকা ফেরত না দিলে এর মালিকানা আমার ওপর বর্তাবে। ডিডের মেয়াদ দু'বছর আগে শেষ হয়েছে।

আমি মনে মনে সাপটিকে ডাকছিলাম। এখন দয়াময়ের হাতে বন্দুক নেই।

দয়াময় কেশে গলা ঝেড়ে বললেন, যাই হোক—আমি অত খারাপ লোক

নই। আশা করব তুমি লালীর বিয়ের দিনে সকাল সকাল যাবে। কাজকর্ম দেখাশুনো করবে। খুব দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হলো—তুমিই বলিয়ে ছাড়লে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, অন্তত তোমার মায়ের মুখ চেয়ে তোমাকে আমি বাড়ি থেকে উৎখাত করব না—অন্তত যতদিন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারছ।

শেষ কথা বলে দয়াময় শান্তভাবে চলে গেলেন। গেটের বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি আগড়টাও ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।···

বছরতিনেক পরে একদিন সদর শহরের রাস্তায় মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় লালীর সঙ্গে। আমিই তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আসলে আমি আকাশ-বাতাস আর সারা শহরটাকে প্রতিধ্বনিত করার মতো প্রচণ্ড জোরালো একটি চিৎকার তুলতে চেয়েছিলাম, লালী, তুমি মরোনি? লালী, তুমি বলেছিলে 'মরামুখ দেখবে'!

লালীর কোলে একটা বাচ্চা ছিল। তার পাশে পাশে হেঁটে আসছিলেন রোগাটে গড়নের শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক, পরনে ধুতি ও মটকার পাঞ্জাবি এবং তাঁর ঠোঁট খুবই পুরু এবং তাঁর সামনের দাঁতের পাটি ঠেলে বেরুনো। অথচ ওই মুখে গাঢ় অমায়িক ও আলাপী ভাব ছিল।

লালীর আমাকে চিনতে সেকেণ্ড দু-তিন দেরি হয়েছিল। চেনামাত্র সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, বীরুদা, তুমি! দাড়ি রেখেছ কেন? সে খুব ব্যস্তভাবে তার সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়।···সেই বীরুদা গো—যার কথা তোমাকে প্রায়ই বলি!

আমরা দুটি ভদ্রলোক নমস্কার বিনিময় করি। বাচ্চাটির গাল টিপে আমি আদর করতে গেলে লালী তাকে আমার কোলে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করে।··· তোমার মামা! বীরু মামা! কিন্তু বাচ্চাটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর লালী খিলখিল করে হাসে।···বড্ড লাজুক—একেবারে বাবার স্বভাবটি পেয়েছে।

তারপর লালী অনর্গল কথা বলে। গ্রামের খবরাখবর দিতে থাকে। শেষে বলে, একদিনের জন্যও তো যেতে পারো বীরুদা। আর শোনো, তোমাদের বাড়িটা এখন পুরোটাই ফুলের বাগান! ও নিজের হাতে সব করেছে-টরেছে। দেখলে ভাববে কোথায় এলাম—চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার—সত্যি!

ভাবলাম, ওকে সাপটার কথা বলি। আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছিল, সাপটাকে

ওরা দেখতে পায় কি না। কিন্তু সেই সময় লালীর স্বামী ভদ্রলোক, সেই স্কুলশিক্ষক চলমান একটা সাইকেল রিকশোকে 'রোখো', 'রোখো' বলে দাঁড় করান এবং লালীসহ ওতে উঠে বসেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। রিকশোটা গড়িয়ে চলার সময় লালী হাসিমুখে ঘুরে বলে যায়, একদিন যাবে যেন বীরুদা!

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পাই, লালীর মুখের সেই পুরুষালি রুক্ষতা তো দেখলাম না! আমি দেখলাম সুন্দরী নারীর প্রসাধিত লাবণ্য আর কোমলতা। চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকা—যাকে অন্তত বার পাঁচেক আমি নিসর্গের গাঢ় ছায়ায় আবিষ্কার করেছিলাম, এতদিনে কি তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল? জানি না। আমি সত্যিই জানি না।...

একটি বান্নুকের উপকথা

খর্জুনার পোড়ো রেশমকুঠির এই বান্নুকটি পাঁচ-সাত মাইল দূর থেকেও চোখে পড়ে। চারকোণা প্রকাণ্ড নিরেট থামের গড়ন বান্নুকটির উচ্চতা কেউ বলে নব্বুই ফুট, কেউ বলে দেড়শো ফুট। নিরক্ষর জনগণের উচ্চতা মাপার জন্য তালগাছ আছে। তাদের হিসেবে বান্নুকটি দুই তালগাছ উঁচু। বহু বছর আগে এক ভূমিকম্পে বান্নুকটি ঈষৎ হেলে যায় এবং সামান্য ফাটল ধরে। কিন্তু ধসে পড়ে না। নিচে থেকে মাথা পর্যন্ত লোহার যে হুকগুলি বসানো ছিল, মরচে ধরে মাঝে মাঝে খসে গেছে। তাই আর শীর্ষে ওঠা যায় না। উচ্চতার প্রতি পাগলদের মোহ আছে বলে শোনা যায়। কিন্তু এলাকার কোনো পাগলই সে চেষ্টা করেনি। হুকগুলি অটুট থাকার যুগে যে লোকটি বান্নুকের শীর্ষে উঠে নিজের জয়গান গেয়েছিল, সে এক মাতাল। তার নাম ছিল গুলাই। এক আকাশ-বিহারিণী দেবীর বিশ্রামস্থল ওই বান্নুকশীর্ষে উঠে বেয়াদপি করায় কুপিতাদেবী তাকে লাথি মেরে ফেলে দেন। গুলাইয়ের ছেলে ধর্মধ্বজ। ধর্মধ্বজের ছেলে পাহাড়ু। খর্জুনায় তারা মোটে এই তিনপুরুষ। গুলাই যখন টাট্টু ঘোড়ার পিঠে জাঁতা চাপিয়ে খর্জুনার হাটে বেচতে এসেছিল, তখনো শিয়রে বান্নুক নিয়ে রেশমকুঠির ভাঙচুর দশা। তার জাঁতাবওয়া ঘোড়াটা এখানেই ধুঁকতে ধুঁকতে মারা পড়ার পর সে আর দেশে ফেরেনি। যার জন্য ফিরত, সে তার সঙ্গেই ছিল। সে দুলারি। আর তার পেটে তখন ধর্মধ্বজ। কুঠির অটুট একটুকরো দেয়াল ঘেঁসে গুলাই যে ঝোপড়ি বানিয়েছিল, সেখানেই ধর্মধ্বজের আবির্ভাব। আবির্ভাব, কারণ ধর্মধ্বজের রূপ দেখে হোক, কিংবা অনুশোচনাবশে হোক, আকাশবিহারিণী সেই দেবী তার মায়ায় পড়েন। এর ফলে তার মাথায় বালক-বয়সেই গজিয়ে ওঠে জটাজুট। হাটের মালিক কুঞ্জবাবুরা তাকে বেদি তৈরি করে দেন। সেই বেদীতে বসে ধর্মধ্বজের মুখ দিয়ে দেবী ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। হাটবারে খুব পয়সা পড়তো। কুঞ্জবাবুদের নিযুক্ত এক ঢুলি ঢ্যাডাং ঢ্যাডাং করে ঢোল আর তার সিকনিঝরা ছেলেটা কাঁসি পিটতো। বেলাশেষে পয়সা কুড়োতে

আসতেন কুঞ্জবাবুদের নিযুক্ত হাটোয়ারি বানারিবাবু। দুলারি আনাচে-কানাচে ছোঁক ছোঁক করে শেষে ঝোপড়িতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো। অন্য সময় ধর্মধ্বজ ন্যালাভোলা বালক। তার একটাই প্রিয় ছড়া ছিল : 'কপ্‌নি কম্বল লোট্টা / খাইলম বেগনভত্তা ॥'

আকাশের দেবী তাকে এই ছড়া শিখিয়েছিলেন। আরো বড়ো হয়ে ধর্মধ্বজ এক হাটবারে ভবিষ্যদ্বাণী করে, 'কুঞ্জ সিংয়ের ছেলে রনো সিংয়ের বউয়ের পেট থেকে হাটোয়ারিজির বাচ্চা বেরুবে আর বাচ্চাটা হবে অন্ধ।' খবর রটে ঢিঢি পড়লে রণজয় সিং এসে ধর্মধ্বজের জটাজুট উড়িয়ে দেয়। রক্তারক্তি হয়ে পড়ে থাকে হাটতলায় দুলারির ব্যাটা। বেদি উপড়ে রণজয় রোপণ করে পিপলগাছের চারা। ঝোপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কী আতঙ্কে বানারিবাবুও পালিয়ে গিয়ে ধুলিয়ানে বিড়ির ব্যবসা ফাঁদেন। পরবর্তী যুগে তাঁর কাজলমার্কা বিড়ির খ্যাতি সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ট্রেনের কামরায় ফেরিওয়ালারা সুর ধরে গাইত :

'বনোয়ারির কাজলবিড়ি খেতে ভুলো না
একটানেতে যেমন তেমন দুই টানেতে তালকানা ॥'

এদিকে রনো সিংয়ের বউ নারায়ণী সত্যিই এক অন্ধ বাচ্চা বিয়োয়। রণো সিং অবশ্য তা দেখার আগেই এক দাঙ্গায় খুন হয়েছিল। খর্জুনার মারদাঙ্গা বাঘা বাঘা দারোগারা বন্ধ করতে পারেননি। চিরকালের বেহায়া কুঞ্জ সিং অন্ধ নাতিকে কোলে করে ঘুরে বেড়াতেন আর বলতেন, 'দ্যাখ, শালারা! ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ এর মুখে কার মুখ বসানো।'

মা-ব্যাটা মিলে দুলারিরা নিপাত্তা হয়েছিল। বছর পাঁচেক পরে ধর্মধ্বজ ফিরে এসে বাবুকের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে আর সবাই ভীষণ অবাক হয়ে দ্যাখে, বাবুকের শীর্ষে একফালি লাল ধ্বজা উড়ছে পতপতিয়ে। সে ছিল ঘোরতর শুখার বছর। বর্ষার মাসে মাঠে ধুলো উড়িয়ে বইছিল লু হাওয়া। পুকুর দীঘি মাঠের কাঁদরে জল গিয়েছিল শুকিয়ে। বাজপড়া তালগাছে বসে চাতক পাখিটা জল জল করে গলা ভেঙে ফেলেছিল। সারারাত হাটতলায় নেড়ি কুকুরগুলো ডুকরে ডুকরে কাঁদতো। এক হাটবারে হাট লুঠ হলো। কুঞ্জবাবুদের ধানের গোলা, রাম সিং লক্ষ্মণ সিং পাটোয়ারির আড়ত পর্যন্ত ধুলিসাৎ করে দিয়ে গেল লোকেরা। ধর্মধ্বজ হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে গাইতে লাগল : 'কপ্‌নি কম্বল লোট্টা / খাইলম বেগনভত্তা ॥'

বেগতিক দেখে কুঞ্জ সিং তাঁর ছেলের পোঁতা পিপলগাছের গোড়া ঘেঁসে আবার বেদি বানিয়ে দিলেন। ঘগা ঢুলি তার ছেলে খগাকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ঢোল-কাঁসি বাজাতে এল। আকাশের দেবী হলেন প্রসন্না। সাধু ধর্মধ্বজকে সেই বেদিতে এনে বসাতেই ঈশান অগ্নি বায়ু ও নৈঋত জুড়ে উঠে আসতে থাকল দুধেল গাইগোরুর মতো ধূসর মেঘপুঞ্জ, তাদের তলপেটগুলি দেখার মতো ছিল। অমর্ত্য স্তনধারা প্রথমে ঝিরিঝিরি পরে ঝরঝর, শেষে ছড়বড় করে পড়তে লাগল। আকাশের দেবীও ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন। সেই হাসির ছটায় স্থির বৃষ্টিরেখার ঝরকা মুহুর্মুহু, আর ভেতরে সাধু ধর্মধ্বজ তার দ্বিতীয় প্রজন্মের জটাজুট নেড়ে বেদিতে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্ফ করে চিক্কুর ছাড়তে লাগল: 'কপ্‌নি কম্বল লোট্টা / খাইলম বেগনভত্তা ॥'

সেবার খর্জুনার মাঠে নাম্‌লা আবাদ হলো। ধানের গুছি বেশি উঁচু হতে সময় পায়নি। পেটে শিশির ঢুকে শিগগির শিগগির কুমারীর গর্ভধারণের মতো পেটে থোড় হয়ে গেল। তবে ফলন তিন-চতুর্থাংশ হয়েছিল। তাতেই কত মারদাঙ্গা, শীষে শীষে জলজলে রক্ত, বিশটা মোকর্দমা, তেবোখানা এনকুয়েরি, ডেপুটি সাবডেপুটি সার্কেল অফিসার দারোগার যাতায়াত। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে নবান্নের ধুমও হলো। জামাইদের আনা হলো। বানুকের হাটতলায় বেহুলার পালা, কেষ্টযাত্রা, জিয়াগঞ্জের মধুবালার কেত্তন, শেষ আসরে বীরভূমের মল্লারপুর থেকে ঝুমুর-মেয়েরাও এসেছিল। বাতদুপুরে ওদিকে পাকুড় সেদিকে নিমতিতা থেকে বোর্ডিংবাসী ছাত্ররা লুকিয়ে চলে এসে মেয়েগুলোর সঙ্গে যথেচ্ছ লেপটা-লেপটি করে যায়। তারা দাঁতে কামড়ে তামার পয়সা পেলা ধরে। এলোকেশী, চাঁপা, তুফানি, কমলারা মাজা দুলোতে দুলোতে রসের গান গাইতে গাইতে কাছে এসে দাঁতে কামড়ে সেই পয়সা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এক পয়সায় অধরে অধর, দু' পয়সায় কোল, এক আনায় তার ডবল। দুআনা ধরলে তো আসর পার—বানুকের পেছনে; যেখানে একসার সামনের দেয়াল অনেকগুলি খিলানাকার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কমাস আগেই তো সেই শূন্য দরজা দিয়ে শূন্য মাঠের নিষ্ঠুর লু বাতাস ধুলোমাখা শরীর নিয়ে ছুটে আসতো। ঝাঁপিয়ে পড়তো হাটতলায়। হাটতলা থেকে রাস্তা বরাবর গ্রামের ভেতর। সেই ভয়ঙ্কর কথা ভুলিয়ে দিতে একেকটি ঝুমুরনাচা ক্লান্ত রুগ্ন শরীরও অনেক বেশি।

তো আকাশের দেবী জানেন মানুষ বড়ো পাঁঠা। তার প্রমাণ সাধু ধর্মধ্বজের মুখে। কথায় কথায় সে তার দ্বিতীয় আবির্ভাবের কালে 'অ্যাই পাঁঠা' বলে

ডাকতো মানুষজনকে—তা তিনি স্বয়ং কুঞ্জ সিং হোন, কী রাম সিং বা তাঁর ভাই লক্ষ্মণ সিং পাটোয়ারিজিই হোন। এক হাটবারে সাধু ধর্মধ্বজ হঠাৎ চোখ কটমটিয়ে কুঞ্জ সিংকে বলে ওঠে, 'অ্যাই পাঁঠা! আমি বিয়ে কর্ব।' শুনে কুঞ্জ সিং ভীষণ অবাক হয়ে যান। টের পান, এ বাণী দেবীর বাণী নয়। গুলায়ের ব্যাটার কথা। তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'ধজা নাকি রে? বিয়ে কর্বি যে বলছিস, কর্লে তো আর সাধু থাকবি না বাপ। জটা খসে যাবে।' পরের হাটবারে তখন দেবী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন গুলাইয়ের ব্যাটা ধজা বিয়ে কর্বে। তার কনে আসবে এই বানুকের তলায়। সেই কনে এখন মায়ের কোলে মাই টানছে।...

এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছিল। তারপর লোকে সেটা ভুলেই গেল। এক যুগ পরে শীতের সন্ধ্যায় টিপটিপে বৃষ্টির ভেতর বানুকের হাটতলায় ততদিনে গজিয়ে ওঠা সারবন্দি এক ঝাঁক ঝোপড়ির ফাঁকে খিলানকরা কুঠিঘরের একটা দরজার পাশেই তাড়াহুড়ো লকড়ি পুঁতে চট চাপিয়ে আরও একটা ঝোপড়ি হয়ে যায়। লোকটা ছিল বেজায় বুড়ো। কিন্তু তার হাতে ভেল্কি ছিল। তার নাম ছিল তারাজু। সে ছিল এক চর্মকার। খর্জুনার হাটে ভদ্রেতর সর্বশ্রেণীর জুতোপরা পায়ের দিকে তাক করে বসে লোহার 'পাঁওঠিতে' হাতুড়ি ঠুকতো। মরা জুতো প্রাণ ফিরে পেত। ফাঁড়ির সেপাইরা এসে তার পাঁওঠিতে বুটসুদ্ধ পা রেখে গোঁফে তা দিত। তারাজু মানুষের মুখ চিনতো না পা-দেখা স্বভাবের দরুন। তাই তার ভয় ও লজ্জাটা ছিল কম। আর তার মেয়ে কসিলা খেলে বেড়াতো আনাচে-কানাচে। আপনমনে এক্কাদোক্কা খেলতো। নিজের সঙ্গে নিজেই খেলতো বানুকের অন্ধিসন্ধি জুড়ে চোরপুলিশ খেলা। হাটবারে সে হাটুরেদের পসরা-ভ্রষ্ট আনাজপাতি কুড়তো। তার মুখে স্বর্গের কোমল মায়া ছিল। হাটুরেরা স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় আবিষ্টভাবে বলাবলি করতো, 'মেয়েটি কে গো? আশা হয়, সে একদিন পৃথিবী কিনবে।' আর বেলার শেষে হাটতলা জন-শূন্য হয়ে গেলে কসিলা চুল বেঁধে কপালে ফোঁটা দিয়ে আপনমনে খুঁজে বেড়াতো অন্তত একচিলতে রাংতা কাগজ। তাদের ঝোপড়িকে অসংখ্য রাংতা আর রঙিন কাগজ দিয়ে সে সাজিয়ে তুলেছিল। মুগ্ধ চোখে সেই সাজগুলি দেখতে দেখতে সে খুব দ্রুত বড়ো হয়ে উঠছিল। সে ভাবতো, তার বড়ো হওয়ার সঙ্গে রঙিনতার কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে।

আর সেই বেদীর শিয়রে রনো সিংয়ের পোঁতা পিপলগাছও ততদিনে বৃক্ষ। পতপত শব্দে পাতাগুলি নাড়া দিয়ে সেই বৃক্ষ হাতছানিতে তারাজুর বেটিকে

ডাকতো। জনহীন দুপুরগুলিতে তখন কসিলা এসে সেই বৃক্ষের লতা হতো। সাধু ধর্মধ্বজ তাকে দূরের দৃষ্টিপাতে পর্যবেক্ষণ করতো। মাঝে মাঝে কসিলা নামতে না পারার ভান করে চিক্কুর ছাড়লে সে বেদিতে চড়ে দুই হাত উঁচু করতো। কসিলা বলতো, 'সাধু তোর ঘাড় দে, নামি।' ধর্মধ্বজ বলতো, 'উহুঁ, হাতে হাতে আয়। তোকে পাতে পাতে খাই।' এই ভীষণ কথা শুনেও কসিলা খিখি করে খালি হাসতো। শেষে পেছনে ঘুরে ধর্মধ্বজ তাকে ঘাড় দিত। তখন তার ঘাড়ে পা রেখে কসিলা একলাফে নেমেই উধাও হয়ে যেত। ধর্মধ্বজ তাকে তাড়া করতো। খিলানকরা সারি সারি দরজার ভেতর মুহূর্তে মুহূর্তে যাতায়াতকারী কসিলা যেন এক উজ্জ্বল মাকু এবং ধর্মধ্বজ তন্তুবায়। জীর্ণ বানুকের অলীক তাঁতে এইরকম ছিল মায়াময় বস্ত্রবয়নের খেলা, দিনমান।

বহুদিন পরে এক সন্ধ্যায় কুঞ্জ সিংয়ের বৈঠকখানায় পাত্রমিত্র সভাসদপরিবৃত কুঞ্জ সিংয়ের সামনে তারাজু তার মেয়ে কসিলার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ায় এবং হাউমাউ কেঁদে নালিশ রুজু করে, 'হারামি ধজা সাধু আছে না আমার ইয়ে আছে হুজুর। সে আমার বেটির ইজ্জত লিয়েছে।' সে কসিলার পরনের কাপড়ের ছেঁড়া জায়গাগুলি এবং কয়েকটি টাটকা লাল ছোপও লণ্ঠনের আলোর সামনে তুলে ধরে। আর কসিলার চোখ ছিল ভিজে, নিচের ঠোঁট কামড়ানো এবং নাসারন্ধ্র স্ফীত। তারাজু ক্রমশ ক্ষেপে গিয়ে উরুতে থাপ্পড় মেরে গর্জনময় হাহাকার করতে থাকে, 'হুকুম দিন—শালার জান লিয়ে লিই।' কিন্তু সে খুবই বুড়ো। শেষে ক্লান্ত হয়ে ধপাস করে বসে পড়ে। শাদা মাথাটি দু' হাতে আঁকড়ে ধরে এদিক-ওদিক নাড়তে থাকে।

কুঞ্জ সিং বলেন, 'চল তো দেখি।' পাত্রমিত্র সভাসদবৃন্দ তাঁকে গম্ভীর মুখে অনুসরণ করে। সবার আগে তারাজু কসিলার কাঁধ ধরে ঠেলতে ঠেলতে হাঁটে। পেছনে লণ্ঠন আর ছড়ি হাতে থপথপিয়ে হাঁটেন কুঞ্জ সিং। তাঁর পেছনে অমাত্যবর্গ। হাটতলার প্রান্তে বানুকের কাছে সেই বেদিতে ধর্মধ্বজ দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখদুটি লাল। কুঞ্জ সিং লণ্ঠন উঁচু করে তাকে দেখেন। তখন ধর্মধ্বজ বগল বাজাতে শুরু করে। তারাজু ভাঙা গলায় চিৎকার করে ক্রমাগত নিজের গোপন অঙ্গটির সঙ্গে সাধুর তুলনা দেয়। তারপর কুঞ্জ সিং বলেন, 'চুপ চুপ। আগে শুনি। বল্‌রে ধজা, তুই আগে বল।'

ধর্মধ্বজ ফের বগল বাজিয়ে বলে, 'কসিলা আমার বউ! কসিলা আমার বউ।' সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে শিহরণ ঘটে যায়। লোকগুলি ভীষণ চমকে ওঠে।

তাদের মনে পড়ে যায় একযুগ আগের সেই ভবিষ্যদ্বাণী। দেবী বলেছিলেন : 'গুলাইয়ের ব্যাটা ধ্বজা বিয়ে কর্বে। তার কনে আসবে এই বানুকের তলায়।'

তারপর ধর্মধ্বজ লাফ দিয়ে বেদি থেকে নেমে বাঘের শিকার ধরার মতো কসিলাকে ধরে। লোকগুলি মুখবিবরে হস্তপ্রহার করতে করতে ধ্বনি দেয়, 'আ বা বা বা বা !' যা কিনা প্রাচীন রণধ্বনি। আর তারাজু তখন ধর্মধ্বজের ঠ্যাং চেপে ধরলে তার সেই হাতে কুঞ্জ সিং ছড়ির বাড়ি মারেন।

পরবর্তী এক হাটবারে বেদিতে এসে আকাশের দেবী ঘোষণা করেন : 'কসিলাব পেটে যে বাচ্চা আসবে, তার নাম হবে পাহাড়ু। কারণ তার গায়ে থাকবে পাহাড়ের জোর।'...

পাহাড়ুর জন্মের রাতে পৃথিবীর অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল ধ্বজার বউ বিয়োচ্ছে না, বুঝিবা মা বসুমতীরই ছানা বেরুচ্ছে—সেইমতো হুলস্থুল। ঝড় বৃষ্টি মেঘ-গর্জন নিয়ে আশ্বিনে সে এক প্রলয়মুহূর্ত। কসিলা যত যন্ত্রণায় কাঁদে, ধ্বজা তত বগল বাজায় আর ছড়া গায় : 'কপনি কম্বল লোট্টা / খাইলম বেগনভত্তা ॥'

আর সেই দুর্যোগের ভেতর বুড়ো তারাজু ঝোপড়িতে ঝোপড়িতে ডাকাডাকি করে বেড়ায়। এমন রাতে মানুষের জন্মক্ষণেও সকলের মনে পড়ে যায় জাতপাতের কথা। ধ্বজার জাতের খবর বিশেষ জানা নেই। তবে বৃদ্ধ হাটুরেদের মধ্যে বলাবলি শোনা গেছে, এই ধ্বজা সাধু হয়েছে আর কুঞ্জবাবুরা তাকে খাতির করছেন বটে, পয়সার রাস্তা যেহেতু কুঞ্জবাবুরা সব তাতেই খুঁজে পান—কিন্তু ধ্বজার বাপ গুলাই ছিল পূর্ণিয়া জেলার অস্পৃশ্য, এদিকে কসিলার বাপ চর্মকার। সুতরাং ঝোপড়িবাসিনী অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকেরা তার দেহস্পর্শ করবে না। কলি তো মুখের ওপর বলে দেয়, মড়া হলে তার ঘাঁটতে আপত্তি নেই। কারণ মড়া ফেলাই তার সংসারের কাজ। হাটতলা ঝাড়ু দিয়ে সে মৃত চুহা, বিল্লি, কুত্তা ফেলে আসে ভাগাড়ে। এজন্য সে কুঞ্জ সিংয়ের বেতনভোগিনী। বুড়ো তারাজু কপাল চাপড়ে বলে, এবার বিড়ি মাংতে এলে সে তার মুখে তার বহুকথিত জিনিসটিই গুঁজে দেবে। কারণ সেটাই তার ধর্মত প্রাপ্য হলো।

তেরো বছর বয়সে মা হওয়া সেই যুগে ডাল ভাত। অগত্যা বুড়ো বাপ নিজের ঝোপড়ি থেকে সাহস দিয়ে বলেছিল, 'চুপসে বৈঠা থাক। আপসে হো যাবে। সময় না হলে কুছু হবেক নাই।' তার কিছুক্ষণ পরে শিশুর ওঁয়া ওঁয়া ক্রন্দনে তারাজু আবার বেরিয়ে পড়লো। শুকনো লকড়ি জ্বালতে হবে। সেঁকাপোড়া

করতে হবে। জামাই তো আধপাগলা—সাধুর ঢং নিয়ে থাকে।

কিন্তু বেরিয়েই অবাক হয়ে গেল তারাজু। বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝড় বন্ধ। আকাশ ঝিকমিকোচ্ছে। আর কালো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বান্নুকের মাথায় আটকে আছে একফালি চাঁদ। এই প্রথম বান্নুকের মহিমা দর্শন করল তারাজু। করজোড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সে সেই দিব্যজ্যোতিকে প্রণাম করল। কাদা মেখে গেল তার জরাগ্রস্ত কপাল। তারপর মেয়ে-জামাইয়ের ঝোপড়িতে ঢুকে সে দেখল, লম্পের মিটিমিটি আলোয় তার সাধু জামাই বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার মেয়ে শুকনো লড়কি ভেঙে কুণ্ড করছে। তারাজু দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে তার ঝোপড়ি থেকে চামড়াকাটা নিয়ান্দখানি নিয়ে এল।···

নাড়িটি ঠিকমতো কাটা হয়নি। পাহাড়ুর নাভি থেকে ইঞ্চি দুই-আড়াই ঝুলে থাকতো। খসে গেলে সেটি তার বালিকা মা কলি ডোমনির চোখ বাঁচিয়ে বহু-দূরে পুঁতে রেখে এসেছিল। তার পাহাড়ুকে অবশ্য সবাই ভালোবাসতে শিখেছিল, আর তাদের মধ্যে কলিও ছিল। কলি তাকে আঁচলে লুকিয়ে রাখা পাটালির কুচি কিংবা একটুকরো বাতাসা দিত। কসিলার আড়ালে তার গালে ঠোনা মেরে আদর করতো। আর ডোমান অনুতাপে বিগলিত হয়ে চুপিচুপি বলতো, 'আমার-ঠিঞে কুনো দুষঘাট লিসনা বাপ—ভগমান আমার হাত-পা বেঁধে দিয়েছে।' আর হাটুরেরা পাহাড়ুর মায়ের মতোই পাহাড়ুব মায়ায় বাঁধা ছিল। তাদের আনাজ-পাতির ভেতর কিংবা কখনো তাদের বগলের ফাঁকে সে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে মুখ বের করতো। দুধের দাঁতে খিট খিট করে হাসতো। হাটুরেরা তার মুখে গুঁজে দিত পরিহাসছলে আলু, পটল, কী পেঁয়াজ এবং পাহাড়ু তা চমৎকার চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো। ভিড়ের পায়ের তলা দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতো। একবার কেউ তাকে অলক্ষ্যে পায়ে চেপে দিলে লোকেরা সেই লোকটিকে প্রায় মেরেই ফেলে। ময়রাবুড়ির টাটের ফাঁকে পাহাড়ু মুখ বের করলে ময়রাবুড়ি ছুঁসনে ছুঁসনে বলে আর্তনাদ করলেও তাকে একটু ঝুরি অন্তত দিত। আর এইভাবেই বেড়ে উঠছিল পাহাড়ু, আকাশের দেবী যার কথা আগাম জানিয়ে রেখেছিলেন খর্জুনাকে।

পাহাড়ুর বয়স ছয়, তখন কুঞ্জ সিংয়ের মৃত্যু হয়। কুঞ্জ সিং হাটবারে বান্নুকের তলায় প্রতিষ্ঠিত বেদিতে দেবীর কাছে ভব-ওঠা ধর্মধ্বজের মুখ দিয়ে নিজের মৃত্যুর তারিখ জানতে চাইতেন। তিনি মাথা কুটে বলতেন, 'বল মা। অধম সন্তানকে একবার খবরটা দে মা।' দেবী নিরুত্তরা ছিলেন। আর কুঞ্জ সিং অপঘাতেই

মারা গেলেন। সেবারই তাঁর একতলা দালানখানি দোতলা হয়েছিল। রটে যায় যে তাঁর অন্ধ নাতি জন্মেজয় সিং, যিনি তখন পরিণত যুবাপুরুষ এবং সঙ্গীত-প্রিয় মানুষ, কুলোকের প্ররোচনায় ধাক্কা মেরে সিঁড়ির মাথা থেকে ঠাকুর্দাকে ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ নাকি হাড়কঞ্জুস কুঞ্জ সিং তার সঙ্গীতপ্রিয়তা কুনজরে দেখতেন। সেটা সম্ভবত ঠিক নয়। অন্ধ মানুষেরা এই বিশাল ও রহস্যময় পৃথিবীতে নিজেরাই বড়ো অসহায়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা, সঙ্গীত ও ঘাতকতার মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক।

জন্মেজয় সিং অন্ধ হওয়ার দরুন তাঁর দাদুর রেখে যাওয়া সম্পত্তির তদারকির অসুবিধে হচ্ছিল। তাঁর মা নারায়ণী স্ত্রীলোক হওয়ায় বুঝদারনি ছিলেন না। সেযুগে ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা ছিলেন প্রায় পর্দানসীনা। এদিকে নারায়ণী সত্যিই দুর্দান্ত প্রেমিকা ছিলেন। শোনা যায়, শ্বশুরের জীবদ্দশাতেই গঙ্গাস্নানের ছলে তিনি গোপনে ধুলিয়ান যেতেন এবং বানারিবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁর ধুলিয়ানের প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় ডুব দেবার বাতিক বেড়ে গিয়েছিল। অথচ তখন তাঁর কালো চুলের রাশি খুঁজলে আকস্মিক দু-একটি শাদা চুল দেখা যায় এবং বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

পাহাড়ুর আট বছর বয়সে বানারিবাবু তাঁর বিখ্যাত কাজলবিড়ির বাণিজ্যস্বত্ব এবং ট্রেডমার্ক পর্যন্ত বেচে দিয়ে খর্জুনায় ফিরে আসেন এবং আবার হাটোয়ারি-বাবু হয়ে ওঠেন। তিনি ভীষ্মের মতো চিরকুমার থাকার প্রতিজ্ঞা করে থাকবেন। তবে এ-বানারিবাবু সে-বানারিবাবু নন। ইনি পরাক্রমশালী সিংহ। জীবনে প্রচণ্ড ঘা-পোড় খাওয়া এবং কলঙ্কে কলঙ্কে জেরবার এক দুর্দান্ত মানুষ। কালেক্টর, ডেপুটি, সাবডেপুটি, সিও এবং দারোগাবাবু তাঁর দক্ষিণহস্ত, অথবা তিনিই তাঁদের দক্ষিণহস্ত। খর্জুনায় ফিরেই তিনি অন্ধ জন্মেজয়ের বিয়ে দেন ভাগলপুরে। জমিজমা, হাট, মহাজনী কারবার তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সোনা হয়ে ঝলমলায়। সেই প্রথম খর্জুনার রাস্তায় পিচ পড়ে এবং মোটরগাড়ি আসে। লোকেরা মোটরগাড়ি চেপে প্রথম-প্রথম বমি করে ভাসায়। শেষে জীবনের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ভোগদখল করতে থাকে।

সাধুর মারফত দেবীর বেদিতে হাটবারে গড়ে আয় ছিল চৌদ্দ আনা। কোনো কোনো হাটে তিন টাকারও বেশি পড়তো। কুঞ্জবাবুর মৃত্যুর পর কড়িবাবু হাটোয়ারির ভ্যালাভোলা চরিত্রের জন্য কপিলা তাতে ভাগ বসাতো। বনোয়ারি সিং এসে বাধা দিয়েছিলেন। কপিলা তর্কাতর্কি করেছিল। শেষে বুক ফেটে

কেঁদে ফেলেছিল। সে তার সাধু স্বামীকে হাটবারে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতো। পারতো না। বানারির লোকেরা এসে তুলে নিয়ে গিয়ে বেদিতে বসিয়ে দিত ধর্মধ্বজকে। তারা কড়া পাহারা দিত। পাহাড়ু কিছুদিন সেটা লক্ষ্য করার পর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে করতে আচমকা ছোঁ মেরে পয়সা তুলে নিয়ে পালিয়ে যেত। একদিন তাকে তাড়া করে ধরে ধনেশ পাইক প্রচণ্ড প্রহার করে। কপিলা আহত ছেলেকে নিয়ে বানারিবাবুর কাছে নালিশ করতে যায়। বানারি-বাবু তাকে মিটিমিটি হেসে বলেন, 'আয়, তবে আপস করি!'

কপিলা নিজের জয় ভেবে চোখ মুছে বলে. 'তাই করুন তাহলে।'

তখন বানারিবাবু বলেন, 'আচ্ছেক তোব। তবে তোকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

খর্জুনা অঞ্চলে এই 'সঙ্গে থাকা' কথাটি অত্যন্ত অশ্লীল। এটি রক্ষিতার প্রতিশব্দ। কিন্তু বাঢ় অঞ্চলে অবশ্য রক্ষিতা রাখা অশালীন ছিল না। সকল সম্পন্ন গৃহস্থেব রক্ষিতা থাকা ছিল আভিজাত্যসূচক। কী হিন্দু কী মুসলমান এই সামাজিক প্রথাটি সযত্নে পালন কবতেন। এমনকী সধবা স্ত্রীলোকেরা নিজের স্বামীর মতিগতি লক্ষ্য কবে নিজেবাই বক্ষিতার ব্যবস্থা করে দিতেন। তবে রক্ষিতা একান্তভাবে বেছে নেওয়া হতো বিধবাদের ভেতব থেকেই, যে বিধবাদের জীবনকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার জন্য রাক্ষসীব খিদে, যাঁরা ভাবতেন, ঈশ্বরের দেওয়া শুধু এই বক্তমাংসের শরীরটারই ভেতর এত বেশি স্বর্গের আয়োজন যে তা আস্বাদের জন্য একটা জন্ম নস্যিমাত্র, আরো আরো জন্ম দরকার এবং জীবন দবকার। আর এ কারণেই কোনো স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু ঘটলে তিনি 'রাঁড়ি' হতেন। তিনি হাহাকার কবে বলতেন, 'হায়। এ বয়সেই কেন আমি রাঁড় হলাম—কোন পাপে?' বিধবা রক্ষিতা নির্বাচিতা হলে তাঁর প্রথম কাজ ছিল গ্রামের ধাইবুড়ির কাছে যাওয়া। এই ধাইবুড়ি তাঁকে কাপাসের শেকড়বাটা খাইয়ে দিতেন এবং তাঁর ডিম্বকোষটি পুড়ে যেত। তবে কথা কী, আমাদের মহান ভারতবর্ষেব ঐতিহ্যে যৌনতা কদাপি ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ বস্তু ছিল না। এ ব্যাপারে আমাদের দেবদেবীরাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন মুহুর্মুহু।

কিন্তু কপিলা বিধবা নয়। সে বানারিবাবুর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে বলেছিল, 'ও বাবু! ও বানারিবাবু! তুমি কী বলছ! আমি কি রাঁড়ি—আমার কি পুরুষ বেঁচে নেই? ঝাঁটা মারি তোমার কথায়, বানারিবাবু!'

সবাই দেখেছিল, বাজারের পথ দিয়ে হাটতলায় ফিরে চলেছে কপিলা তার

বালক-পুত্রকে নিয়ে চোখের জল আঁচলে মুছতে মুছতে। লোকেরা বলাবলি করেছিল, এই হাটবারে দেবী কী বলেন শোনা যাবে।

আর দেবী বলেছিলেন, 'বানুকের মাথা থেকে যেদিন লাল ধ্বজাখানা খসে যাবে সেইদিন ধ্বজার মরণ হবে। আর তার বউ রাঁড়ি হয়ে যাবে।'

কলি কসিলাকে সেই খবর দিলে সে দেবীকে 'আঁটকুড়ি মাগি, তুই রাঁড়ি হ' বলে গাল দিয়েছিল। কিন্তু তার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বানুকশীর্ষে কাপড়ের ফালিটা যখন-তখন লক্ষ্য করত। তার অকিঞ্চিৎকর সংসারেও কাজের অন্ত ছিল না। কাজের ভেতর শিরদাঁড়া ধনুকের মতো করে সে ঝুঁকে থাকতো সারাক্ষণ আর হঠাৎ মনে পড়লেই ছিলা ছিঁড়ে সোজা হয়ে যেত। তাকাতো বানুকের চূড়ার দিকে। লাল ফালিটা আছে দেখে ফোঁস করে তার স্বস্তির নিঃশ্বাস পডতো। লাল কাপড়ের ফালিটার সামান্যই টিঁকে ছিল। ঝড়বৃষ্টিতে আর দিনবাতের স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহেও আশ্চর্য দক্ষতায় কোনো প্রাণীর মতোই সেটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এসেছে। কসিলা ভাবতো, কী আশ্চর্য বটে! ওই সামান্য ন্যাতাটুকুই তার স্বামীর আয়ু। তার সাধু স্বামী নিজের আয়ুকে কোন আক্কেলে বানুকের মাথায় মেলাতে গিয়েছিল, সে ভেবেই পেত না। সে বানুকটার কাছে গিয়ে হাত বুলিয়ে দেখতো তার কঠিনতা ও শক্তি। অবাক চোখে চেয়ে সে ভাঙা হুকগুলো দেখতো। এও ভেবে পেত না, কীভাবে বানুকের মাথায় তার পুরুষ উঠে গিয়ে নিজের আয়ু লটকেছিল।

লোকেরাও লক্ষ্য রাখতো যুগপৎ বানুকশীর্ষে এবং কসিলার প্রতি। তারা মনে মনে হেসে ভাবতো, এই জোয়ান মাগির খুব দেমাগ। রোসো, রোসো—আর কতদিন? ধ্বজার ফালি খসে পড়ল বলে। ইহ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আর একটা ভূমিকম্প যদি নাও হয়, তবু ওই দুই তালগাছ উঁচু ইটের থাম তো অমর-অক্ষয় নয়। ওই তো তার গায়ে নোনা ধরে গেছে। ইটগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে। ধ্বজা যদি নিজে থেকে নাও খসে বানুকই তাকে নিয়ে খসে পড়বে। নয়তো কবে পাখ-পাখালিই ঠুকরে খসিয়ে দেবে। সাধু ধ্বজার কোনো গ্রাহ্য নেই। সে বগল বাজিয়ে বেড়ায় আর বলে: 'কপনি কম্বল লোট্টা / খাইলম বেগনভত্তা ॥'

বছর ঘুরে এল। বানুকের মাথার ওপর কত শকুন, দাঁড়কাক, পায়রা, কতরকম পাখ-পাখালি এসে ঘুরে গেল বরাবরকার মতো—কেউ বসার সাহস পেল না। তারা বসলে ধ্বজাটা ঠুকরে খসিয়ে দিত। কিন্তু ধ্বজা পতপত করে ওড়ে। তারা

ভাবে না জানি কী ফাঁদ। ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়।

তারপর একদিন হাটবারে বানারিবাবুর পাইকরা এসে সাধু ধর্মধ্বজকে খুঁজে পায় না। কপিলা বলে, আঁচলের তলায় লুকিয়ে রেখেছি নাকি? বেদির সামনে মানুতে ভক্তজন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘগা বাজাচ্ছে ঢোল, খগা বাজাচ্ছে কাঁসি। ধজা নেই। পাইকরা খুঁজে বেড়ায়। পাত্তা পায় না। বানারিবাবু খবর পেয়ে এসে কপিলাকে শাসাতে থাকেন আর সেই সময় বানুকের মাথা থেকে চিৎকার ভেসে আসে। চাবুকের মতো সেই চিৎকার শপাং করে এসে আছড়ে পড়ে মানুষজনের ওপর। মানুষজন স্তম্ভিত হয়ে যায়। বানুকের মাথায় দাঁড়িয়ে ধজা লম্ফঝম্ফ করছে তার বাবা গুলাইয়ের মতোই। তার হাতে সেই ন্যাতার ফালি। ধজার হাতে ধজা। ধজা চিৎকার করে বলতে থাকে, 'অ্যাই পাঁঠারা! এই দ্যাখ আমি ধজা খসালাম! কপনি কম্বল লোট্টা/খাইলম বেগনভত্তা॥' সে বগল বাজাতে থাকে। লোকেরা রণধ্বনি দেয় মুখে হাত নেড়ে আ বা বা বা বা! ধর্মধ্বজের জটাজুট নড়ে। নীল আকাশের গায়ে তাকে গাঙফড়িঙের মতো দেখায়। তার-পর সে দুহাত শূন্যে তোলে। ন্যাতার ফালিটা উড়ে যেতে থাকে মাঠের দিকে। নিজের পলাতক আয়ুকে পাকড়াও করার জন্য ধর্মধ্বজ আকাশে ঝাঁপ দেয়। সবাই আতঙ্কে চোখ বোজে। তবু অবিকল দেখতে পায় আকাশের দেবী তাকে লুফে নিচ্ছেন। আর তাকে কোলে নিয়ে সেই দেবী উধাও হয়ে যান ক্রমশ বিন্দু থেকে অণু, অণু থেকে পরমাণু হতে হতে, সময় যেখানে সময়হারা সেখানে। আর—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকাম
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি
কুতোঽয়মাগ্নিঃ॥

বাংলায় রেশমশিল্পের স্বর্ণযুগে রেশমকুঠির চলতি নাম ছিল বানককুঠি। হেঁদিপেঁদি জনগণ শব্দদূষণে পটু, অথবা তাঁদের জীবনের কর্মে ঘর্মে কর্দমে ভাষাও স্যাঁতসেঁতে নোংরা হয়ে যায় এবং বানক হয় বানুক। আর বাংলার যে রেশমবস্ত্র পরে রোমসম্রাট দরবার জেল্লাদার করতেন, ইংরেজ কোম্পানি এসে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। শোনা যায়, খর্জুনার বানুকের ভেতর পাঁচশো গাঁট রেশমি থান, দেড়শোটি রেশমতন্তু উৎপাদক পলুপোকার ডালা, বাইশখানি তাঁত ছাই করা হয়। পলুপোকার খাদ্যের জন্য খর্জুনার মাঠে যে অজস্র তুঁতক্ষেত ছিল, তাতে নীল চাষের পত্তন না করা পর্যন্ত বন্দুকের গুড়ুমগুড়ুম আওয়াজ হতে থাকে। শুধু তাই নয়, একটি নাটকে লিখিত প্রমাণ তাঁতীদের প্রতি মেজর মনরোর এই সংলাপ:

'টোমরা টাঁটের নিকট যাইলে হামি টোমাদের হাট কাটিয়া ফেলিবে—সাবটান!' মেদুবাবু কম্পাউণ্ডার মেজর মনরোর পার্ট করে এমন হিড়িক ফেলে দিয়েছিলেন যে খর্জুনার জেলাবোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁর চাকরি যাবার দাখিল। রেলের লুপলাইনে সেই পাকুড়, বেলপাহাড়ি, মতিহারি, সাহেবগঞ্জ, ধুলিয়ান, নিমতিতা—আরো কত জায়গা থেকে তাঁকে হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হতো। তবে এটা সেদিনকার কথা। খর্জুনার বানককুঠি নীলকুঠিতে পরিণত করেন সত্যিই এক মনরো সায়েব, তিনি সেই মেজর মনরো কিনা বলা কঠিন, যিনি আড়াইশো বিদ্রোহী সিপাহীনেতাকে কামানের নলের মুখে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—আর সেটিই ছিল ভারতের প্রথম সিপাহীবিদ্রোহ। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

তো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রঙ, গন্ধ প্রভৃতির মতো উচ্চতাকেও ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন বাংলার ওইসব বানককুঠিতে দূব-দূরান্তের বানকচাষিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আশি/নব্বই-একশো ফুট পর্যন্ত উঁচু ইটের নিরেট থান তৈরি করা হতো। আধুনিক যুগের বহু কলকারখানার ইটের চিমনির মতো সেগুলির গড়ন। খর্জুনাকুঠির সেই উঁচু থামটিই শেষ পর্যন্ত বানুক নামে অভিষিক্ত হয়েছিল। কারণ ওইটিই ছিল বানুকশিল্পের অবশিষ্ট চিহ্ন। স্মৃতিসৌধবৎ দণ্ডায়মান, গম্ভীর, বয়স্ক এক সাক্ষী। একদা তাকে দূর-দূরান্তর থেকে দেখে গ্রামবধূরাও গোপনসুখে শিহরিত হতো, কারণ তাদের পরিশ্রমী ভাতারপুতেরা ওইখানে গিয়েই তঙ্কা লাভ করে। সেই তঙ্কা উদ্বৃত্ত হলে তারা গহনাগাঁটি লাভ করে, শুখা-আকাড়া-মন্বন্তরে কিছু যায় আসে না। কারণ ওইস্থলে গেলেই দাদন মেলে। সঞ্চিত রেশমগুটি কেনার জন্য খর্জুনার কুঠি হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওই সেই হাত। ওই একটি বরাভয়। দিগন্তে ঋজু ও সৌম্যকান্তি ওই এক নগ্ন সাধু। স্পর্ধিত শিবলিঙ্গের মতো শক্তিমান ও পূজ্য।

অতএব বলা যায়, বানুকস্তম্ভটির একটি প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী যুগে নীলকুঠিরও দফারফা হলে কুঞ্জ সিংয়ের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, যিনি নিজেকে মোগল সেনাপতি মান সিংয়ের বংশধর দাবি করতেন, (যে দাবির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতাও থাকা সম্ভব, কারণ খর্জুনার মাঠে মোগল-পাঠানে প্রচণ্ড রক্তারক্তি হয়েছিল), সেই চণ্ডু সিং লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে জমিদারি কেনেন এবং বিধ্বস্ত কুঠির খিলানাকৃতি দরজাওয়ালা কয়েকটি ঘর আর স্তম্ভটিও তার অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই ঘরগুলি হয়ে ওঠে তাঁর কাছারি। চণ্ডু সিংয়ের ছেলে নন্দু সিং, তাঁর

ছেলে কান্তি সিং, তাঁর ছেলে হরি সিং, যিনি কুঞ্জ সিংয়ের বাপ—নারকোলের মালুই হাতে প্রায় ভিক্ষেয় নামতে যাচ্ছিলেন। নিলামের ডুগডুগি বেজে জমিদারির তাবৎ লোপাট, শুধু বসতবাটি আর এই বানুক বাদে। একরাত্রে ধুধু জ্যোৎস্নায় স্তম্ভের শীর্ষে আকাশবিহারিণী এক দেবী ক্লান্তি দূর করতে বসে থাকার সময় হরি সিংয়ের চোখে পড়ে যান। মানুষের চোখে পড়লে দেবদেবীদের স্পর্শ-দোষ ঘটে। তাঁরা পড়েন মুশকিলে। হরি সিং তাঁর গড়ন বা চুল দেখে স্ত্রীলোক ভেবেছিলেন। খুব অবাক হয়ে তাড়িখোর মাতাল হরি সিং চেঁচিয়ে ওঠেন, কোন শালী রে, রাতদুপুরে ঢং কর্তে আমার বানুকে চড়েছে?' তিনি ইট তুলে শাসিয়ে বলেন, 'নাম বলছি মাগি! নৈলে ইটে মাথা চেলিয়ে দেব।' মাতালের হাতের ইট অত উঁচুতে পেঁছায় না। তখন খাপ্পা হয়ে হরি সিং বলেন, 'থাম তবে। বানুক পেছল করে দিই। তখন পেছল বানুক বেয়ে কী করে নামিস দেখব।' এই বলে তিনি কাপড় ফাঁক করে সত্যি স্তম্ভের গায়ে হিসি করতে গেলে দেবী লজ্জায় জিভ কেটে বলেন, 'ওরে! থাম, থাম। হিসি করিসনে বাছা! তাহলে আর স্বগ্‌গে ঢুকতে দেবে না আমাকে। তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস, সেখানে খুঁড়ে দ্যাখ, টাকা পোঁতা আছে।' আসলে বরাবর আকাশপথে এই বানুকটি দেবীর বিশ্রামস্থল। মনুষ্যদেহ নিঃসৃত জলে লাঞ্ছিত হলে সেই সুন্দর স্থলটি দেবীকে খোয়াতে হয়। তো হরি সিং সেই রাতেই বালক পুত্র কুঞ্জ সিংকে ডেকে আনেন। শাবল দিয়ে দুজনে খোঁড়াখুঁড়ি করে বিস্তর টাকাভর্তি পেতলের ঘড়া পান। আর জমিদারি ফেরানো যায়নি। কিন্তু বড়লোকি ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি বানুকটির পুজোও চালু করেছিলেন! কিন্তু চালানো যায়নি। এদেশে জনগণ ঢিপি-ঢাপি দেখলেই মাথা নোয়ান। বানুকটির সে কারণে সহস্রকোটি প্রণাম প্রাপ্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়ই তাঁর শীর্ষে শকুন বসে থাকতে দেখা যেত। কুঞ্জবাবু শেষ পর্যন্ত একটি শিবমন্দির গড়ে দেন। শকুনের ভয়ে সেটি খানিক দূরে গড়া হয়। মন্দিরের শিবলিঙ্গটি প্রচলিত ধরনে যোনিপট্টে ন্যস্ত। কিন্তু তার দৈর্ঘ্য ঈষৎ বেশি। এমন লম্বাটে, ক্রমশ পরিধি হ্রস্বতর হওয়া শিবলিঙ্গ সচরাচর দেখা যায় না। সম্ভবত কুঞ্জ সিংয়ের মাথায় বানুকটি ঢুকে পড়েছিল বালক বয়সেই। তিনিই তার সামনেকার প্রাঙ্গণে হাট পত্তন করেন। তার ফলে বানুকটি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পায়। কারণ দূর-দূরান্ত থেকে সেটকে দেখেই লোকেরা বলাবলি করে, 'ওই খর্জুনোর হাট! ওরে তোরা আয়, আমরা সবাই হাটে যাই।' আবার ওই সুউচ্চ বানুক হয়ে ওঠে

বউঝিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, রেশমযুগের মতোই। বস্তুত এই বাবুক দূর থেকে দেখে বহু হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ওই তাদের রুজিরোজগারের কেন্দ্রস্থল। ঘুঁটেকুড়ুনি ছুঁড়িটা, শাকতোলানি বুড়িটা, মাছধরানি রাঁড়িটাও কোমরে আঁচল জড়িয়ে ডানহাতখানি দোলাতে দোলাতে ছুটতে থাকে বানুকাভিমুখে। কাঁধে বাঁক নিয়ে ছন্দে ছন্দে পা ফেলে দুধারে ক্ষেতের আনাজ ঝুড়িতে ঝুলিয়ে হাটুরেরা ধুকুর ধুকুর হাঁটে। জোলা পিঠে তাঁতের গামছা-মশারির বোঁচকা আটকে ট্যাঙস ট্যাঙস হাঁটতে থাকে। মনোহারিওলা রঙ ঝিলিমিলি দ্রব্যসম্ভার মাথায় নিয়ে চেরা গলায় রসের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে। এইভাবে চলতে থাকে কামার, কুমোর, হরেক বৃত্তিজীবী। টাট্টুর পিঠে শিলনোড়া, জাঁতা, পাথরের তৈজস চাপিয়ে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ি মুল্লুক থেকে চলে আসে গুলাইরা। আসে ধামা-কুলো বেতের গোছা নিয়ে পূর্ণিয়া মুল্লুক থেকে কলাবতীরা। লোহার পাঁউঠি কাঁধের ঝোলায় ঝুলিয়ে তারাজু কর্মকাররা। ফরাক্কার কাছে বেনীপুরে গঙ্গা পেরিয়ে চলে আসে বলদের পিঠে ছালায় ভরা খন্দ নিয়ে মালদহের ব্যাপারীরা। দৃষ্টি দিগন্তে ধূসর ওই স্তম্ভরেখার দিকে পড়তেই প্রত্যেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'ওই বানুক দেখা যায়। ওই তবে খর্জুনোর হাট! চলো, চলো! একটু পা চালিয়ে চলো দিকিনি বাপ।'

সুতরাং ঐতিহ্যবান সুদীর্ঘ সুউচ্চ ওই বানুক, যা গতরজীবী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তাকে বিশ্রামস্থল বেছে নিয়ে আকাশবিহারিণী দেবী তার মধ্যে আরোপিত করেছিলেন স্বর্গীয় মহিমা। সেই মহিমার দশা কিন্তু বহুবার করুণ হয়ে পড়তো। রাঁড়ি যুবতী কসিলা যখন তাকে দেখিয়ে তার বালকপুত্র পাহাড়ুকে বলতো, 'ওই হারামি তোর বাপের জান লিয়েছে, তোর ঠাকুর্দার জান লিয়েছে, ওকে তুই চিনে রাখ্ বাছা', তখন বালক পাহাড়ু বানুকটিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ চিক্কুর ছেড়ে বলতো, 'মা! মা! আমি শালার মাথায় মুতে দিয়ে আসি।' আর কসিলা তাকে দুহাতে জড়িয়ে টেনে ধরত, যেন সেই বালক এক দুর্দান্ত ক্ষিরাজ টাট্টু। পাহাড়ু বানুকটির পবিত্রতা নষ্ট করত তার মূলদেশে নিজের দেহ-নিঃসৃত কঠিন ও তরল পদার্থ দিয়ে। কালক্রমে বানুকটির বিশ হাত দূরে গেলে নাকে কাপড় দিতে হতো। তবে কসিলা মিটিমিটি হাসতো। সে হাসিতে দুঃখও ছিল।...

তাহলে দেখা যায় আকাশের দেবীর সেই পবিত্র বিশ্রামস্তম্ভ কলুষিত করার সাহস দেখিয়েছিল দুজন মানুষ। হরি সিং আর পাহাড়ু। তবে হরি সিংয়ের

মুখের কথায় ভয় পেয়েই দেবী তাকে পোঁতা টাকার হদিস দেন। কিন্তু পাহাড়ু সত্যি সত্যি পবিত্রতা নষ্ট করে ফেললেও দেবী তাকে আমল দেননি। বালক বলেই কি? দেবীরা মায়ের জাত। বাছাদের মলমূত্র ঘাঁটতে হয়, জানেন। সেই দেবীর স্বামী বা সন্তান ছিল কিনা জানা যায় না। শুধু জানা যায়, তিনি ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। ধর্মধ্বজ ছিল অস্পৃশ্য বংশ। তবু তার প্রেমে পড়ে দেবী কী কাণ্ডটাই না করেছিলেন! ভাগ্যিস ধর্মধ্বজ নিজের আয়ুকে অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কসিলাকে নিজের প্রেমিকের জন্য এনে দিয়েছিলেন স্বয়ং দেবীই। এ থেকে বোঝা যায় তাঁকেও রাঢ়ের স্ত্রীলোকের স্বভাবটি পেয়ে বসেছিল। সে যুগে রাঢ়ের সধবারা স্বামীর জন্য নিজেরাই রাঁড়ি সংগ্রহ করে দিতেন। দুঃখের বিষয়, নিরক্ষরা কসিলা দেবী এই ধূর্তামির ব্যাপারটা জানতো না। সে এতটুকু টের পায়নি ওই অমর্ত্যবাসিনী স্ত্রীলোকটি আসলে তার সতীন। এমনকী, হতভাগিনী কসিলা এও জানত না, ওই বানুকশীর্ষ দেবীর প্রিয় বিশ্রামস্থল। বস্তুত সমকালে কোনো ঘটনার তাৎপর্য বোঝা যায় না। দীর্ঘ সময় লেগে যায়। বানুকের দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে ফৈজুল্লা নামে মালদহের এক গ্রাম্যকবি কবিতা রচনা করে যখন লুপলাইনের ট্রেনে ট্রেনে বিক্রি করে বেড়ান, তখন কসিলা কবে মরেহেজে গেছে। পাহাড়ুও বেঁচে নেই। বানুকটি অবশ্য টিঁকে আছে। হাটতলা কেন্দ্র করে বাজার গজিয়ে গেছে। খর্জুনা হয়ে উঠেছে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের ধারে এক বিদ্যুৎ বিভাষিত গ্রাম নগরী। পাঁচশালা যোজনার যুগ এসে গেছে স্বাধীন ভারতে।

তো পাহাড়ুর কথা বলার আগে তার মা কসিলার কথা বলা যাক। ফৈজুল্লা বলেন:

'বানাহারিবাবু মহাশয় অতি বদের গোঁড়া।
বুঢ়া হন টুঢ়া হন স্বভাবেতে ছোঁড়া॥
কহেন ওলো কসিলারানী রূপবতী নারী।
কথা ছিল রাঁড়ি হইলে হবা আমার রাঁড়ি॥
কন্যা বলেন দূর দূর মুয়ে মারি তোর ঝ্যাঁটা।
ঘরে আমার বাঢ়ন্ত সোনার চাঁদ ব্যাটা॥
বাবু বলেন, শুন শুন ওগো সাধুর নারী।
দুধেভাতে থাকবে ব্যাটা হও আমার রাঁড়ি॥...'

বানারিবাবুর জুলুমে কসিলা তার ছেলেকে নিয়ে বানুকতলা ছেড়ে চলে

যায়। সেই সময় বান্থকশীর্ষে গম্ভীর গরগর ধ্বনি, আর খর্জুনার লোকেরা সেই প্রথম উড়োজাহাজ দেখতে শুরু করে। তারা প্রথমে ভেবেছিল রুষ্টাদেবীর হুংকার। পরে কাগজপড়া বাবুমশাইরা বলেন, যুদ্ধ বেধেছে! মহাযুদ্ধ! আর হাপু গাওয়া দল হাপু গাইতে বেরুতো বাড়ি বাড়ি। গাল ফুলিয়ে দুই ফুলন্ত গালে পালাক্রমে থাপ্পড় মেরে তারা আওয়াজ দিত: 'হাপুর দুম! হাপুর দুম! ইল্লে হাপু, উল্লে হাপু! হাপুর দুম! হাপুর দুম!'

একজন স্থরে চ্যাঁচাত: 'ইঙোলণ্ডে পল্লো বোমা!' বাকিরা দুই গাল চাপড়ে বলত: 'হাপুর দুম! হাপুর দুম!' এই ভাবে: 'হিট্‌লাট্ আসছে দ্যাশে—হাপুর দুম! হাপুর দুম!…হিটলাটেতে ফেললে বোমা—ইল্লে হাপু! উল্লে হাপু!…জার্মানিরা জবর ভারি—হাপুর দুম! হাপুর দুম!…পয়সা ফেলো জলদি করে—হাপুর দুম! হাপুর দুম।'

লোকে খুব মজা পেয়েছিল। কিন্তু সেই মজা তারপর মাঠে মারা পড়লো। পর পর দু' বছর অনাবাদ। বান্থকের মাথায় শকুন বসতে লাগল রোজ। লু হাওয়া বইতে লাগল সেবারকার মতো। তারপর মন্বন্তরের কালো ছায়া নেমে এল চারদিকে। এই সেই পঞ্চাশের ভয়ঙ্কর মন্বন্তর, পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের—গ্রামের মানুষের নাড়িভুঁড়ি টেনে যে বের করেছিল।

দেবী তাহলে আবার কুপিতা হয়েছিলেন। সবার মনে পড়ল তখন কসিলার কথা। আর মনে পড়ল সাধু ধর্মধ্বজের কথা, যাকে বেদিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় খর্জুনার মাঠ গর্ভবতী হয়েছিল। সাধু ধর্মধ্বজের ব্যাটার কথা সখেদে বলাবলি করতো তারা। কিন্তু কোথায় সেই পাহাড়ু? পাহাড়ু এলে যদি তাকে দেখে দেবীর দয়া হয়! লোকেরা কংকালটি হয়ে শহরগুলিতে অন্নের খোঁজে যায়। দিনশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে কামনা করে, কখন শুনতে পাবে খর্জুনার বান্থকতলায় পাহাড়ু ফিরে এসেছে। তারা মাথা খুঁড়ে বলতো, 'আয় বাপ পাহাড়ু! ফিরে আয়!' তাদের মাথাকোটা প্রার্থনায় দেবী বিচলিত হয়ে ওঠেন। আর অবশেষে একদিন খবর হয়. পাহাড়ু ফিরেছে! আর খর্জুনার মানুষ যে-যে শহরে নর্দমার ধারে ধুঁকছিল, একে একে সে সেই শহরে সতেজে উঠে দাঁড়ায়। সাড়া পড়ে যায়, 'খর্জুনা চলো! খর্জুনা ফিরে চলো! পাহাড়ু এসেছে। ধজার ব্যাটা ফিরে এসেছে।' পাহাড়ু একা ফিরেছিল। কসিলার মড়া বেনীপুরের আঘাটায় গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। মাকে রেখে সে গিয়েছিল ফ্যানটুকু চাইতে এক গেরস্থ বাড়ি। কচুর পাতায় ফ্যান এনে দ্যাখে কসিলা হাঁ করে সিঁঠিয়ে পড়ে আছে

বটতলায়। তার মুখে মাছি বসছে। পাহাড়ু ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'মলি, মলি, মাগো! একটুকুন দেরি কর্তে পালিনে! বড়ো বোকা মেয়ে তুই মা!' পাহাড়ুর দেহে তার বাপের মতো দেবী ভর করেননি। কিন্তু সে তার বাপেরই ব্যাটা। তার দেহে তার বাপ সাধু ধর্মধ্বজের রক্ত। সে কারণে তার ফিরে আসায় দেবী সেবারের মতোই প্রসন্না হলেন। বর্ষা নেমে বৃষ্টি ঝরল। ব্যাঙ ডাকতে লাগল গ্যাঙোর গ্যাঙ! গ্যাঙোর গ্যাঙ! খর্জুনার মাঠে কাড়ান নামাল। মাঠ হলো গর্ভিনী। মন্বন্তরের কালো ছায়া সরে পৃথিবী হলো শস্য-শালিনী। নবান্নেব রাতে আবার ধুম করে বানুকতলায় গানের আসর বসল। সতেরো বছরের পাহাড়ু আসরের হট্টগোল থামায়। বাবুদের সিগারেট-পান আর চা এনে দেয়। খর্জুনাবাসী তাকে বড়ো ভালোবেসে ফেলেছিল।

আর দেবী বলেছিলেন, 'তার নাম হবে পাহাড়ু। কারণ তার গায়ে থাকবে পাহাড়ের জোর।' পরের বছর বর্ষায় বানুকতলায় মালামোর আসরে পাহাড়ু জানিয়ে দিল, খর্জুনার মাটিতে এক পালোয়ানের আবির্ভাব ঘটেছে। আর দিন, মাস, বছর যায়। পাহাড়ু এলাকা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের মালামোর আসর থেকে মেডেল, গামছা, পেতলের ঘড়া জিতে আনে। বানুকের খিলানাকৃতি দরজার পাশে সে কাদামাটি ছেনে ছোট্ট ঘর বানিয়েছিল। সেই ঘরে সে গলায় চাঁদির তক্তি পরে শুয়ে থাকতো। সে তার শৈশবের কথা ভাবতো। খর্জুনার বহু তরুণ তার অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। তারা তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো চেলাদের মতো। আর বানারিবাবু তখনো বেঁচে। অন্ধ জন্মেজয়ের সম্পত্তির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তাঁর করতলগত। নারায়ণীর মৃত্যুর পর বুড়ো বয়সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বানারিবাবু বিয়ে করেছিলেন এবং এ-পক্ষে একটি মেয়েও জন্মে ছিল। তার নাম ছিল করুণা! বাপের গরবিনী করুণার বড়ো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছিল।

আর এদিকে পাহাড়ুর দাপট দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল। তার জন্মের আগে রাস্তার ধারে হাটতলার প্রান্তে গজিয়ে ওঠা একটি বাজারের অঙ্কুর এতদিনে ডালপালা মেলে প্রকাণ্ড বৃক্ষবৎ। কুলকুল করে লোকজন সেখানে। মোটরগাড়ি, রিকসো, গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ির ভিড় সারাক্ষণ। খর্জুনার মাঠে লুপ-লাইনের হল্ট সেবার পুরো স্টেশন হয়েছে। বাজারে পণ্য আসে, পণ্য চালান যায়। পাহাড়ুর চেলারা গিয়ে দোকানদারদের বলে, 'পাহাড়ুদা পাঠালো। পঞ্চাশটা টাকা ছাড়ো!' দোকানদার গম্ভীর হলে তারা হাত বাড়িয়ে তার ঘেঁটি ধরে। দোকানি দাঁত বের করে বলে, 'দিচ্ছি বাপ,

দিচ্ছি। ফৈক্কত করিসনে'।

পাহাড়ু হয়ে উঠল সন্ত্রাসের প্রতীক। সে চেয়ে পাঠালে টাকা দিতেই হয়। নৈলে নির্মম মার। পুলিশে নালিশ যায়। পুলিশ আসে। ততক্ষণে পাহাড়ু খবর পেয়ে চলে যায় বানারিবাবুর বাড়ি। বানারিবাবু হাটের মালিক। হাটের তোলা তুলতে বা সম্পত্তি নিয়ে মারদাঙ্গায় পাহাড়ু তাঁর ডান হাত। পাহাড়ুর গায়ে পাহাড়ের জোর। সেই জোরে বানারিবাবুর এত জোর যে রাম সিং-লক্ষণ সিং পাটোয়ারিজিদের বংশধর কেঁচো হয়ে গেছে। বানারিবাবু দিনকে রাত্রি করেন, জলকে করেন স্থল। পাহাড়ু তাঁর জোর। আর তাঁর তেজি মেয়ে করুণা তাই পাহাড়ুকেই শুধু ভয় পায়। পাহাড়ু তার দিকে কেমন চোখে কেন তাকিয়ে থাকে। সে সাহস করে একদিন বলে, 'পাহাড়ুদা, তুমি কী ছাখো গো অমন করে? বড্ড ভয় করে আমার!'

পাহাড়ু শ্বাস ফেলে বলে, 'কিছু দেখি না। তুই আমার ছামু থেকে সরে যা দিকিনি ছুঁড়ি! তু বাবুর বিটি, আর আমি আছি নি-জেতে পুরুষ। আমার ঠিঞে তু আসিস না।' সেবার অমাবস্যার রাতে খর্জুনায় কালীপুজোর ধুম। মাতালেরা গান গেয়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে:

'পা টলে টলে খালে পড়ে
এতো ভারি মজার পা॥'

আর বানারিবাবুর বাড়ির পুজোটি বিরাট। যথালগ্নে পাঁঠার গলায় কোপ পড়েছে। ঢাকীরা তুমুল ঢাক বাজাচ্ছে। রাখু কামার খাঁড়ায়, কপালে রক্ত মেখে তাতা-থৈ নৃত্য করছে। ধাপে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে বলিদান দেখছে করুণা। টলতে টলতে পাহাড়ু গিয়ে তার হাত ধরে বলল, 'করুণা! তু আমার বউ আছিস।'

এমনটি তার বাবা ধর্মধ্বজও বলেছিল। কিন্তু তারাজুর মেয়ে কমিলা আর বানারি সিংয়ের মেয়ে করুণা এক নয়। পাহাড়ুর জন্ম অস্পৃশ্যজাতির ঔরসে চর্মকারিণীর গর্ভে। তার কী স্পর্ধা! ঢাক বন্ধ হয়ে গেল। হই-চই পড়ে গেল। ছেলেরা পাহাড়ুকে টানাটানি করে বলল, 'ছিঃ পাহাড়ুদা! কী করছ?' চারদিক থেকে 'মার, মার শালাকে' রব উঠল। কিন্তু কেউ মারতে হাত বাড়াল না। পাহাড়ু গর্জন করে বলল, 'আমার মা বলে গেছে বানারিবাবুর বেটি তোর যেন বউ হয়।'

করুণা আর্তনাদ করছিল। মেয়েরা হুটোপুটি করে পালিয়ে যাচ্ছিল। হুলুস্থুল হট্টগোল চলছিল চারটে উজ্জ্বল হ্যাজাগবাতির তলায়। রাখু কামার রক্তাক্ত

খাঁড়া নামিয়ে ঘাড় কাত করে লাল চোখে দেখছিল পাহাড়ুকে। তার বড়ো ইচ্ছে, পাহাড়ুর গলায় একটা কোপ মারে। কিন্তু তার খাঁড়াটা এত ভারি হয়ে গিয়েছিল যে সে কিছুতেই ওঠাতে পারছিল না।

তারপর ভেতর থেকে বানারিবাবু এসে পড়লেন। ঘরের বারন্দায় বসে ফর্দ মেলাচ্ছিলেন তিনি। ঠাকুরদালানে এসেই এই কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দেখামাত্র হই-হট্টগোল থেমে গেল। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হাত ছাড় পাহাড়ু! তুই মাতাল হয়েছিস। কার গায়ে হাত দিয়েছিস, ভাখ!'

পাহাড়ু বলল, 'শালো! তুমি আমার মাকে রাঁড়ি করব বলেছিলে!'

বানারিবাবু এক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'এখনো বলছি, হাত ছেড়ে দে পাহাড়ু! নেশার ঘোরে আছিস! কার হাত ধরেছিস্ ভালো করে তাকিয়ে ভাখ!'

করুণার মা তারারানীর সেদিন প্রবল জ্বর। মায়ের মন। কী একটা ঘটেছে আঁচ করে, কিংবা জননীর সহজাত বোধে, অথবা ঠাকুরদালানে অন্তত পুজোর ক্ষণে উপস্থিত থাকার নিয়মরক্ষায়—যে জন্য হোক, দেয়াল ধরে টাল সামলে এসে উঁকি মেরেই যা দেখার দেখলেন। আর তখন অন্ধ জন্মেজয় কয়েকবার 'কী হয়েছে' জিজ্ঞাসা করেও জবাব না পেয়ে একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি ছিল। তারারানী সেই ছড়ি কেড়ে নিলে জন্মেজয় শিশুর মতো অস্থির আর্তনাদে বললেন, 'কে? কে? আমি বাড়ি ফিরব কেমন করে? আমার ছড়ি ফেরত দাও!' আর ছড়িটি গিয়ে পড়ল পাহাড়ুর কপালে। কপাল কেটে রক্ত ছিটকে বেরিয়ে এল। তবু হাত ছাড়ল না পাহাড়ু। চিৎকার করে বলল, 'মারছ, মাবো! কিন্তু আমাকে মেরে ফেললেও তোমার মেয়েব হাত ছাড়ব না। ওই শালো বানারি আমার মাকে রাঁড়ি কর্বে বলেছিল। আমার মা বলেছিল, বানারিবাবুর মেয়েকে তু বিয়ে কর্বি।'

আবার ছড়ি পড়ল পাহাড়ুর মুখে। আরো রক্ত ঠিকরে পড়ল। তবু হাত ছাড়ল না পাহাড়ু। করুণার কোমল হাতে যেন দানবের মুঠি। করুণা ধাপে শুয়ে পড়েছে। দানবের নিঃসাড় শরীরে ছড়ির পর ছড়ি এসে পডতে পড়তে ছড়ি ভেঙে গেল! আর জ্বরাচ্ছন্ন তারারানী তীব্র উত্তেজনার চাপে মূর্ছিত হলেন। তখন পাহাড়ু করুণার হাত ছাড়ল। তার রক্তাক্ত মুখে আলোয় ঝলক দিল বাঁকা এক হাসি। তারপর সে চারিদিকে ঘুরে মানুষগুলোর মুখ দেখে নিয়ে ফের গর্জন করে বলল, 'হাত তো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমার মায়ের বিচার হবে না? ওই বানারি শালা আমার মাকে রাঁড়ি করব বলেছিল!' পাহাড়ু

হাহাকার করে উঠল, 'তার বিচার কবি না কোনো শালা ? হুঁ কবি না। ক্যানে —না আমি ছোটজাত। আমার ছোটজাত বাবার মুখে নাকি দেবী বুলি বলতো। সে মাগিই বা কোথায় রইল রে ? সে শালীবেটিও তো তখন বিচার করেনি। আজ বানারিকে দেখে লিলম, তুদেরকে দেখে লিলম। এবার চলল পাহাড়ু সেই হারামজাদিকে দেখতে। সাহস থাকে তো তুরাও দেখবি আয়। ধ্বজার ব্যাটা পাহাড়ু কী করে, দেখবি আয়।'

বলে সে নিজের বুকে দমাদ্দম থাপ্পড় মারল। অমনি যেন মাতালের মাতলামির রস টের পেয়ে লোকেরা মুখবিবরের সামনে হাত নেড়ে রণধ্বনি দিল, 'আ বা বা বাবা বা !'

আর পাহাড়ু সড়াৎ করে নাক ঝেড়ে ফেলল। সেই কান্নাজনিত সিকনিতে রক্ত ছিল। আর সে যখন ঠাকুরদালান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটছিল, তখনো তাকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করছিল আমোদ গেঁড়েরা। মাঝে মাঝে পাহাড়ুকে আরও তাতিয়ে দিতে তারা 'আ বা বা বা'-র রণধ্বনি দিচ্ছিল। মধ্যরাতের বন্ধ বিপণিশ্রেণীর অন্তর্বর্তী গাঢ় অন্ধকার থেকে প্রাণভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দূরে পালালো নিশাচর নেড়িকুকুরগুলো, কারণ মানবেতর প্রাণীরা বায়ুমণ্ডলে বিপদসংকেত টের পায়। বাজার ছাড়িয়ে হাটতলা পেরিয়ে খিলানকরা ভাঙা দরজার ভেতর দিয়ে পাহাড়ু আরো গাঢ় অন্ধকারে মুছে গেলে জনতা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত রণধ্বনি দিতে থাকলো। আকাশের দেবী এবং পৃথিবীর এক ছোটজাতের হুদমুখলো ছোঁড়াকে পরস্পরের দিকে লেলিয়ে দিতে থাকল 'আ বা বা বা বা ! আ বা বা বা বা !'

আর বানুকশীর্ষে কতক্ষণ পরে পাহাড়ুর উরুচাপড়ানো, বগল বাজানো ফত্ ফত্ শব্দ শোনা গেল, যা বাংলার প্রাচীন যুগের যোদ্ধাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের ধ্বনি-সংকেত। তার মেঘ-হুঙ্কারে যুগপৎ ক্রোধ, প্রতিহিংসা, অভিমান ও ক্রন্দন ছিল। আর তার শরীরে ঝিকমিক নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলছিল, যেন পৌরাণিক যোদ্ধার সাজে সাজবার জন্য সে দু-হাতে নক্ষত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে গায়ে পরছিল। বুঝতে না পেরে নিচের জনতা ভাবছিল কার্তিকের অমাবস্যা রাত্রির নির্বোধ জোনাকিরা পাহাড়ুর দেহ ঘিরে জ্বলতে জ্বলতে বানুকের মাথায় পৌঁছে গেছে। তারা পাহাড়ুকে দেখতে পেয়ে আরো জোরে রণধ্বনি দিল। আর তখনই ঈশান কোণে উল্কাপাত ঘটল। দেখামাত্র জনতা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই ! ওই দেবী আসছেন ! দেবী আসছেন !' দেবী এসে গেলেন, তারা মত্ত হয়ে লম্ফঝম্ফ করে রণধ্বনি

দিতে থাকল আবার—'আ বা বা বা! আ বা বা বা!'

মালদহের লোক কবি ফৈজুল্লা মুছলমানি পুঁথির ঢঙে লিখেছেন :

'দেবী বলেন শুন শুন ধর্মধ্বজের ব্যাটা।
সম্পর্কেতে তুমি দেখি মোর হও ব্যাটা॥
ওরে বাছা তোঁহার সঙ্গে না করিব জঙ্গ।
যে-যাহার ঠিঞে মাণিক আয় করি ভঙ্গ॥
পাহাড়ু হাঁক মারে ওরে যাস কুথায় মাগি।
তোঁহার লেগ্যে বাবজান মোর হৈছিল বৈরাগী॥
অভাগিনী মাতাজান পাইলো কত কষ্ট।
তোঁহার সঙ্গে জঙ্গ হবে বাত কহি পষ্ট॥
এই বইল্যে পাহাড়ুমন্দ দু হস্ত বাড়াঞে।
তরাসো পাইল দেবী দূরে সইর্যে যাঞে॥
পালাবি কুথায় বেটি এই বইল্যে বাপা।
শূন্যের মাঝারে মা বইল্যে দিলে লাফা॥'...

চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় মহাসড়কে ফরাক্কার দিকে যেতে হরিমাটি-মাধুনিয়ার পর বায়ুকোণের আকাশে একটি নিরেট ধূসর স্পর্ধা চোখে পড়ে। বাসযাত্রীরা চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'ওই দেখা যায় খর্জুনোর বানুক!' তারা কপালে ও বুকে হাত ঠেকায়। বাস খর্জুনার বাজারে গিয়ে থামলে কেউ কেউ গিয়ে দৌড়ে বানুকটির গোড়ায় পয়সা ও প্রণাম রেখে আসে। বানুকটি আরো কয়েক ডিগ্রি হেলে গেছে। খর্জুনা নারায়ণী উচ্চবিদ্যালয়ের পণ্ডিতমশায় চক্রধারী চক্রবর্তী রোজ দু'বেলা নিকটবর্তী বোর্ডিং থেকে গাডু হাতে কানে পৈতে গুঁজে বেরিয়ে বানুকের পেছনে যান এবং ফেরার সময় গোড়া থেকে একখানি করে ইঁট খসিয়ে আনেন। বোর্ডিংঘর থেকে রান্নাঘরে যাবার পথে খানিকটা জলকাদা পড়ে। ইঁটগুলি সেই তিরিশ ফুট জলকাদার ওপর চমৎকার একফালি সোলিং রচনা করেছে। তবে বোঝা যায় বানুকটি আর 'জাগ্রত' নয়। তার মাথার ফাটলে কচি পিপলতরু উঠেছে। মাথাটি শকুনের বিষ্ঠায় কলঙ্কিত। কাকেরাও অকুতোভয়ে হাড়গোড় বয়ে এনে রাখে। সুতরাং বোঝা যায়, আকাশের দেবী বানুকটিকে পরিত্যাগ করেছেন। আর একটি বলার বিষয় যে, ওই পিপুলতরুটি সাধুর সেই ধ্বজার মতোই বানুকটির আয়ুর ধ্বজা। অবশেষে হতভাগ্য বানুক নিজের আয়ুকেই নিজের মাথায় স্থাপন করেছে।...

জুলেখা

সে আমার হাফপেন্টুল-পরা সময়ের কথা, যখন প্রবীণদের মনে হতো একেকটি দুর্দান্ত দৈত্য এবং দিনের নির্দোষ বৃক্ষলতা সূর্যাস্তের পর নির্দয় রহস্যে ভরে যেত। চারপাশে ঘটতো অনেক সন্দেহজনক ঘটনা। ভয় করতাম অনেক কিছুকেই। আর সেই ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করতো যে, তার নাম ছিল কালু। কালু ছিল একটা কালো রঙের দিশি কুকুর। তার ছোট্ট শরীরটা ছিল যেন একটা সাইরেনযন্ত্র। সে আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে দরমার মুর্গি-চুরি বন্ধ হয়েছিল। তাই প্রথমদিকে তাকে ছি-ঘেন্না করা হলেও পরে সে আদর-যত্ন পেতে শুরু করেছিল।

বাড়ির আয়তনের তুলনায় আমাদের সংসারটা ছিল ছোটই। বাবা-মা, আমি আর জুলেখা নামে একটি মেয়ে, এই চারজন মোটে মানুষ। একটা গাইগোরু, তার বাছুর আর একদঙ্গল মুর্গি—যাদের মাথায় ছড়ি ঘোরানোর জন্য ছিল এক তাগড়াই মোরগ, জুলেখা যার নাম দিয়েছিল বাদশা।

জুলেখার ডাক নাম ছিল জুলি। আমাব সেই হাফপেন্টুলের বয়সে জুলি শাড়ি ধরেছিল। আমার জন্মের পাঁচ বছর আগে জুলির বয়স ছিল মোটে দুই। প্রতি শীতে উত্তরের পদ্মা-এলাকা থেকে যে গরিব মানুষেরা দল বেঁধে রাঢ় এলাকায় ভাত খাওয়ার লোভে ছুটে আসতো, তারা নিজেদের বলতো 'মুসাফির' এবং অন্নের জন্য সেই অভিযানকে তারা বলতো 'সফর'। সেবার মাঘ মাসের এক বৃষ্টির রাতে দলছাড়া হয়ে এক মুসাফির মা ও তার দু-বছরের মেয়ে আমাদের দলিজঘরের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। ভেদবমি হয়ে মা শেষরাতে মারা গেল, আমার দয়ালু দাদু তার সদ্‌গতি করেন। বাচ্চা মেয়েটি আমাদের বাড়িতেই থেকে যায়। অতটুকু মেয়ের চুলের বহর লক্ষ্য করে দাদু তার নাম রাখেন 'জুলেখা'—কেশবতী।

কী অবিশ্বাস্য বিশাল ছিল তার চুল! সেই চুলের বিশালতা আমাকে ভীষণ টানতো। জুলির চুল ধরে আমি ঝোলাঝুলি করতাম। চুলের ভেতর লুকিয়ে পড়ে

মাকে দিতাম ঝুকি। খিড়কির ছোট্ট পুকুরে সেই চুল ধরেই আমি সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। আসলে জুলি হয়ে উঠেছিল আমার ক্রীড়াভূমি। সে ছিল আমার নির্ভরযোগ্য সিঁড়ি। নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে তার চেয়ে ভালো বুড়ি কল্পনা করা যায় না। আর এমনি করে দিনে দিনে তার শরীরের অনেকটা আমার চেনা হয়েছিল। আসলে জুলি ছিল আমার বহুবার পড়া ভূতের গল্পের বই, যার গল্পটা পুরনো হয়ে গেলেও ভূতটা রহস্য দিয়ে বার বার কাছে টানে।

জুলি অনেক গল্প জানতো। তার কাছেই রাতে আমাকে শুতে দেওয়া হতো। জুলি চাপা গলায় গল্প শোনাতো। তবে শর্ত ছিল, আমাকে ক্রমাগত হুঁ দিয়ে যেতে হবে। হুঁ বন্ধ হলেই সে ডাকতো, 'অঞ্জু! ঘুমোলে?' তারপর খোঁচাখুঁচি করে জাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে বলতো, 'না শুনলে আমার কী?' গল্পটা ভালো না লাগলে আমার এই ছিল চালাকি। কিন্তু কোনো-কোনো রাতে টের পেতাম তার গল্প বলার মুডই নেই। খাপছাড়া করে একটুখানি শুনিয়েই আমাকে কাছে টেনে পিঠে হাত রেখে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলতো, 'ঘুমোও। ভোরে ইস্কুলে যেতে পারবে না। তখন ভাবিজি মুখ করবেন।'

সে মাকে বলতো ভাবিজি, বাবাকে বলতো ভাইজান। একরাতে সে আমাকে খুব কাছে টেনে নিলে তার বুকের অদ্ভুত কোমলতা আমাকে চমকে দিয়েছিল। আমি সেই কোমলতা হাত বাড়িয়ে খোঁজার চেষ্টা করতেই সে পিঠে থাপ্পড় মেরে ফিসফিসিয়ে উঠেছিল; 'ছিঃ! আমি তোমার ফুফু (পিসি) হই না?'

আমি তো ভীষণ—ভীষণ অবাক। নাস্তিক বাবার ঔদাসীন্যে আমার খৎনা দিতে দেরি হয়েছিল। খৎনা দেওয়ার পর বালিশে হেলান দিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখা হলে জুলি আমার মুখে সেদ্ধ ডিম গুঁজে দিচ্ছিল আর সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'কেঁদো না! কালই ঘা শুকিয়ে যাবে।' সে আমাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে খিড়কির ঘাটে জলে নামিয়ে হাতের তালুতে জল ঠেলে-ঠেলে ক্ষতস্থানে ঢেউয়ের ঝাপটানি দিত। দ্রুত ঘা সেরে যাওয়ার জন্য এটাই ছিল প্রচলিত পদ্ধতি। মাঝে মাঝে আঁচল টেনে কামড়ে ধরে সে লজ্জারও ভান করতো। সে ঘাটের কাঠে বসে থাকতো এবং কিছুই দেখছে না এমন ভঙ্গিতে হাসি চাপতো। কখনো সে সাবধানে ঘায়ের অবস্থা পরখ করে বলতো, 'আর দুটো দিন।'

ঘা শুকিয়ে সব স্বাভাবিক হয়ে গেলেও সে বলতো, 'লাগছে না তো?' ব্যথা নেই শুনে সে ফোঁস করে যে নিঃশ্বাসটি ফেলেছিল, এতকাল পরেও তা কানে লেগে আছে। তার কাছে আমার লজ্জার কিছু ছিল না।

এই জুলি বাড়ির যে-সব কাজ করতো, তা বাঁদিরাই করে থাকে। কিন্তু তাকে বাড়ির মেয়ের মতোই দেখা হতো। তার বিয়ের বয়স বাড়ছিল দেখে বাবা ভেতর ভেতর পাত্র খুঁজতেন। কোনো পাত্রই পছন্দ হতো না মায়ের। মা ছিলেন খুব খুঁতখুঁতে মেয়ে। বলতেন, 'যে ঘরেই ওর জন্ম হোক, খান্দানি বাড়িতে মানুষ হয়েছে। মুনিশখাটা ঘরে গিয়ে থাকতে পারবে? কষ্ট হবে না?'

বাবা রাগ করে বলতেন, 'কোনো খান্দানি ঘরের ছেলে ওকে বিয়ে করবে? লেখাপড়া জানে?'

মা দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বলতেন, 'শেখাওনি কেন লেখাপড়া? কর্তব্য ছিল না তোমার?'

বাবা দমে গিয়ে বলতেন, 'তুমি শেখালেই পারতে। অল্পস্বল্প একটুখানি হলেও অন্তত—'

মা একই স্বরে বলতেন, 'আমি তোমার সংসার সামলাবো, না কাউকে ক খ —ভারি আমার বলেছ!'

তবে দুজনেই দেখতাম ভীষণ পস্তাতে শুরু করেছিলেন ওকে লেখাপড়া শেখানো হয়নি বলে। জুলেখা ওই সময়টাতে খুব আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাতর চোখে তাকিয়ে সে আঙুল খুঁটতো! একদিন আড়লে আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, 'জানো অঞ্জু, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে? আমি কিন্তু বিয়েই করব না, দেখবে।'

'কেন জুলি?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম ওকে। 'কেন তুমি বিয়ে করবে না?'

জুলি আস্তে বলেছিল, 'আমি কারুর বাড়ি থাকতে পারব না। আমার খুব কষ্ট হবে।'

'বিয়ে কী জুলি?'

জুলিও খুব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, 'তুমি ছাড়া আর কারুর পাশে আমি শুতে পারব না। আমার লজ্জা করবে খুব।'

'বিয়ে করলে পাশে শুতে হয়? সত্যি বলছ?'

'হুঁ।' সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল। 'পাশে শোবার জন্যই তো বিয়ে।'

'কেন পাশে শুতে হয়, জুলি?'

অমনি জুলি আমার পিঠে থাপ্পড় মেরে বলেছিল, 'বলতে নেই। ছিঃ! আমি

তোমার ফুফু হই না ?'

তারপর যত দিন যাচ্ছিল, জুলির বিয়ে কেন্দ্র করে যেন একটা সমস্যা মাথা-চাড়া দিচ্ছিল। প্রায়ই দেখতাম বাবার সঙ্গে মায়ের কথা-কাটাকাটি চলেছে। মা খেপে গিয়ে বলেছেন, 'মেয়েটা তোমার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে তো? ওকে যেমন করে হোক, না তাড়িয়ে শান্তি নেই। নৈলে কোন আক্কেলে তুমি ওই আধবুড়ো ল্যাংড়া-ভ্যাংডা লোকের বাড়ি ঠেলতে চাচ্ছ ?'

বাবা বলেছেন, 'কী মুশকিল! বদরু তো খানদানি ঘরের ছেলে। মিলিটারিতে বাবুর্চির চাকরি করতো। জাপানিদের গুলি লেগে একটা পা জখম হয়েছিল। রীতিমতো সরকারি পেন্সন পাচ্ছে। এদিকে খাসি কেটে হাটবারে ভালোই কামাচ্ছে। তুমি ওকে ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া বলে ঠাট্টা করো না। দুনিয়া চরে খায় বদরুদ্দিন।'

বদরুর একটা পা ছিল না। সে ক্র্যাচে ভর করে হাঁটতো। হাটবারে তাকে দেখতাম রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা নিমগাছের ডালে রক্তাক্ত খাসি ঝুলিয়ে ছাল ছাড়াচ্ছে। তার চেহারায় একটা নিষ্ঠুরতা ছিল। অথচ সে যখন হাসতো, তখন তাকে ভদ্রলোক দেখাতো। সম্ভবত সে যুদ্ধের সময় ফ্রন্টে ছিল এবং যেন নিজেও যুদ্ধ করেছে সেইটাই বোঝাতে চাইতো চেহারায় একখানা নিষ্ঠুরতা চাপিয়ে। বাসে বা ট্রেনে নাকি তাকে ভাড়া দিতে হতো না। বাসে বা ট্রেনে চাপার সময় সে তার মিলিটারি উর্দিটি গায়ে চড়াতো, আর তখন তার সেই বহিরঙ্গের নিষ্ঠুরতাটা যেন ভয়াল হয়ে উঠতো।

এমন একটা লোকের পাশে গিয়ে জুলিকে শুয়ে থাকতে হবে, ভাবতেই রাগে-দুঃখে আমার কান্না পাচ্ছিল। আমি জুলির আরো কাছ ঘেঁষে থাকছিলাম। বাড়ির পেছনে ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে আমাদের বাগান ছিল। জনহীন দুপুরবেলায় সেই বাগানে আমরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতাম। আর কালুও ছিল আমাদের সেই ষড়যন্ত্রের এক শরিক। আমরা দুজনে কালুকে খুব প্ররোচনা দিতাম, বদরুর বাকি পা-খানাও যেন সে কামড়ে খেয়ে ফেলে। কোথাও বদরুকে দেখামাত্র চুপিচুপি কালুকে লেলিয়েও দিয়েছি। কিন্তু কালু হতচ্ছাড়া ওকে যেন প্রাক্তন যোদ্ধা ভেবেই সম্মান জানাতো লেজ নেড়ে। ক্রমশ কালুর ওপর আস্থা খুইয়ে একদিন জুলি মাথার ওপরকার লম্বাটে একটা ডাল দেখিয়ে বলেছিল, 'ল্যাংড়া বদরু আসুক না বিয়ে করতে। এসে দেখবে আমি ওখান থেকে ঝুলছি! এক হাত জিভ বের করে চুল এলিয়ে—' বলে সে সত্যি জিভ বের করে একটা

ভয়ানক ভঙ্গি করেছিল।

আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। বলেছিলাম, 'ধুশ! বিচ্ছিরি দেখাবে।'

'দেখাবেই তো। দেখে বদরুর বিয়ের সাধ ঘুচে যাবে।'

একটু ভেবে বলেছিলাম, 'উঁহু। ওকে বিশ্বাস নেই। তবু বলবে বিয়ে করব।'

জুলি হেসে অস্থির। 'আর কী করে করবে? তখন আমি তো মরে গেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'না, না।' আর জুলি সেই জনহীন দুপুরবেলার বাগানে আমাকে বুকে চেপে নিঃশব্দে কতক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করেছিল। কালু আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যথিতভাবে লেজ নাড়ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে তাকে দেখে মনে হয়েছিল, দৈত্যদের পৃথিবীতে আমার আর জুলির মতো কালুও এত অসহায়!

বাবা আমার কোমলহৃদয়া মাকে যখন অনেকটা নুইয়ে ফেলেছেন, গন্ধে গন্ধে খোঁজ নিতে এসে পড়েছে হুরমতি নামে এক নাচুনি—যার বগলে সবসময় একটা ঢোলক আটকানো, এমনকী পাশের বাড়ির হাতেমের বউ এসে হলুদবাটার জন্য শিলনোড়া চাইছে, সেই সময় একদিন ডাকপিওন একটা পোস্টকার্ড দিয়ে গেল।

বাবা পোস্টকার্ডটা হাতে করে বাড়ি ঢুকে ঘোষণা করলেন, 'ডেপুটি সাহেব আসছেন।' সঙ্গে সঙ্গে একটা হিড়িক পড়ে গেল। মা দৌড়ে গিয়ে পোস্টকার্ডটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রায় চিক্কুর ছাড়লেন, 'ভাইজান আসছেন! ভাইজান আসছেন!' তারপর বড়ো বড়ো চোখে চিঠিটা দম আটকানো ভঙ্গিতে পড়ে নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলেন। 'জুলি! ও জুলি! শিগগির হাসুর মাকে খবর দে! আর শোন, ছোট্টুকে বলে আসবি।' জুলি পা বাড়াতেই ফের চিক্কুর ছাড়লেন, 'অ্যাই বাঁদরমুখী! আরো শোন। পর মেলে দিলে সব কথা না শুনেই।'···

আমার মায়েরা ছিলেন সাত বোন এক ভাই। মা সবার ছোট, আর ভাইটি সবার বড়ো। সেই ভাই ছিলেন ইংরেজ আমলের এক পরাক্রান্ত ডেপুটি। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তাঁর একটাই বাতিক ছিল, পালাক্রমে বোনদের খোঁজখবর নিতে যাওয়া। তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং ছেলেরাও ছিল লায়েক। মেয়েদের পাত্রস্থ করে ফেলেছিলেন জীবনের সুদিনে। তারা দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে বোনদের প্রতি তাঁর স্নেহের মাত্রা ছিল প্রগাঢ় ও বিপুল। ট্রেন থেকে নেমে এলেও যেমন গতিবেগ ঘোচে না, রিটায়ার করার পরও তাঁর দেহমন থেকে তেমনি আমলাতন্ত্রের গতিবেগটি ঘোচেনি। পালে বাঘ পড়ার মতো এসে পড়তেন বাড়িতে। আমার বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার। গ্রামের

স্কুলে ইন্সপেক্টর আসার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি তাঁর ডেপুটি শ্যালককে বাইরে বাইরে ঠাট্টা করলেও ভেতর ভেতর খুব সমীহ করে চলতেন। কারণ ওই জাঁদরেল প্রাক্তন আমলার দরুন গ্রামে তাঁর প্রভাব বাড়তো। বাবা বলতেন বটে, 'নাও! ডেপুটিসাহেব ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছেন', কিন্তু তাঁর ন্যালাভোলা বাড়ি আর অগোছাল সংসারকে ব্যস্তভাবে সাজিয়ে ফেলতে মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতেন।

আমার ডেপুটি মামা 'ডিসিপ্লিনে'র খুব পক্ষপাতী ছিলেন। পান থেকে চুন খসলে চটে যেতেন। তাগড়াই আব ফর্সা পাঠান চেহারার মানুষ। কাঁচা-পাকা একরাশ চুল-দাড়ি। পরনে সাদা ঢোলা পাঞ্জাবি-পাজামা, পায়ে কালো পামসু, হাতে সারাক্ষণ একটা বেতের মোটা ছড়ি। উত্তরোত্তর ধর্ম তাঁকে যত টানছিল, তত শরীব থেকে অসংখ্য চোখ গজিয়ে উঠছিল যেন। ডিসিপ্লিন, পরিচ্ছন্নতা আদব-কায়দা এসব জিনিসের দিকে অসংখ্য সেই চোখে লক্ষ্য রাখতেন এবং প্রত্যেকটির পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন দাঁড় করাতেন।

তিনি আসছেন শুনে আমাদের বাড়িতে সাজো-সাজো রব পড়ে যেত। সদরদরজার চটের পর্দাটা বদলানো হতো। দেয়াল, সিলিং, মেঝে ঝাড়পোঁছ করে তকতকে রাখা হতো। উঠোনের ইঁদারাতলায় তৈজসপত্রের পাহাড় জমিয়ে হাস্নর মা বালি আর ছাই দিয়ে আড়ংধোলাইয়ে লেগে যেত। মা জুলিকে নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাজে নামতেন। মাঝে মাঝে কী করতে হবে, খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। শোবার ঘরের সব দেয়াল ঢেকে ছবি লটকানো মায়ের শখ। পত্রিকা থেকে রঙিন ছবি ছিঁড়ে নিয়ে বাবাকে বাঁধিয়ে আনতে বলতেন শহর থেকে। ডেপুটি ভাইজানের অনেকগুলো ফটোও বাঁধিয়ে এনে জায়গামতো লটকেছিলেন। সেই ঘরে মাকে অন্যরকম দেখাতো। স্বপ্নাচ্ছন্ন এক মুসলিম যুবতী, বাইরের পৃথিবীতে যার পা ফেলা বারণ, সে বাইরের পৃথিবীর রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ অনুভব করার জন্য নিজের ঘরে তাকে প্রতিফলিত করতে চাইতো। সেই মাথাকোটা আকুলতার ছাপ মায়ের চোখে ফুটে উঠতে দেখতাম। ওটাই ছিল তাঁর শ্বাস ফেলার জগৎ। কিন্তু ডেপুটিমামা এলেই ওই জগৎটাকে ফেলে রেখে তাঁকে বেরুতে হতো। ডেপুটিমামার আবির্ভাবে মায়ের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম পরিবর্তনও আমি লক্ষ্য করতাম। গলার স্বর কত খাদে নামানো যায়, আগে থেকে তাই প্র্যাকটিস করতেন। কারণ ডেপুটিমামার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, মুসলিম স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বাড়ির বাইরে পৌঁছুনো বারণ। শাড়িটিও শরিয়ত মতে পরা চাই। তাই প্রচণ্ডভাবে গায়ে জড়ানোর ফলে মায়ের হাঁটা-

চলার অসুবিধে হতো। কিন্তু উপায় নেই। আছাড় খেয়ে পড়লে জুলি হাসি চাপতে পারতো না। তাকে বকতে গিয়ে মাও হেসে ফেলতেন। তবে ওই সময়টাতে মাকে বড়ো সুন্দর দেখাতো। ভক্তিমতী, পরিচ্ছন্ন নম্রস্বভাব আর লাজুক। আমি হঠাৎ হঠাৎ মাকে মুখ তুলে দেখে আর যেন চিনতেই পারতাম না।

আর আমার উদাসীন স্বভাবের বাবা মানুষটিও বদলে যেতেন। পরিষ্কার কাপড়-জামা পরতেন। হাবেভাবে আভিজাত্য ফোটানোর চেষ্টা করতেন। মধুর কণ্ঠস্বরে আমাকে ও জুলিকে তুমি বলে সম্ভাষণ করতেন। আসলে ডেপুটি-মামার জন্য বাড়ি জুড়ে একটা থমথমে পবিত্রতা, ছিমছাম একটা স্নিগ্ধতা ফুটে উঠতো। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখলে পুরনো একতলা জীর্ণ বাড়িটাকে মনে হতো বড়ো গম্ভীর আর সম্ভ্রম-উদ্রেককারী। তাই বার বার বাড়িটাকে তফাত থেকে দেখতে যেতাম এবং মুগ্ধ হতাম।

আমাদের সাদামাটা সংসারকে এভাবে সম্ভ্রান্ত করে তুলতেন ডেপুটিমামা। পাড়া জুড়েও তাঁর আসার আগেই তখন হিড়িক; 'ডিপ্‌টি সাহেব আসছেন! ডিপ্‌টি সাহেব আসছেন!' প্রবীণেরা এসে খবর নিয়ে যেতেন কখন তাঁর শুভ-পদার্পণ ঘটবে। স্টেশনে গোরুর গাড়ি পাঠানোর দায়িত্ব তাঁদেরই কেউ নিতেন। কেউ পাঠিয়ে দিতেন ধামা-ভরা পোলাওয়ের চাল। কেউ দিয়ে যেতেন এক বোয়াম ঘি—এমনকি মোরগ পর্যন্ত।

এসব উপহারসামগ্রী তাদের সেন্টিমেন্ট রক্ষার জন্য এবং ডেপুটি সাহেবের মুখ চেয়েও ফিরিয়ে দেওয়া হতো না। তখন তাঁর সম্ভ্রমের পালিশে সারা মুসলমান পাড়া ঝলমলিয়ে উঠেছে। এর একটা বিশেষ কারণও ছিল। একসময়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঠেলায় ইংরেজ সরকার মফস্বলের আমলাদের তথাকথিত 'গঠনমূলক' কাজে লেলিয়ে দিতেন। ডেপুটিমামার দেহ-মনে যে গতিবেগের কথা বলেছি, এই গঠনমূলক কাজের ব্যাপারটা ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। তবে রিটায়ার করার পর ধর্ম এবং অন্যান্য কারণে তাঁর তৎপরতা একান্তভাবে মুসলিম সমাজমুখী হয়ে ওঠে, যাকে তিনি বলতেন 'কওমি খিদমত' অর্থাৎ জাতির সেবা। আমাদের গ্রামের মুসলিমদের মধ্যে জিন্নাসাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বকে তত বেশি খাওয়ানোর হচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও (কারণ ডেপুটিমামা রাজনীতি অপছন্দ করতেন এবং ইংরেজদেরই ভাবতেন দেশের ত্রাণকর্তা) শেষ পর্যন্ত কওমি রেজারেকশান-গোছের একটা উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। মসজিদে মাইনে-করা মৌলবী রেখে বালক-

বালিকাদের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁরই উপদেশে। ছোটখাট বিবাদের ফয়সালা তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকতো। লোকেরা বলাবলি করতো, 'এবার ডিপ্‌টিসাহেব এলেই গহর আর এরাদুর কাজিয়াটা মিটে যাবে।' কিংবা 'ইনু যে তার গরিব ভাগ্নের হক মেরে খাচ্ছে, সেটারও একটা আস্কারা হয়ে যাবে।' ডেপুটিসাহেব এসে মসজিদে ভাষণ দিয়ে লোকগুলোকে এমন উত্তেজিত করে ফেলতেন যে তারা গঠনমূলক কাজের খোঁজে পিলপিল করে বেরিয়ে পড়তো। ঝুড়ি-কোদাল-কাটারি নিয়ে রাস্তা মেরামতে লেগে যেত। ডোবা-পুকুর থেকে কচুরিপানা সাফ করে ফেলতো। মাঠের ইদগার সংস্কারে মেতে উঠতো। সরকারের কাছে তাদের হয়ে দরবার করারও সুবিধে ছিল তাঁর। আর এসবের ফলে ডেপুটিসাহেব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো গ্রামের লোকেরা ভাবতো, একবার ডেপুটি হলে মানুষ সারাজীবনই ডেপুটি থেকে যায়। জুলি চুপিচুপি আমাকে বলতো, 'জানো অঞ্জু, ডিপ্‌টিভাইজান মেজেস্টেরের হাকিম ছিল ? শুনে আমার তো হাত-পা কাঁপছে তখন থেকে।'

'হাত-পা কাঁপছে কেন ?'

জুলি চোখ বড়ো করে বলতো, 'মেজেস্টরের হাকিম কি যে-সে ?'

হেসে অস্থির হয়ে বলতাম, 'মেজেস্টরের হাকিম কী বলছ তুমি ? মামুজি তো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।'

জুলি আরো ঘাবড়ে গিয়ে বলতো, 'ও মা ! তাই বুঝি ? আমি ভাবি মেজেস্টরের হাকিম !'

জুলির অজ্ঞতা দেখে অবাক হতাম না ! আমার পড়ার বইয়ের পাতা খুলে সে অন্ধের চোখ দিয়ে দেখতো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আটকে যেত আবেগে। একবার একটা ছবির ভেতর সেই প্রথম মানুষের মুখ চিনতে পেরে তার শরীর জুড়ে থরথর আনন্দের উচ্ছ্বাসও আমি দেখেছিলাম। তারপর থেকেই যেন সে মায়ের শোবার ঘরের দেয়ালে মায়ের মতোই একটা পৃথক জগৎ আবিষ্কার করতে শিখেছিল। সুযোগ পেলেই সে আমাকে সাথী করে নিয়ে ওঘরে ঢুকতো। একটার পর একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াতো। আমি বুঝিয়ে দিতে গেলে সে কাঁধে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠতো, 'চুপ করো তো !' তারপর ডেপুটিমামার ছবির সামনে গিয়ে তাঁকে চিনতে পেরেই জিভ কেটে মাথায় কাপড় চড়িয়ে ঘোমটা দেওয়ার ভঙ্গি করতো। এটা মেয়েদের শরিয়তি শালীনতার রীতি।

ডেপুটিমামা এলে তাঁকে জলের গ্লাস, চায়ের কাপপ্লেট পানমশলার রেকাবি

এসব পৌঁছে দিতে হতো জুলিকে। সে প্রচুর ঘোমটা টেনে এবং প্রচণ্ডভাবে শাড়িটাকে শরীরে লেপটে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে এগিয়ে যেত দলিজঘরে। দলিজঘরে বাইরের লোক থাকলে সে দরজার এধারে পর্দার আড়াল থেকে ভিতু-কণ্ঠস্বরে নিয়ে যাওয়া জিনিসটার নাম উচ্চারণ করতো। অথচ ওইসব লোকের সামনে মাথা খুলে অগোছাল শাড়ি পরেই সে ঘোরে।

ডেপুটিমামা অনেকসময় শুনতে পেতেন না কথার খেয়ালে। তখন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হতো আর মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে জিনিসটার নাম আওড়াতে অথবা আস্তে করে কাশতে হতো। তবু ভেতর থেকে সাড়া না এলে সে বিব্রত-মুখে আমাকে খুঁজতো। তখন আমি গিয়ে তার মুশকিল আসান করতাম।

ডেপুটিমামাই প্রথম জুলির বয়সের দিকে বাবা ও মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, 'মেয়েটা বিয়ের লায়েক হয়েছে। আফটার অল পরের মেয়ে। ওকে আর ঘরে রেখো না।' পরের বার এসে জুলিকে দেখে ফের বলেছিলেন, 'এখনো ওর বিয়ে দাওনি? আবদুল্লা! হুস্না! তোমরা আগুন নিয়ে খেলছ। হুঁশিয়ার!'…

জুলি সেই কথা আড়ি পেতে শুনেছিল। তার ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। কিছুদিন পরে কালুর সঙ্গে বাগানে লুকোচুরি খেলছি, জুলি পেয়ারাগাছে ঠেস দিয়ে বুড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কালুর আগে আমি বুড়ি ছোঁয়ামাত্র ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। খাপ্পা হয়ে বললাম, 'ফেলে দিলে আমাকে?'

জুলি গাল ফুলিয়ে বলল, 'ছুঁয়ো না আমাকে। জানো না আমি আগুন, হাতে ফোস্কা পড়বে?'

রাগটা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। এমন মজার কথায় না হেসে পারা যায় না। আমি ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। 'আগুন? নাও—পোড়াও। পোড়াও, পোড়াও আমাকে।' আমি ওর শরীরকে ওতপ্রোতভাবে খামচে টানাটানি করে, এমনকি ওর বুকে ঢুঁ মারার মতো মাথা গুঁজে এবং ওর বিশাল চুল ধরে ঝুলোঝুলি করে বলতে থাকলাম, 'আগুন? আগুন তুমি? বলো আগুন?'

জুলি ধপাস করে পা ছড়িয়ে বসে কেঁদে ফেলল। তখন অপ্রস্তুত হয়ে সরে গেলাম। কালু আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। বৃক্ষতলে এলোচুলে শোকাকিনী জুলির দিকে দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

সে রাতে জুলি কোনো গল্প বলছিল না। উঠোনে একবার কালু সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে ডেকেই চুপ করে গেল। পেছনের তালগাছটায় খড়খড় শব্দ হতেই আমি ভাবলাম, একটা পরী আকাশ পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে তালগাছের মাথায় বিশ্রাম নিতে নেমেছে এবং সেটা টের পেয়েই কালু আস্তে ঘেউ করে উঠেছে। ভয়ে জুলির কাছে ঘেঁষে গেলাম। সে চিত হয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ ঘুরে আমাকে বুকে টেনে নিল।

তো সেবার বসন্তকালে যখন ল্যাংড়া মিলিটারি বদরুর সঙ্গে জুলির বিয়ের কথা মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে এসেছে, সেইসময় ডেপুটিমামার আবির্ভাব ঘটলো।

জুলি যেমন, তেমনি আমিও বুঝতে পেরেছিলাম, জুলির আর উদ্ধারের আশা নেই। বিশেষ করে বদরু সে-বেলা নিজেই এসে খাসির মাংস দিয়ে গেল। তার চেহারার নিষ্ঠুরতাটা ঘষেমেজে কোমল দেখাচ্ছিল। ডেপুটিমামাকে যখন অভ্যর্থনা করে গোরুর গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে, তখন তাকে মিলিটারি পোশাকে দেখে আমি শিউরে উঠলাম। ডেপুটিমামা তাকে চিনতে পেরে বললেন, 'কী বদরুদ্দিন, কেমন আছ?'

বদরু একপায়ে সোজা হয়ে খট করে স্যালুট ঠুকল এবং বলল, 'ভালো আছি স্যার! আপনি ভালো তো?'

দ্রুত আমার মাথায় ভেসে এল বাগানের আমগাছের সেই ডালটার কথা—কিছুদিন থেকে লম্বা ছড়ানো সেই ডাল খুব জ্যান্ত হয়ে জুলিকে খুঁজছিল। সবকিছু ফেলে বাগানে ছুটে গেলাম। ডাকলাম, 'জুলি! জুলি!' কালুও ভয়ার্ত স্বরে একবার ঘেউ করে ডাকল। খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি, জুলি বারান্দার তক্তাপোশে গালিচা বিছোচ্ছে। বাড়ি ঢুকে ডেপুটিমামা আগে ওখানে এসে বসবেন। 'নাশতা-পানি' খাবেন। তারপর যাবেন দলিজঘরে। সেখানে প্রবীণদের ভিড় জমবে। ইজিচেয়ারে বসে তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন ডেপুটিমামা। ছড়িটি পাশে ঠেকা দেওয়া থাকবে।

জুলির চোখে চোখ পড়লে সে একটু হাসল। হাসতে পারল দেখে অবাক লাগছিল। তারপর চমক খেলাম তার কপালে কাচপোকার টিপ দেখে। সেদিন সারা দুপুর খিড়কির পুকুরে তাকে একটা কাচপোকা ধরতে সাহায্য করেছিলাম ভেবে একটু পস্তানিও হলো। আর সে সুন্দর করে চুল বেঁধেছে, গত ইদের ডোরাকাটা শাড়িটা বের করে পরেছে। মায়ের ভঙ্গিতে খোঁপায় ঘোমটা আটকে

রেখেছে (মুসলিম কুমারীদেরও ঘোমটা দেওয়া নিয়ম)। সে কি জানে না ল্যাংড়া মিলিটারিটা সেজেগুজে দলিজঘরের সামনে এসে পৌঁছেছে? আমি ওকে কথাটা জানিয়ে দেব ভাবলাম, কিন্তু সুযোগই পেলাম না। ডেপুটিমামা দরজা গলায় ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকছিলেন, 'অঞ্জু! অঞ্জু কোথা রে?' আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাল্লো মাই বয়! কত বড়োটি হয়ে গেছ তুমি! চেনাই যাচ্ছে না—অ্যাঁ?'

প্রথা অনুসারে এগিয়ে গিয়ে পদচুম্বন করলে মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। এবার মায়ের পালা। মা পদচুম্বন করে উঠেছেন, হঠাৎ আমার পেছন থেকে কালুর সাইরেন শুরু হয়ে গেল। সে এই প্রথম ডেপুটিমামাকে দেখছে।

কালুকে বাবা তাড়া করলেন। কিন্তু তার চেঁচামেচি বন্ধ হলো না। এমনকি আমিও তাকে বকে দিলাম। তবু সে গ্রাহ্য করল না। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে চিক্কুর ছাড়তে থাকল।

ডেপুটিমামার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তখন কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে বারান্দার তক্তাপোশে গালিচায় বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অঞ্জুর কোন ক্লাস হলো এবার?'

'ক্লাস সিক্স।'

'মাশ আল্লাহ্! সাবাস!' ডেপুটিমামা মিটিমিটি হেসে চাপা স্বরে বললেন, 'কুকুরটা কার?'

শুনতে পেয়ে মা ঝটপট বললেন, কারুর না। কোত্থেকে এসে জুটেছে। রাত্তিরে বাড়ি পাহারা দেয় বলে—'

হাত তুলে মাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলো তো অঞ্জু, আমার একটা কুকুর আছে ইংরেজিতে কী?'

ভেবেচিন্তে বললাম, 'মাই হ্যাজ এ ডগ।'

ডেপুটিমামা অট্টহাস্য করে বললেন, 'আবদুল্লা! হুস্না! শোনো তাহলে—মাই হ্যাজ এ ডগ!'

বাবা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'সারাদিন পড়াশোনা নেই—খালি কুকুর নিয়ে খেলা! আই হ্যাভ এ ডগ।'

ডেপুটিমামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আবদুল্লা, তুমি তো আবার এথিস্ট্। খোদাতালা মানো না, নমাজ পড়ো না। তোমাকে বলা ভুল। হুস্না, তুমি শোনো!'

মা ঘোমটা একটু টেনে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'বলুন ভাইজান !'

'ইসলামি শাস্ত্রে আছে, কুকুর পোষা না-জায়েজ (অসিদ্ধ)। বিল্লির ঝুটো বরং পাক, কিন্তু যে-বাড়িতে কুকুর থাকে, সে-বাড়িতে রাতবিরেতে ফেরেশতা (দেবদূত) ঢোকেন না।'

বাবা ফিক করে হেসে বললেন, 'খোদা তো সব দেখতে পান। ইন্সপেকশনে লোক পাঠানোর দরকারটা কী ?'

ডেপুটিমামা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলিনি। তুমি তো নামে মুসলমান, ভেতরে হিন্দু।'

বাবা বললে, 'সে কী ! আমাকে তো এথিস্ট্ বললেন এক্ষুনি ! আবার হিন্দু বানিয়ে দিলেন ?'···

বাবা তাঁর এই ডেপুটি শ্যালকের জন্য গর্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে ছাড়তেন না। তর্কটা অনিবার্যভাবে ইংরেজিতে পৌঁছে যেত। তখন একটা আশ্চর্য আবহাওয়ার সঞ্চার ঘটত বাড়িতে। মা মুখ টিপে হেসে কাজ করে বেড়াতেন, কিন্তু কান থাকতো সেদিকেই। জুলি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো। আমি গর্বিত মুখে লক্ষ্য রাখতাম। বাড়িটাকে আরো সম্ভ্রমে গম্ভীর করে তুলতো ইংরেজি ভাষা। মা মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বলতেন, 'কোন সাহসে লাগতে যাওয়া ? ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—তার সঙ্গে ! একি স্কুলমাস্টারি ?'

তবে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারতাম, একজন প্রাক্তন ডেপুটি আর এক স্কুল মাস্টারের তর্কটা নিছক শ্যালক-ভগ্নীপতির আড্ডাবিলাস। অবশ্য দলিজে যখন এই ব্যাপারটা ঘটতো, তখন সেটা আমাদের পরিবারের গভীরতর খান্দানিরই প্রতীক হতো এবং প্রভাব ফেলতো। লোকেরা হাঁ করে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু স্কুলমাস্টারের নাস্তিক্য সম্পর্কে প্রাক্তন ডেপুটির বিশ্বাস এমন পাকাপোক্ত ছিল যে সেজন্য আমাকেও একবার ভুগতে হয়েছিল। সেবার তর্কের শুরু আমার নাম নিয়ে।

ডেপুটিমামা বলেছিলেন, 'ছেলের নাম তো মরহুম সন্-বাবাজি রেখে গেছেন। তুমি হলে হিন্দু নামই রাখতে।'

বাবা বলেছিলেন, 'ভেবে দেখলে ওটা হিন্দু নামও। অঞ্জুমান আর অংশুমান একই।'

ডেপুটিমামা বাঁকা হেসে বলেছিলেন, 'হুঁ, বেঅকুফের কানে একইরকম শোনাবে বটে!'

বাবা জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাইজান! আমি বলছি শুনুন। অঞ্জুমান ফার্সিতে হলো জ্যোতিষ্ক—শাইনিং স্টার। আর সংস্কৃতে—'

'তোমার মাথা! অঞ্জুমান বা আঞ্জুমান হলো সভা—মজলিশ।'

'আহা, সে তো যোগরূঢ়ার্থে। অঞ্জুমান হলো জ্যোতিষ্ক আর আঞ্জুমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলী।'

'যোগ-ফোগ আমি বুঝি না!'

'না বোঝাটাই তো আপনাদের সমস্যা।' বাবা দুঃখিত মুখে বলেছিলেন। 'ফার্সি অঞ্জুমান আর সংস্কৃত অংশুমান একই শব্দ! অংশুমান মানে—যা অংশু বা কিরণ ছড়ায়। আসলে প্রাচীনযুগে ইরান আর ভারতের লোকেরা একই ভাষায় কথা বলতো। ফার্সিতে যা নমাজ, সংস্কৃতে তাই নমস্।'

ডেপুটিমামা থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আগড়ম-বাগড়ম ছাড়ো! ছেলের খৎনা দিয়েছ?'

মা তো আড়ি পেতে বেড়াতেন। ঝটপট বলেছিলেন, 'কবে দিয়েছি ভাইজান! সে তো পাঁচ বছর বয়সেই।'

'আমাকে দাওয়াত করো নাই!'

'আপনি তো তখন কুমিল্লায় পোস্টেড।'

বাবা বলেছিলে, 'মনে করে দেখুন, চিঠি গিয়েছিল।'

ডেপুটিমামার সন্দেহ কিন্তু ঘোচেনি। সেদিনই দুপুরবেলা দলিজঘরে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। দুপুরের খাওয়ার পর বাড়ি তখন নিঃসাড়। সেদিন ছিল ছুটির দিন। বাবা ভাতঘুম দিচ্ছেন। মা খিড়কির দোরে গিয়ে বসেছেন আর জুলি তাঁর চুলে চিরুনি চালিয়ে উকুন খোঁজার ভান করছে। আমি উঠোনের কোণায় লেবুতলায় একটা খেলা খুঁজছি। এমন সময় দলিজঘর থেকে চাপা গম্ভীর ডাক ভেসে এল, 'অঞ্জু! কাম হেয়া।'

ভেতরে গেলে আবছা আবছা আলোয় ডেপুটিমামা ফিসফিস করে হেসে বললেন, 'তোর সত্যি খৎনা হয়েছে?'

লজ্জায় কাঠ হয়ে বললাম, 'হুঁউ।'

'কাছে আয়।'

যাচ্ছি না দেখে ধমক দিলেন। তখন কাছে গেলাম। ডেপুটিমামা ভুরু কুঁচকে

বললেন, 'ফাঁস না বোতাম ?'

বুঝতে পারছি না দেখে আমার জামা তুলে বললেন, 'ফাঁস!' তারপর একটানে ফিতের ফাঁসটা খুলে আমার হাফপেন্টুল নামিয়ে দিলেন এবং ক্ষুদে জিনিসটাকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'অলরাইট! ফাঁস আটকে ফ্যাল। আর এই নে বখশিস। খেলগে, যা।'

বখশিসটা একটা অবিশ্বাস্য আধুলি এবং আমার হাফপেন্টুলের বয়সে তার প্রচুর দাম। তবে লজ্জায় এ কথা কাউকে বলিনি। জুলি, যার কাছে আমার গোপনীয় কিছু ছিল না, তার কাছেও না।...

ল্যাংড়া-মিলিটারি বদরুর সঙ্গে জুলির বিয়ের কথা চলার সময় ডেপুটিমামা এসে সামান্য একটা প্রাণী কালুকে শত্রু ভেবে বসবেন, কল্পনাও করিনি। কালু ছিল আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। সে আমার সঙ্গে স্কুলেও যেত। যতক্ষণ স্কুলে থাকতাম, তার আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করার ইচ্ছে থাকতো। কিন্তু বোর্ডিংয়ের রান্নাঘরের কাছে আড্ডা দিত যারা, তারা তাকে পছন্দ করতো না। তাড়া করে আমাদের পাড়ায় ঢুকিয়ে রেখে যেত! স্কুল থেকে ফেরার সময় তার সঙ্গে ঠিকই দেখা হয়ে যেত কবরখানার কাছে। বাড়ি ফিরে তাকে না দেখতে পেলে আমি অস্থির হবো, কালু জানতো। আর জুলিও কালুকে ভীষণ ভালোবাসতো। আমি, জুলি ও কালুর একটা পৃথক জগৎ ছিল। সেখানে আমবা তিনজন পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকব না। ডেপুটিমামা এসে যখন ফতোয়া জারি করলেন, কালুকে তাড়াতে হবে, আমার ও জুলির মুখ শুকিয়ে গেল।

আমরা সে-বেলা বাগানে গিয়ে চুপিচুপি পরামর্শ করলাম, কীভাবে কালুকে বাঁচানো যায়। তবে জুলি বলল, 'কথাটা কিন্তু সত্যি। রাত্তিরে কালু চ্যাঁচায় কেন অত, এতদিনে বুঝলাম, জানো অঞ্জু ?'

'কেন, জুলি ? ফেরেশতা আসে বলে ? ফেরেশতা কেমন বলো তো ?'

জুলি জানতো। বলল, 'তোমার বইয়ে লেখা নেই ? শাদা ফিটু কাপড়-পরা। মাথায় শাদা পাগড়ি। আঁধারে জ্বলে যেন।'

'কেন আসে ?' আসলে আমি রাগ করে কথা বলছিলাম। 'আসবার দরকারটা কী ?'

'বাড়ির মানুষ ভালো না মন্দ তাই দেখতে।'

'আমরা তো ভালো।'

'ভালোই তো। আমরা কি ল্যাংড়া হারামির মতো খারাপ? আমরা কি কারুর গলায় ছুরি চালাই?'

খুব অবাক লাগছিল, ডেপুটিমামা আর কালু দুজনেই তাহলে রাতের আগন্তুক ফেরেশতাকে দেখতে পায়, আর কেউ পায় না। পেলে তো কবে সেকথা বলত। মা না, বাবা না, জুলি না, পাশের বাড়ির হাতেম না—এমনকি মৌলবিসাহেবও না। আমাদের বাড়ি ওঁর খাওয়ার পালা পড়লে কালু ওঁকে দেখে চেঁচামেচি করেছে। তবু তো উনি বলেননি কালু রাতের ফেরেশতাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না? ডেপুটিমামার এই অসামান্য ক্ষমতা আমাকে ওঁর সম্পর্কে আরো ভয় পাইয়ে দিল। সেই বয়সে প্রবীণেরা এমনিতেই দৈত্যের মতো উঁচু আর বলবান, ডেপুটি-মামাকে তাঁদের চেয়েও উঁচু আর ক্ষমতাশালী দেখতে পেলাম। জুলি ও আমি ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না কালু বেচারাকে কীভাবে রক্ষা করব।

প্রথম রাতেই ডেপুটিমামা কালুর চিৎকারে খেপে গিয়েছিলেন। সকালে চোখমুখ লাল করে বললেন, 'হারামি কুত্তা সারারাত ঘুমোতে দেয়নি। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হি মাস্ট বি পানিশড্!' তাঁর ইংরেজি গর্জনে বাড়ি গমগম করছিল। আর কালুও কেন কে জানে, ওঁকে দেখে খেপে গিয়েছিল। সারাক্ষণ চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছিলাম না। যতবার তাকে বাগানে ঠেলে দিই, বাড়ি ঘুরে সে দলিজঘরের কাছে যায় আর চিৎকার করে। বেলা বাড়তে বাড়তে দলিজঘরের সমাবেশে ডেপুটিমামার ফরমান জারি হলো। তারপর আঁতকে উঠে দেখলাম, জোয়ানমদ্দ একদঙ্গল লোক পরোয়ানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মা চুপ করে থাকলেন। শুধু বাবা বোকার মতো হেসে বললেন, 'কোনো মানে হয়? ভাইজানের যত বয়স হচ্ছে, তত যেন পাগলামিটা বেড়ে যাচ্ছে। ঘরে ছবি থাকলেও নাকি ফেরেশতা ঢোকে না। তার বেলায় তো উচ্চবাচ্য নেই?' মা অমনি চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'থামো তুমি!'

লোকগুলোর হাতে লাঠি, বল্লম, চটের থলে, প্রকাণ্ড ঝুড়ি পর্যন্ত। আরেকবার দলিজঘরের সামনে কালু চেঁচাবার জন্য গিয়ে পড়তেই তারা হইহই করে তাকে তাড়া করল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। জুলি এসে আমাকে টেনে ঘরে ঢোকাল। আশ্বাস দিয়ে বলল, 'পারবে না। কালু খুব চালাক। ডেপুটি-

সাহেব কদিন আর থাকবেন ? চলে গেলেই কালু বাড়ি ফিরবে দেখো।'

তখন দূর থেকে দৈত্যদের বিকট চিৎকার ভেসে আসছিল। চিৎকার আরো দূরে মিলিয়ে গেলে জুলি আমার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ছিঃ! কাঁদে না! তুমি এখন বড়ো হয়েছ। কাঁদা মানায় না তোমার। এই দ্যাখো না, আমার মাথার সমান হয়েছে তোমার মাথা।' সে আমাব গালে গাল ঠেকিয়ে উচ্চতা দেখাল। তারপর আমাকে অবাক করে আমার গালে চুমু খেল। তারপর সেই আবছা আঁধারে ভরা ঘরে আমার শরীর নিয়ে সে যা সব করতে থাকল, তা তার সান্ত্বনারই প্রকাশ।

তারপর আর কালুকে দেখতে পাইনি। পাড়ায় না, তার প্রিয় ভ্রমণক্ষেত্র কবরখানাতেও না, গ্রামে না—কোথাও না। আমার জীবন থেকে কালু হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো। কেউ আমাকে বলতে চাইত না কালুর কী হলো। কিন্তু শুধু কালু না, পাড়ায় ফেরেশতা ঢুকবে না বলে লোকেরা পাড়ার সব কুকুরের পেছনে লেগেছিল। এভাবে কুকুর-শূন্য হওয়ায় ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে লোকেদের বাড়ি ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বেগতিক দেখে মন্দ লোকেরাও ভালো সাজার চেষ্টা করে থাকবে। শুধু মুর্গি-চোর কিনুর কথা আলাদা। এক-রাতে কিনু এসে মায়ের দরমা থেকে 'বাদশা'কে নিয়ে গেল। বাড়িতে চুপিচুপি হাহাকার পড়ে গেল। বাদশাকে মা তাঁর ডেপুটি ভাইজানের বিদায়-ভোজের জন্যই নাকি রেখেছিলেন, অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরানো তম্বি করার জন্য নয়। জুলি আমাকে আড়ালে বলেছিল, 'এই তো শুরু হলো। আরো কত কী হবে। দেখি না ডিপটিসাহেবের ফেরেশতা কাকে বাঁচায়।'

তবে একথাও ঠিক যে ফেরেশতা বাড়ি ঢোকায় জুলি তাঁকে নালিশ জানানোর সুযোগ পেয়েছিল। আমাকে শুনিয়েই ফিসফিসিয়ে বলতো, 'বাবা ফেরেশতা! আর যার সঙ্গেই হোক, ওই ল্যাংড়াভ্যাংড়ার সঙ্গে যেন আমার বিয়ে না হয়।'

এই শুনতে শুনতে এক রাতে আমি ওকে বলে ফেললাম, 'জুলি! আমি যদি বড়ো হতাম, আমিই তোমাকে বিয়ে করে ফেলতাম।'

শোনামাত্র আমার মুখে হাত চেপে জুলি সেই পুরনো ধুয়ো তুলে বলে উঠল, 'ছিঃ! আমি তোমার ফুফু হই না?'

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিলাম। বদরুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা কেন যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। তাহলে সত্যি কি রাতের ফেরেশতা

ঝাগড়া দিয়েছেন জুলির প্রার্থনায় মন গলে গেছে বলে ?

এবার ডেপুটিমামা অন্যবারের চেয়ে বেশিদিন ধরে আসছেন। গোড়াতেই বলেছি, আমার সেই বয়সে চারপাশে ঘটতো সন্দেহজনক সব ঘটনা, যার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারতাম না। বাড়িতে যেন তেমন কিছু ঘটছিল। মায়ের মুখে থমথমে ভাব। বাবার সঙ্গে ফিসফিস করে কীসব আলোচনা করেন। বাবা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যান। বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটান। মা কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে আস্তে ডাকেন, 'জুলি, শুনে যা।' কিন্তু জুলি কাছে গেলে বলেন, 'থাক। পরে বলব। ভাখ তো, ভাইজান চা-ফা খাবেন নাকি ? আর শোন্ ওঁর গেঞ্জি ময়লা হয়েছে বলছিলেন। চেয়ে নিয়ে আয়।'

এক সন্ধ্যায়, তখন বসন্তকাল, মা নামাজ পড়তে বসেছেন, বাবা গেছেন হিন্দুপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, ডেপুটিমামা গেছেন মসজিদে, আমি পড়তে বসব কি না ভাবছি, জুলি আমার হাত ধরে খিড়কি দিয়ে বাগানে টেনে নিয়ে গেল। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও অঞ্জু! জানো কী হয়েছে ?'

'না তো। কী হয়েছে জুলি ?'

'ভাবিজি তার ভাইজানের সঙ্গে আমার বিয়ে লাগিয়েছে।'

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'মামুজির সঙ্গে ?'

'চুপ, চুপ।' জুলি আমার মুখে হাত চাপল। 'ভাবিজি বলছে, ভালো থাকবি। উনি একা থাকেন। দেখাশোনার কেউ নেই। ডি্‌পটিসাহেবের বউ হবি। মান বাড়বে।'

জুলি ধরা গলায় বলতে থাকল ফের, 'ভাবিজি বলছে, ডিপ্‌টিসাহেবের ছেলেমেয়েরা তো সব পাকিস্তানে আছে। জমিজমার ভাগ নিতে কেউ আসবে না। সব তুই পাবি।' জুলি হু হু করে কেঁদে উঠল। 'সব আমি পাব—ঘরবাড়ি, জমি সম্পত্তি। ছপ্পর খাটে পা ঝুলিয়ে আমি বাঁদির বেটি বেগম সেজে বসে থাকব।'

মা ডাকছিলেন, 'জুলি ! জুলি !' মায়ের কণ্ঠস্বর চাপা এবং স্নেহে কোমল। জুলি চোখ মুছে আস্তে আস্তে চলে গেল। সন্ধ্যার বাগানে আমি একা দাঁড়িয়ে। আমগাছটা থেকে মুকুলের মউমউ গন্ধ অন্ধকারে। সারাদিন যেসব পাখি ডাকাডাকি করে, তারা চুপ করে আছে, যেন কিছু ঘটতে চলেছে। আর যে বৃক্ষলতা এমন অন্ধকারে নির্দয় রহস্যে ভরে ওঠে, তাদের সব রহস্য ফর্দাফাঁই

হয়ে গেছে। তাদের নিষ্ঠুরতাও জুলির ব্যর্থ প্রণয়কামী ল্যাংড়া মিলিটারিটার মতো কোমল হয়ে ভিজে যাচ্ছে—আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। ইচ্ছে করছিল তুমুল চেঁচামেচি করে বলে দিই, 'জুলি আমার। একদিন বড়ো হয়ে আমিই তাকে বিয়ে করব।...

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করলাম, কালু তাহলে ঠিকই চিনেছিল। যে প্রাণী অন্ধকার রাতের ফেরেশতাদের দেখতে পায়, সে দৈত্য চেনে এবং তার পকেটে লুকিয়ে রাখা কালো সিন্দুকটিও টের পায়।

জুলি আমাকে সে-রাতে আদরে আদরে অস্থির করে ফেলছিল। সে আমার গালে ঠোঁট রেখে ফিসফিস করে অনর্গল কথা বলছিল। সে বলছিল, 'শিগগির-শিগগির তুমি বড়ো হয়ে ওঠো। সোনার ছেলেটা! তুমি যদি বড়ো হতে, কে সাহস পেত আমাকে বিয়ে করার?' সে দু-হাতে আমার মুখটা আঁকড়ে ধরে আবেগে ছটফট করে বলছিল, 'ছোটবেলাকার মতো আমার নাক চুষে দাও। আমার গাল কামড়ে খেয়ে ফেলো।' আমি চুপচাপ দেখে সে কাত হয়ে চুল খুলে সেই চুল ছড়িয়ে আমাকে ঢেকে দিতে দিতে বলছিল, 'আমার এই চুলগুলো তুমি কত ভালোবাস! এই নাও, তোমাকে চুল দিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। ফেরেশতা এসে শুধোবে, অঞ্জু কোথায় গেল, তার নাম লিখব খাতায়? আমি বলব, পারো তো খুঁজে নাও। সে কী মজা হবে বলো তো?' তারপর সে আমার মাথাটা টেনে আমাকে চুলের তলায় লুকিয়ে দিল।...

আমার দয়ালু দাদু দু'বছরের অনাথ মেয়েটির বিস্ময়কর চুলের বিশালতায় মুগ্ধ হয়ে তার নাম রেখেছিলেন জুলেখা—কেশবতী।

সেই কেশবতীর চুলে স্বাধীনতার প্রথম সুগন্ধ টের পেয়েছিলাম। যে-সুগন্ধ অবশেষে এক বসন্তকালের বাগানে সন্ধ্যার অন্ধকারকে মাতিয়ে আমার তুচ্ছ একরত্তি জীবনের রন্ধ্র দিয়ে ঢুকে চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শিশিরের ফোঁটার মতো। ভিজিয়ে দিয়েছিল রহস্যের নিষ্ঠুরতাগুলিকে।

জুলির কাছেই পেয়েছিলাম স্বাধীনতার প্রথম সুঘ্রাণ। বলেছিলাম, 'আমাকে বড়ো হতে দাও।'

কিন্তু দৈত্যের মতো পরাক্রান্ত এক প্রাক্তন ডেপুটি প্রথমে কালুকে, পরে জুলিকে আমার জীবন থেকে মুছে দিলে আমি বাকি জীবনের জন্য একলা হয়ে গেলাম।...

ঁতে দাবানল

সেবার শরতে বনকাপাসিতে তিন দিন ধরে বৃষ্টি। বাউরিপাড়ার ক্ষেতমজুর নারাং (নারায়ণ>নারাণ) একদিনের বৃষ্টিতেই বেকার এবং দ্বিতীয় দিন ক্ষুধার্ত হলো। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ঢ্যাঙা, হাল্কা গড়ন, তামাটে রঙ, চৌকো চোয়াল, ছোট চুল, লম্বা নাক, চেরা চোখ, পাঁজরে কাঠি কাঠি দাগ, আর চাঁছা পেট। এই নারাং বাঁজা ডাঙায় ভুঁইফোড় এক তাল গাছের মতো একলা। খুব সহজে তাকে চোখে পড়ে। এই নারাং দুবার দোকলা হবার চেষ্টা করেছিল। প্রথমবার বউটার খাওয়া দেখে দুঃখিত হয়ে নানান অছিলায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার বউটা কম খেত, কিন্তু চাউনিটা ও শরীলটা ছিল ভীষণ পিচ্ছিল এবং পিছলে যাবে যাবে করতে করতেই ছোট্ট স্টেশন বনকাপাসির সিগন্যালম্যান গোবরার সঙ্গে ভাগলো। দু'বারের দুঃখ নারাংকে আর বউমুখো করেনি।

এই বৃষ্টির নাম টিপটিপানি, আবহাওয়ার নাম গাজোল। আকাশ নিভাঁজ মেঘে ঢাকা, হাওয়া নেই। তাই বৃষ্টির ফোঁটা সোজাসুজি পড়ছে। যদি হাওয়া দিত এবং ফোঁটাগুলো একটু কাত হয়ে পড়তো, নারাংয়ের দাওয়াব মাটি অনেকটা ভিজতো, তাহলে এই আবহাওয়ার নাম হতো ডাওব। ডাওর বাড়লে তার নাম ফাঁপি। সে খুব ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর হলেও ফাঁপিতে নারাংয়ের সুদিন। গাছ ভাঙে। সে ডালপালা কুড়োয় এবং রোদ উঠলে বেচতে যায়। ঘর ধসে পড়ে। তাই সে কাজ পায়। আর ডাওরেও নারাংয়ের মন্দ হয় না। পুকুর ভাসাভাসিতে মাছ ধরে বেচে। লোকের গোরু-ছাগলের জন্যে পাতা কেটে দেয় এবং চাল-ডাল পায়। কিন্তু গাজোল—গাজোলে ঝিমঝিম ভাব, আলস্য, যার বউ আছে সে গলা ধরে শুয়ে থাকে। নারাংয়ের নেই !

নারাং স্টেশনে গেল প্রথমে। পর পর দুটো রেলগাড়ি দেখল, মোট পেল না। ছোট লাইনের ছোট গাড়ি। স্টেশন ছোট। একটা মোটে চা-বিড়ির দোকান আছে। পিছনে সামনে ডাইনে ফাঁকা মাঠ। ঝাঁপ ফেলে শুতে গেছে।

স্টেশনবাবুও আস্তে আস্তে কোয়ার্টারে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সিগন্যালম্যান নবা শুয়োরের পাল ডাকিয়ে বউয়ের দিকে কেমন চোখে তাকাল। নারাং সব দেখল।

দুজন যাত্রী নেমেছিল। তারা ছাতার তলায় কথা বলতে বলতে এগোল। নারাং তাদের পিছন-পিছন এসে শুনল খিচুড়ি, মাংস এবং বউয়ের গল্প হচ্ছে। সে আরো মনমরা হয়ে গেল। গায়ে টিপটিপ বৃষ্টি, ভেতরদিকে জরভাব, নাইকুণ্ডলে প্রাচীন খেঁকি কেঁউ কেঁউ করছে, সে মনে মনে বলল—ও কিছু না, ও কিছু না!

গাঁয়ে ফিরে বারোয়ারিতলায় একবার দাঁড়াল নারাং। মাথার ওপর তিন পুরুষের বট। পাকা ফল লাল টুকটুকে, মাটিতে পড়ে ছেৎরে গুঁড়োগুঁড়ো হয়েছে এবং সিমেন্টের চত্বরটা যেন বুড়ো বটেরই গুয়েমুতে একাকার। আর ডালপালার পাখপাখালিরও এই গাজোলজনিত আলস্য, ফলে ঠোকরাতে ঠোঁট ওঠে না। গুম হয়ে বসে আছে, পাখি পাখিনীর পাশে। হায় নারাং, এই গাজোলে তোর কেউ নেই।

নারাং আশা নিয়ে ঘুরে শংকরার কামারশালের দিকে তাকিয়েই আশার মুখে পেচ্ছাপ করে দেয়। চোয়াল আঁটো হয়। মগজ রিরি করে। কারণ কামারের ঝাঁপ বন্ধ, হাপর টানার কাজটুকুও জুটল না, এবং শংকরার যুবতী বউ মাথায় গামছা ঢেকে পা টিপেটিপে পুকুরঘাটে গেল। বউটার দলদলে গতর, পাছা টলছে, ঠোঁটে কী হাসি, এবং সামনাসামনি ঘাটে নেমেই সাঁতার দিতে থাকল।

নারাং দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ পরে সেই বউটি ভিজে কাপড়ের মারাত্মক শব্দ করতে করতে নারাংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ঘুরে কেন ফিক্ করে হেসে যায়। বারোয়ারি বটতলায় অমনি মার মার শব্দে বজ্রপাত হলো।

কাতর নারাং জলতে জলতে সেখপাড়ায় গেল। হৈদর মণ্ডলের ছেলে হৈবর বাড়ির সামনেকার ছোট্ট ফাঁকা জায়গা 'লাছ' (লন) থেকে তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে কাকে যেন ডাকছে। নারাং দেখল, ওপাশের গোয়ালঘরের দেয়ালে হৈবরের বউ শুকনো গোবর-চাপড়ি ছাড়াচ্ছে কাস্তে দিয়ে এবং তার ডাঁটালো হাতের চুড়ি বাজছে, স্তনদুটো ভীষণ দুলছে, পাছা নড়ছে। হৈবর ডাকছে। এখন কি কাজের সময়?

গোরু-ছাগলের জন্যে পাতা লাগবে নাকি আর শুধোন হলো না নারাংয়ের। এ এক আশ্চর্য সময়, এই গাজোল। এখন কিসের কাজ?

'তিনদিনকার গাজোলে
মহিষ খ্যাপে হিজোলে

উকুন খ্যাপে মাথায়
টিকটিকিরা বাতায়…’

পরের লাইন লেখার যোগ্য নয়। আর বড়ো সরল মানুষ বনকাপাসির এই নারাং। লাজুক, অশৌখীন, নীরব শ্রমিক। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারে না। সে তখন মাটিতে চোখ ফেলে এই নৈসর্গিক নাছোড়বান্দা উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে হাঁটতে শুরু করল—দিশাহারা ও ভূতগ্রস্ত।

এরপর যখন সে তাঁতিপাড়ায় ঢুকেছে, আচমকা কার হাতের মাকু বন্ধ হলো। অমনি একটা মেয়েলী খিলখিল হাসি বিদ্যুতের মতো দেয়ালের ওপারে ঝলসে উঠে আবার বজ্রপাত। নারাংয়ের মনে হলো, সে দেখতে পাচ্ছে বাঁজাডাঙার এক ঢ্যাঙা তালগাছের মাথা দাউদাউ জ্বলছে। তারপরই স্তব্ধতা। এবং স্তব্ধতার ওপর বৃষ্টির টিপটিপানি মাকড়সার জাল দিয়ে নারাংয়ের মতো মানুষের বিশাল লজ্জা দ্রুত ঢেকে ফেলছে। চতুর্দিকে ধূসরতা। কিছু চোখে পড়ে না আর। নাকি পড়ে, বাঁজাডাঙার একলা তালগাছের মাথায় দাউদাউ আগুন।

অগত্যা নারাং ফিক করে হাসল। ‘তাঁত বোনাবুনি মাকু চালাচালি… তাঁত বোনাবুনি মাকু চালাচালি…। তাঁতির পাছায় লাল সুতো…তাঁতিনের মাথায় গামছা।’…

আর সেই সময় সল্লা দাইয়ের হাতে নতুন সরাঢাকা হাঁড়ি, হাতে কঞ্চি, কঞ্চি নাড়তে নাড়তে সে চেরা গলায় হাঁক দিচ্ছে: ধুল ফু-উ-ল, ধু-ল-ল ফুল! বাবাবাছারা মায়েরা দিদিরা সোনামুখীরা! সরে সরে যাও, সরে সরে-এ-এ! রাস্তা খাঁ খাঁ সুমসাম। লোকজন থাকলে তো সরবে। আর নারাং, নারাং এখন লোকও নয় জনও নয়। দাউদাউ জ্বলা ঢ্যাঙা তালগাছ। বনকাপাসিতে এই গাজোলে কে জন্মাল, তার ঠাহর নেই।

—ও নারাং, ও মুখপোড়া! বলি, সরবি না মরবি? হাঁক থামিয়ে সল্লা হেসে হেসে বলে। কঞ্চি নাড়ে।

নারাং নড়ে না। কাদায় গোঁজের মতো দাঁড়িয়ে সরলার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কতটুকু পোঁতা আছে, নিজেই বুঝতে পারে না। নিজেকে ওপড়াতে যথাশক্তি টানাটানি করে।

—মিনসের বাওরের ডর নেই! ও মা, আমার কী হবে! সল্লা আবার হাসে। হাসতে হাসতে বলে আবার—নিনেংটে ডাকার আবার বাওর! বাওর (মন্দবায়ু) ছোঁবে না!

নারাং মনে মনে জবাব দেয়—আমি যদি ডাকা, সল্লা ডাকিনী।

কাছে এসে সল্লা দাই কঞ্চিটা মারার ভান করে নিজের কাজে এগোয়। নিজের মনে কথা বলে—কারণ, আধখেপী স্ত্রীলোক! আপনমনে রাস্তায় কথা বলার অভ্যেস আছে। লোক না পেলে গাছের সঙ্গে, ইতর প্রাণীর সঙ্গে, এমনকি আকাশের সঙ্গেও কথা সে বলে। সল্লার (সরলার) অনেক কথা। সল্লা বলতে বলতে যায়: মাস্টারের বউয়ের আর কাজ ছিল না! এই গাজোলেই বিয়োলি। হুঁ, এখন মজা করে কিনা মাস্টার মশায়ের গলা ধরে শুবি। খ্যাপা-খ্যাপতোর (ক্ষিপ্ততার) সময়, এই গাজোল!

এবং সে ফিক ফিক করে হাসে। পিছু ফিরে দেখে না পিছনে বজ্রাহত তালগাছ।

এই সল্লার বয়স বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। রোগা গড়ন। স্তনদুটো চিমসে। ময়লা রঙ। খসখসে চামড়া। সব ঋতুতেই ঘামাচি হয়। ঘুঁটে হাতে আনবাড়ি আগুন আনতে গিয়ে সেই ঘুঁটে দিয়ে গা চুলকোয়। বুক সম্পর্কে প্রচলিত লজ্জা তার নেই। কিন্তু তার মুখখানি সুন্দর। সরু নাক, চেরা চোখ পিঙ্গলবর্ণ, কপাল চওড়া বা টিপ্ কপালী, ঘন কালো চুল আছে মাথায়। দীঘির একবুক জলে সিঙাড়া বা পানিফল তুলতে তুলতে একবার সে এক বাবুবাড়ির নতুন জামাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল, তাইতেই সেই জামাই (রাঢ়ের প্রবাদ বনেদী বাবুরা ভীষণ গাঁজাখোর) রাতদুপুরে সল্লার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আজ অবশ্য সল্লার সেই বয়েস নেই, কিন্তু চাহনি আছে।

এই সল্লা কানে শোনে না, ঠসী। তাই প্রেম নিবেদন করতে হলে আগে ভালভাবে বক্তব্যটা তার কানে ঢুকিয়ে দিতে হয়। নৈলে সে গোলমাল করে।

এই সল্লা নিজেকে বলে, বনকাপাসির ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। নয়তো জাড়ের রেতে এক মালসা আগুন। সে শরীল সম্পর্কে কৃপণ নয়। সে যতীন মাস্টার কিংবা থানার মধু দারোগাকে বুকের ওপর নিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে পারে: আমার আর সেদিন নেই! এই সময় সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং মাস্টার বা দারোগা যেই হোক, হঠাৎ প্রচণ্ড তেঁতো টের পেয়ে নিজের শরীলের প্রতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, কারণ—সত্যি, সরলার আর সেদিন নেই। এত খাটুনির মজুরি কানাকড়ি।

কিন্তু এই খ্যাপা-খ্যাপ্তোর গাজোল, এই দাউদাউ প্রজ্বলন, এইসব নৈসর্গিক উপদ্রব বনকাপাসিতে ঘটে থাকে। অগত্যা তাই সল্লা ঠসীই নিদান।

নারাং সল্লার পিছনে পিছনে চলে আর সল্লা ধুল-ফুলের (আঁতুড়ের আবর্জনা) ঘোষণা দিতে দিতে মাঠে নামে। বৃষ্টি পড়ে ধানের পাতায়, গাছের পাতায়, পাতা থেকে মাটিতে আর জলে—টুপ টাপ, টিপ টাপ, টুপ টাপ…

বাঁজাডাঙার এক কোনায় ফণিমনসা কেয়া কোঙাঝোপ মাদারগাছে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গা। তার নাম ধুলগাড়ি। খরায় মাদারগাছে লাল লাল ফুল ফোটে। বর্ষায় ফোটে সাদা কেয়াফুল। সেখানে জ্যৈষ্ঠে সাপসাপিনী জোড় বাঁধে। গাঁয়ের কত ছোটলোক বাড়ির কিশোরী মেয়ের কুমারীত্ব ঘোচে নির্জন দুপুরবেলায়। চুলে আটকে যায় খোলামকুচি, পিঠে কাঁটার জখম। মধ্যিখানে অজস্র হাঁড়ির টুকরো, বিবর্ণ ন্যাতা। বনকাপাসির অনেক জোড়বাঁধার প্রত্যক্ষ এমন প্রমাণ কোথাও নেই। একটা মানুষ দেখে বলা যায়, কারা জোড় বেঁধেছিল বটে—কিন্তু বিশ্বাস হয় না! মানুষ দেখলেই আর সব ভালো ভালো অজস্র ব্যাপার কি না সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জৈবতাকে বাঁচায়। কিন্তু ধুল-গাড়িতে নারাং শুধু জোড়বাঁধার খেলা দেখে। দেখে দেখে গাজোলের হিজোলে মহিষের মতো খ্যাপে। শিং নাড়তে নাড়তে ধুন্ধুমার উপদ্রব সেই কালো বলশালী মহিষ এগিয়ে আসে আর এগিয়ে আসে। নারাং ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে ডাকে—এ্যাই সল্লা!

বনকাপাসির বড়ো সরল লাজুক অল্পভাষী আর গরীব মানুষ এই নারাং।…

সল্লা ভীষণ চমকে গিয়েছিল। হাঁড়িটা ফেলে সবে ঘুরেছে, নারাং তাকে ধরেছে। এই গাজোলে পরিত্যক্ত ইটভাটার শেয়ালরা হাঁসমুরগি ধরে, ছাগলের টুঁটি কামড়ায়। নারাং ধরেছে।

সল্লার পিঙ্গল চোখ দপ করে জ্বলে উঠেই নেভে।—অ, নারাং মুখপোড়া! তারপরই ব্যাপারটা এত হাস্যকর এত উদ্ভট লাগে তার, সে খিলখিল করে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে ভেঙে যায়, দোলে। তুই-ই। ও মিনসে, তুইও? আমার মরণ! ও নারাং, ই কী রে!

বড়ো সরল লাজুক সাত-চড়ে রা নেই মানুষ, সাতে-পাঁচে না-থাকা নির্জন মানুষ, শুদ্ধ মানুষ নারাং। সল্লা হি হি করে হাসে। তার চুল খসে পড়ে। নারাংয়ের বুকে কিল মারে সকৌতুকে।—ওরে ডাকা! আমার কী হবে রে! তোরও পেটে-পেটে এই ছিল রে! সল্লা লুটিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে।

আবার বলে—ছাড় ছাড়। অশুচি আছি। দীঘিতে ডুবতে যাব। উদিকে মেয়েটা একা আছে। ছাড় নারাং, খেপিস না!

নারং জানে, আস্তে আস্তে কানের কাছে বললে সল্লা শুনতে পায়। এবার সে তাই করে। কাকুতিমিনতি করে বলে—সল্লা সল্লা···ব্যস, আর কী বলতে হবে, ভেবেই পায় না। সল্লা সল্লা করে চলে ক্রমাগত।

সল্লা আপোসের স্বরে বলে—আরেকদিন হবে, আরেকদিন। ছাড় নারাং, ছেড়ে দে। আমি অশুচি আছি রে, তোর দিব্যি। বিশ্বেস না হলে দেখ্ না···

তারপরই সল্লা এক ধাক্কা মারে। কামার্ত নারাং পড়ে যায়। তখন সল্লা হাসতে হাসতে দৌড়ে পালায়। পালাবার সময় তাকে শূন্য বাঁজাডাঙায় গাজোলে এক পেত্নীর মতো দেখায়। আস্তে আস্তে নারাং ওঠে। গায়ে কাদা। চুলে কাদা। লাল চোখে তাকিয়ে সল্লার দৌড়ে যাওয়া দেখে সে। ঠোঁট কামড়ায়। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। দম আটকে যায়। পরিব্যাপ্ত ধূসরতার মধ্যে একলা বজ্রাহত তালগাছ মাথায় আগুন আর ধোঁয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরের হিজোলে খ্যাপাখ্যাপ্তো কালো মহিষ শিং নেড়ে গর্জন করছে। তাঁতি-পাড়ায় আচমকা মাকু বন্ধ হলে খিলখিল হাসি, আর শংকরার বউ থপ থপ ছলাৎ ছলাৎ ভিজে কাপড়ে হাঁটছে, হঠাৎ ফিক করে হেসে যায়, হৈবরের বউয়ের হাতের চুড়ি বাজছে, স্তন দুলছে, পাছা টলছে, বৃষ্টি পড়ছে টুপ টাপ টুপ টাপ টিপ টাপ টিপ টাপ···

রাগে দুঃখে নারাং অস্থির হয়ে গাঁয়ে ফেরে। বড়ো আশা করে সল্লাকে ধরেছিল। সল্লা তো কাকেও ফেরায় না। খোঁড়া ভিখিরি ফৈজু ফকিরকেও এক দুপুরে সল্লার ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিল সে। আর নারাং তো পরিপূর্ণ মানুষ।

নাকি সল্লা তাকে অবহেলা করল? তার শরীলটাকে? হুঁ, সল্লা ভেবেছে, নারাং যদি পুরুষ, তবে তার বউছাড়া জীবন কেন? এই দুর্দিনে ছোটলোকের মেয়েরা ভিক্ষে করে খাচ্ছে। গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে পেটের জ্বালায়। আর নারাংয়ের বউ জোটে না! হুঁ, সল্লা তাই ভেবেছে। ওরে আমার ঢলানি রে! ধানকাটার সময় হোক। তখন নারাং বউ আনবে।

কিন্তু এই গাজোলে! নারাং গভীর দুঃখে ভাবে, ই কী উপদ্রু রে বাবা! এখন কী করি, কোথা যাই! মোন বশ মানে না। ই কী খ্যাপাখ্যাপ্তো কাণ্ড!

অন্যমনস্ক নারাং গাঁয়ে ঢুকে কতকটা হাল ছেড়ে দিয়ে মনে মনে গান গায়:

'দেহর গিদের করিস নে লো
দেহ কি তোর সঙ্গে যাবে।

চিত হয়ে ভাসবি জলে

দাঁড়কয়োতে ঠুকরে খাবে।...'

আর এখন বনকাপাসি কী নির্জন! আরামে ডুবে আছে, সুখে। ঘরে ঘরে যা-জানি কত জোড়বাঁধার খেলা। গাছেরও কোটরে পাখপাখালি পোকামাকড় জড়াজড়ি গতরের ওমে শান্ত। আর নারাং একলা। নারাং জলতে জলতে ঘুরছে।

হঠাৎ নারাং দাঁড়াল। নিমবনের ধারে সল্লার বাড়ি। ভাঙা পাঁচিলের পারে সল্লার ঘর। ঘরের দাওয়ায় একটা বুড়ি ছাগল বাচ্চাকে মাই দিচ্ছে, পায়ের তলায় নাদি। এক ঝাঁক বাচ্চা নিয়ে ধাড়ি একটা মুরগি চুপচাপ বসে আছে। আর চৌকাঠে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সল্লার মেয়ে। বিষ্টি দেখছে। উঠোনে জবা ফুল। লাউয়ের মাচায় লাউ ঝুলছে। মেয়েটার ফর্সা রঙ। পরনে ডুরে শাড়ি। একটু একটু দুলছে। নারাং তাকিয়ে থাকে।

বাড়ির কানাচে ধূর্ত শেয়াল যেমন তাকায়, এই গাজোলের দিনে।

মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল সল্লা। স্বামী ভাত দেয়নি, নাকি ইল্লুতে স্বভাব, আর বোবা। ঠসীর মেয়ে বোবা। দলদলে চেহারা, বড়ো বড়ো চোখ, শাড়ির আঁচল চেবায়, নয়তো বুড়ো আঙুল চোষে, অনর্গল লালা ঝরে কষায়।

নারাং ভাবে।

সল্লা নাকি মেয়ের পেট পুড়িয়ে বাচ্চাটা মেরেছিল, কাপাসের শেকড়-বাটা খাইয়ে দিলে গর্ভপাত হয়। সল্লা দাই, অনেক রকম ওষুধ জানে। উঠোনে কতসব জড়িবুটির গাছ।

নারাং কানের লতি চুলকোয়।

মেয়েটার নাম জ্যোৎস্না। নাকি যতীন মাস্টার দিয়েছিল—মেয়ে এবং নামটাও। নারাংকে হঠাৎ ঘুরে সে দেখতে পায়। কিন্তু তাকিয়েই থাকে। তখন নারাং লম্বা পায়ে এগিয়ে দাওয়ায় ওঠে। তারপর হেসে বলে—ভালো তো? মা কই? তারপর বুঝতে পারছে না কিনা সন্দেহ, তাই হাত নেড়ে নানান ভঙ্গি করে বলতে থাকে—গাজোল লেগেছে দেখছ? চালভাজা খাওয়ার সময়। ভাল্লাগে না? মা আসতে দেরি হবে, কী বলছ? মাস্টারের বাড়ি ছাঁদাপত্তর মিটিয়ে নেবে, তবে তো? ছাগলের পাতা লাগবে না? এনে দেব পাতা? ওই তো জামগাছ আছে। দেব? ও জোছনা, আমার কথা বুঝতে পারছ তো?

কী বোঝে, মেয়েটা হাসে শুধু। লালা ঝরে। চিবুক গলা ও বুকের কাপড়

ভিজে যায়। এখন তার মুখে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল। আঙুলের তলা দিয়ে পাপহীন সরলতারই স্রাব।

বনকাপাসির ফাঁড়িতে কোয়ার্টার নেই। চারদিকে উঁচু বারান্দাওলা বাংলো ঘরের মতো বিশাল ঘর, টিনের চাল। মাটির দেয়ালে পলেস্তারা, আলকাতরা ও চুনকাম আছে। চালের মটকায় দুধারে দুই সিংহ লেজ তুলে দাঁড়িয়ে ভিজছে, মধ্যিখানে বে-খাপচা একটা টিনেরই ত্রিশূল। টিনে কবে আলকাতরা লেপা হয়েছিল। এখন মরচেধরা খয়েরি রঙ। সামনের বারান্দায় বড়ো টেবিল। পিছনে হাজত, একপাশে বড়ো কামরায় সার সার লোহার খাট, সেপাইরা থাকে। অন্যপাশে দুটো কামরায় একটায় এস আই, তিনিই ও সি. মধুবাবু থাকেন, অন্যটায় দুটো খাটে হাবিলদারজী আর এ এস আই গোপেন সরকার। মধুবাবুর ফ্যামিলি সদর থানার কোয়ার্টারে আছে। এ থানায় টহলদারি ডিউটি।

দুপুরের খাওয়ার পর মধুবাবু বারান্দার টেবিলে জরুরি ফাইল সই করছেন। তেওয়ারী সেপাই স্পেশাল মেসেঞ্জার হয়ে কাটোয়া যাবে ফাইলটা নিয়ে। সে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গোপেন জমাদার ঘরে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। হাবিলদারজী ডিউটিতে বাইরে। থানা সুমসাম চুপ। হাজতঘরে শুধু একজন গোরু-চোর কয়েদী। তাকে নিয়ে যাবে তেওয়ারী। শালা বেধড়ক পেঁদানি খেয়ে কবুল করেছে।

এই সময় আচমকা চেরা গলায় চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সল্লা তার বোবা মেয়েটাকে টানতে টানতে হাজির হলো।

আর ঠিক এই সময় বৃষ্টিটাও যেন থেমে গেল। পশ্চিমে মেঘের খানিকটা সিঁদুরে হয়ে গেল, এবং একটা হাল্কা ক্লান্ত আলো গাছপালার মাথা ছুঁতে ছুঁতে বারান্দায় এসে পড়ল। এই অবস্থায় তোলপাড় হয়ে মধু দারোগা খ্যাঁক করে গর্জাল—এ্যাই মাগী! চোওপ!

ভঙ্গি দেখে সল্লার চ্যাঁচানি থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মুখে উঁ উঁ উঁ উঁ চাপা কান্নার সুরটা থামে না। যে বিরাট শোকাবহ ঘটেছে নেপথ্যে, তার আবহসঙ্গীত। বোবা মেয়েটা আঁচল চুষতে চুষতে থানার দেওয়াল ও আসবাব-পত্র, শেষে দারোগাবাবুকে দেখতে থাকে। দারোগা সই করতে করতে আড়-চোখে তাকান। মেয়েটার চোখ সল্লার মতো কটা নয়, স্বাভাবিক। বড়ো চেরা চোখ। যতীন শালারই বা! চোখের তলায় খাঁজে কয়েক কুচি জল আর

কোনায় পিচুটি লেগে আছে। আর, ঠোঁটের নিচে লাল দগদগে একটা রেখা। মধুবাবু ফাইল রেখেই বলেন—লোকটা কে?

পরক্ষণে খেয়াল হয়, দাই মাগীটা ঠসী। তখন ডাকেন—গোপেন! খিক খিক করে হাসেন।—গোপেন! রগড় দেখছ? কী কাণ্ড! এ্যাঁ?

—হ্যাঁ সার, বাদলায় মাথা গরম করেছে কোন বাঞ্চোত! হাসতে হাসতে গোপেন জমাদার বেরোয়।

ফাইল নিয়ে তেওয়ারী বোবা মেয়েটার দিকে তাকাতে তাকাতে হাজতের দিকে চলে গেল। মধুবাবু টেবিলের তলা দিয়ে পা লম্বা করতেই সল্লা গুঁড়ি মেরে তা আঁকড়ে ধরে এবং মাথা ঠোকে।—এ্যাই সল্লা! ছাড়্, ছাড়্ বলছি! নাম বল্!

গোপেন বলে—কানে শোনে না সার!

—এ্যাই ছুঁড়ি, কে ধরেছিল তোকে?

ফের গোপেন বলে—বোবা সার।

—এই মরেছে! বলে অভিজ্ঞ মধু দারোগা এত জোরে হাসেন যে বারান্দার কোনায় খুঁটিতে বাঁধা রামখাসিটা মাথা নেড়ে ঘণ্টা বাজাতে থাকে। তার মাথার কাছে কচি পেয়ারাপাতা ডালসুদ্ধ ঝুলছে।

মধুবাবু পা টেনে ছাড়ান। সল্লা টেবিলের তলায় ফুলে ফুলে কাঁদে, মেঝেয় মুখ। সে বলতে চেষ্টা করে—আমার বাপমরা মেয়েটা দারোগাবাবু, আমার অনাথ বোকাসোকা মেয়ে…মুখে বাক নেই দারোগাবাবু, সরল নিদুষী মেয়েটা…

—জ্বালাতন! মধুবাবু ভুরু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে হাসেন। —গোপেন, মাগীকে ওঠাও তো। নাম জেনে নাও। আর…হঠাৎ চুপ করেন তিনি।

গোপেন সহজেই সল্লার একটা হাত ধরে টেনে বের করে টেবিলের তলা থেকে। সল্লা পুরো দমটা এতক্ষণে ছেড়ে জোরে কেঁদে ওঠে—লিমেগে পাপিষ্ঠি দারোগাবাবু, আপন-পর মা-মাসি বাছাবাছি নেই গো, বনকাপাসির পাঁটা দারোগাবাবু গো…

ফের ভুরু কুঁচকে তাকান মধুবাবু। তাঁকেই গাল দিচ্ছে না তো! পরে ফের খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসেন।

গোপেন ডাইরি খুলে পেনসিল বাগিয়ে ধরে। তারপর পায়ের বুড়ো-আঙুলে সল্লার পাছায় খোঁচা মারে। এই সময় গোরু-চোরের কোমরে দড়ি বেঁধে তেওয়ারী বারান্দা থেকে নেমে যায়। প্রাঙ্গণে আমগাছের তলায় বড়ো পাথর।

তাতে বুটসুদ্ধ একটা পা রেখে লক্ষ্মণ সেপাই লাঠি ঠুকছিল হাঁটুর নিচের পট্টিতে। সে তেওয়ারীর সঙ্গে যাবে। তেওয়ারী গোরু-চোরের দড়ি তার হাতে দিলে সে হ্যাঁচকা টান মারে। গোরু-চোর আছাড় খায়। পাঁজরে লাঠির গুঁতো মেরে তাকে ওঠায় লক্ষ্মণ। জোর গলায় বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলে—শালা! মাগী ধরলেও তো বুঝতাম একটা কম্ম করলি। নয়তো গোরু!

এই কথায় থানাসুদ্ধ রোদ ঝকমক করে মেঘের ফাঁকে। বড়ো ঘর থেকে খাটিয়া ছেড়ে সেপাইরা উঁকি দিতে এসেছে দরজায়। মুখে চাপা হাসি। লক্ষ্মণ আর তেওয়ারীজী গোরু-চোর ও ফাইল নিয়ে চারা খেজুরগাছের আড়ালে রাস্তায় নেমেছে। মধুবাবু পা দোলান। বোবা মেয়েটির কাপড়ের তলায় এভিডেন্স খুঁজতে পেলে আর কিছু চায় না কলম। ডিরেক্ট এভিডেন্স। আনমনে দারোগা বলেন—ভুজঙ্গ ডাক্তারকে ডাকতে হবে।

ওদিকে গোপেন সল্লার কানের কাছে ঝুঁকে বলে—কে, কে?

সল্লা পিঙ্গল চোখে একবার মেয়েকে দেখে ফুঁপিয়ে বলে—কে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কে?

এবার সল্লা মেয়ের সঙ্গে বোবার ভাষায় ভঙ্গি করে। মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকায় আর কাপড় চোষে। সল্লা কাঁদতে কাঁদতে বলে—মুখে বাক নেই, বলতে পারে না গো, হতভাগীর মরণ নেই। কে সব্বোনাশ করলে গো! এই গাজোলে কার মাথায় চিংরি পোকা (শ্রীহরি নামে পোকা) কামড়ালে গো!

বিকটমূর্তি গোপেন ধমকায়—চোওপ্? বিনিনামে মামলা হয় না!

সেই রুদ্র চাহনি দেখেই সল্লা ভড়কে কান্না থামায়। চোখ নাক গাল মুছে পা ছড়িয়ে বসে। শান্ত স্বরে বলতে থাকে—যতীন মাস্টারের বউটা বিয়োল। আঁতুড়ের কাজ সারতে মাঠে গেলাম। তা'পরে দীঘিতে ডুব দিলাম। মাস্টারের বাড়ি গেলাম। বললে, চাট্টি খেয়ে যাও—বেলা গড়িয়েছে। খেলাম। মেয়ের জন্যে একথালা ভাত দিলে, তাও নিলাম। তিন কাঠা চাল দিলে। পাঁচসিকে পয়সা দিলে। তাই সব নিয়ে ঘরে গেলাম। যেয়ে দেখি, মেয়ে আমার…ও দারোগাবাবু গো! আমার লিদুষী বাপহারা দুধের বাচ্চা গো!

আবার কেঁদে ওঠে সে। মধুবাবু হাই তুলে ওঠেন।—মাগীকে সামলাও গোপেন। নামটা জেনে নাও। ইয়ে—আমি এট্টুকুন গড়িয়ে নিই। যা হয় কোরো।

তিনি পাশের ঘরে গেলে গোপেন সল্লার কানের কাছে মুখ এনে বলে—নাম

বল্ না, নাম।

—হ্যাঁ, নাম।…গোপেন আঙুল দেখায়।—রেপ কেস। ছ' বচ্ছর।

সল্লা মাথা নাড়ে। দুবার নেড়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে লাফ দেয়। মেয়ের চুল ধরে গর্জায়—অত করে সাধছি, লোকটা কে চিনিস না হারামজাদী? তবু মুখে রা খুলল না—এত বড়টা কাণ্ড?

বলেই ঠাস করে এক চড়। মেয়ে মুখ ঘোরায়। আর সল্লার আঁচল থেকে তক্ষুনি কয়েকটা ডিম পড়ে ভেঙে যায়। থলথলে সাদা ও লাল হলুদ তরল জিনিসগুলো সিমেন্টের কালো মেঝেকে অশ্লীল করে ফেলে। গোপেন ক্ষেপে গিয়ে চেঁচায়—শালী ঘুষ দেবে! ঘুষের পিণ্ডি এনেছে।

সেপাইরা হো হো করে হাসে। সল্লা অপ্রস্তুত হয়ে মেয়ের চুল ছেড়ে দেয়। এবং সেই তরল জিনিসগুলো হন্তদন্ত হাতের চেটোয় তুলে আঁচলে রাখে। কাপড়টা পুরু, ময়লায় জমাট। ফুলে ওঠে।

যতটা পারে তুলে নিয়ে সে গোপেনের দিকে করুণ মুখে তাকায়। গোপেন আবার হাসছিল। আবার কানের কাছে ঝুঁকে বলে—কী করে বুঝলি মেয়েকে নষ্ট করেছে? এঁ্যা?

—মেয়ে যে সব দেখাল ছোটবাবু! ইশারা করে সব বললে!

—অ। তা, লোকটা কে?

—ইশারায় বলছে। মাথায় ঢ্যাঙা, আঙুলের মতো পাটকাঠি। কেমন করে এল, কেমন কী করল—কেমন করে পা ফেলে পালাল, তাও বলছে। বলছে, হাঁটু অব্দি কাপড় পরা।

—হুঁ, তোর কাকে সন্দেহ শুনি?

সল্লা তাকায়। মুখে দ্বিধার ভাব। ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকে। সরু সরু সাদা দাঁত দেখা যায়। সে আস্তে বলে—কাকে সন্দ করি বনকাপাসিতে? অমন লোক তো কত আছে ছোটবাবু! কিন্তুক…

—হুঁ?

সল্লা হঠাৎ জোরে মাথা দোলায়। বিড়বিড় করে বলে—না, না, না।

—এ্যাই সল্লা।

—উঁ?

—কী বলছিস?

সল্লা ফিসফিস করে বলে—ছোটবাবু, ধুলগাড়িতে ধুলফুল ফেলতে গেলাম।

তখন···তখন ছোটবাবু, বাউরিপাড়ার নারাং আমাকে···আমার হাত ধরেছিল।

—নারাং বাউরি! বলিস কী?

—হাত ধরেছিল। ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেলাম। আর পিছু ফিরে দেখিনি। আমার বড্ড ভয় হয়েছিল, ছোটবাবু! মনে ভাবি এখন—নারাংই বা···

গোপেন সোজা হয়ে বসে।—কাশিম! অনাদি!

অনাদি সেপাই হাই তুলে বলে—স্যার!

—তোমরা দুজনে যাও। শালাকে নিয়ে এসো।

গোপেন ডাইরি লিখতে শুরু করে। সন্ধ্যা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে শুকনো শুগলি চোখে। একহাতে ধরা আঁচলে ডিম—এতক্ষণে রস চুঁইয়ে উরুর মধ্যে পড়ছে।···

সন্ধ্যার মুখে আবার টিপটিপানি শুরু হয়েছে। ঝোপেঝাড়ে পোকামাকড় ডাকছে! জোনাকি জ্বলছে থোকা থোকা। অদ্ভুত বাজনার মতো ট্রেন গেল স্টেশন ছেড়ে। কাজিপাড়ার মসজিদের মাথায় চড়ে নইম সেখ আজান দিল। হরিহর রায়ের সিংহবাহিনী মন্দিরে ঘণ্টা বেজে আরতি হতে থাকল। ভাঙা ফুটো দালান, আর সারানো হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খিড়কির দিকে গভীর ডোবা আছে। তার পাশে বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল। ঘণ্টা বাজলে জঙ্গলের বেলতলায় চকচকে মাটির বেদীতে মাটির সরায় ভাত-তরকারি রেখে আসেন গিন্নিমা। একটা শেয়াল—শেয়ালরূপী দেবতা এসে রোজ খেয়ে যায়। যেদিন না খায়, বাড়ির মুখ শুকিয়ে যায়। দুপুর রাতে দালানের কার্নিস থেকে চুনবালি খসে পড়ে। ছেলেপুলের কাসি বাড়ে। রায়বাবুর বাত কটকট করে।

ভাতের সরা আর গামলায় জল রেখে প্রণাম করে গিন্নিমা তাড়াতাড়ি চলে যেতেই নারাং হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশবন থেকে বেরুল। ভিজে বাঁশপাতায় খসখস শব্দ উঠল। বেদিটা গাজোলে কিনারায় ধসেছে কিছুটা। নারাং হাঁটু দুমড়ে জানোয়ারের মতোই চবচব শব্দে ভাত খায়। ডাল ভাত মাছভাজা তরকারি সব রকম। তারপর জল খায়। গলার কাছে জ্বালা, বুকে জ্বালা, ঠোঁটে নুনলঙ্কা ঠেকতেই হু হু জ্বলে যায়। অনেকটা কেটেছে। মানুষের দাঁতে নাকি বিষ থাকে। ঘা বিষিয়ে মরে যাবে না তো নারাং?

জল খেয়ে ঢেকুর তুলে সে চাপা আঃ উচ্চারণ করে। একটুখানি বসে থাকে ভিজে ঘাসের ওপর। তারপর চুপিচুপি বাঁশবনে গিয়ে ঢোকে।

বাঁশের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। পোকামাকড় ডাকে। জোনাকি জ্বলে। নারাং

চুপচাপ বসে থাকে। আস্তে, ফের চুপিচুপি বলে—আঃ! কোথায় শেয়াল ডেকে ওঠে, প্রথম প্রহর শুরু। পেঁচা ডাকে তিনবার ক্র্যাও ক্র্যাও ক্র্যাও! বাঁশের বনে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ—অন্যমনস্ক হাওয়া এল এতক্ষণে। রাতের গানের মধ্যে নারাং বসে থাকে, আসরের ভিড়ে লুকিয়ে। ছোট্ট ঢেকুর ওঠে আবার। আবার সে গোপনে বলে—আঃ!

কতক্ষণ পরে সে বেরিয়ে পড়ে। ঘরে ফিরতে সাহস হয় না। ভয় এবং লজ্জা। নিজের ঘরকেও এত লজ্জা এখন! এত লজ্জা করে বনকাপাসিকে—তাই জঙ্গল ও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ানো। বড়ো সরল নিদুষী মানুষ ছিল নারাং। মুখ তুলে কথা বলতেই পারতো না। গতর ঘামিয়ে খাটতো। অল্প কথায় জবাব দিত প্রশ্নের। সেই নারাং!

অন্যমনস্ক নারাং আনাচে-কানাচে ঘুরে, কী ভেবে সল্লার বাড়ির কাছে যায়। আঃ ছি ছি ছি! বুক কেমন করে তার। বার বার জিভ কাটে আর মাথা দোলায়। আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ভেসে আসে সল্লার কান্না। সুর ধরে দাই মেয়েটি কাঁদছে।—আমার বোকাসোকা বাপহারা কচি মেয়ের এই সব্বোনাশ করে গেল রে! ওরে আমার দুধের মেয়ের গায়ে হাত দিতে মাথায় বাজ পড়ল না রে!…

নারাং মাথা দোলায়। পড়েছিল সল্লা, বজ্রঘাত হয়েছিল। আর শরীল, শরীল বড়ো গাণ্ডার! ই শরীল কিছু বাছে না সল্লা, বিষম উপদ্রু! বড়ো জ্বালা রে!…

—কে?

—আমি নারাং হুজুর, নারাং বাউরি।

—গোপেন! শালা এসেছে! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

থানার বারান্দায় হ্যাজাগ জ্বলছে। মধু দারোগা আলো চুরমার করে হাসেন। গোপেন দৌড়ে বেরোয়। অনাদি আর কাশিম সেপাই হয়রান হয়ে এসে তাস খেলতে বসেছিল। তারাও ছুটে আসে। এসেই বারান্দা থেকে লাফ দেয়।

নারাং ধরা গলায় বলে—আমার এট্টা কথা ছিল হুজুর।

আর কথা! অনাদির চড় তার কষার টাটকা ঘায়ে এবং কাশিমের বেটনের গুঁতো পাঁজরে, নারাং ওঁক করে পড়ে যায়।

পড়ে থেকেই সে করজোড়ে বলে—আমার এট্টা কথা…

চ্যাংদোলা করে তাকে তুলে আনে ওরা। দারোগা বলেন—শালার কাপড়টা আগে দেখে নাও কাশিম। এভিডেন্স! আর···ইয়ে, যা সব করার করো, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

নারাংয়ের কাপড় দেখাদেখি হয়। কাশিম বলে—বিষ্টি সার। তার ওপর সেই দুপুরবেলা—এখন সাতটা বাজে প্রায়। কোনো চিহ্ন নেই।

গোপেন বলে—রঘুবীরকে ডাকো। তোমাদের কম্ম নয়। তারপর আচমকা হিংস্র হয়ে চেঁচায়—অশ্লীল শব্দ।···একটা বোবা মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে। শালা পাঁটার পাঁটা! দাও শালাকে ব্যাবাক খাসি কইরা।

হাজতের ফাঁকা ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে নারাং। দাঁতে দাঁত চাপে। শরীল বিষম গাণ্ডার! হায় শরীল! তার সেই শরীল নিয়ে খেলা করে আইন। নারাংয়ের বজ্রাহত ঝলসানো চোখের কালো রঙ ফেটে গাজোলের টিপটিপ বৃষ্টির ফোঁটা অনর্গল টুপ টাপ টুপ টিপ টাপ, এবং বাইরেও।···

লালীর জন্য

'এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকেছিল।'

দয়াময় এমন করে বলায় আমার খুব খারাপ লাগল। মড়া না বলে শুধু লালী বললেই পারতেন! যারা মরে যায়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে না পারলেও ঘেন্না থাকা উচিত কি? ধরা যাক, লোকটা বা মেয়েটা কিংবা কেউ হাড়জ্বালানী বদমাস ছিল—কিন্তু মরার পর তার তো আর কিছু করারই রইল না।

আর মৃত্যু, আজো এক রহস্য। মরে গিয়ে কী ঘটে? কেউ ফিরে এসে তো বলার উপায় নেই। অন্তত মৃত্যুর এই রহস্যময়তার খাতিরেও লালী একটা মূল্য দাবি করতে পারে। বিশেষ করে নিজের বাবারই কাছে। ওর বাবা দয়াময় অবশ্য বরাবর নিষ্ঠুর মানুষ বলে প্রসিদ্ধ। কথায় কথায় চাষীদের বেদম ঠ্যাঙান। লালীকেও সারাজীবন ঠেঙিয়ে গেছেন। লালী বলতো—এটা বাবার একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থেকে হয়েছে। সত্যি করে কেউ তো দয়াময় থাকতে পারে না।

আমি ঝোপটা খুঁটিয়ে দেখছি লক্ষ্য করে দয়াময় ফের বললেন—সেই বন্যায় সব উপড়ে ভেসে গিয়েছিল, শুধু এটা বাদে। চিনতে পারছ, এটা একটা শ্যাওড়া ঝোপ? খুব শক্ত শেকড়বাকড়।

ভাগ্যিস শক্ত এবং উপড়ে যায়নি, তাহলে লালী এই নদী বেয়ে সোজা গঙ্গায় পড়তো। তবে, গঙ্গায় পড়লে লালীর ভালোই হতো—সব পাপ ঘুচে মোক্ষ পেতো তার আত্মা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার। কেন কে জানে, তার পরমুহূর্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। বললুম—তারপর কী হলো?

দয়াময় একটু বাঁকা হেসে বললেন—তারপর কী হয়?

—মানে, ওকে কী অবস্থায় পেয়েছিলেন?

দয়াময় ঝোপটা দেখতে দেখতে বললেন—শকুন বসতে পারেনি, জল ছিল। তবে দুটো শেয়াল ওর নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছিল। আর একটা দাঁড়কাক স্তনে ঠোঁট

ঠুকরে মাংস বের করছিল। আরও শুনবে?

—জ্যাঠামশাই কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

দয়াময় হো হো হেসে উঠলেন।—কেন? তোমাদের আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের বোঝাই দায়—এত সেন্টিমেন্টাল। এস, তোমাদের জমিটা দেখিয়ে দিই।

দয়াময়ের কাঁধে এবার বন্দুকটা উঠল। পা বাড়ালেন। কাঁধে কার্তুজের ঝোলাটা নড়ে উঠল। আমার কিন্তু পা ডুবে গেছে শক্ত পলির তলায়, শেকড় গজাচ্ছে এবং সেই সব সাদা বিন্দু বিন্দু শেকড়ের অঙ্কুর ভ্রূকুটির মতো আমার শরীর থেকে পৃথিবীর গভীরতা লক্ষ্য করতে চায়। খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলুম এটা।

দয়াময় ঘুরে বললেন—কী হলো?

—কিছু না। বেচারী লালীর কথা মনে পড়ছে!

দয়াময় ফের হাসলেন—তুমি বরাবর ব্রড মাইণ্ডেড আর মডার্ন। কিন্তু আমি প্রিমিটিভ ধরনের মানুষ। মেয়ের প্রেমিকদের···

বাধা দিয়ে বললুম—ছিঃ! কী বলছেন?

—মাঝে মাঝে আমি খুব সরল হয়ে যাই, অমিত। একে সেই প্রিমিটিভ সরলতা বলতে পারো। দেখ, ও যখন বেঁচে ছিল—তোমার বাবার কাছে কথাটা তুলেছিলুম। অরবিন্দ বলেছিল, তা কী করে হয়? এখন অমিত পড়াশোনা করছে। তা ছাড়া, বিয়ের বয়সও তো ওর হয়নি। হুম। তোমার বাবা আরো বলেছিলেন, অমিতের অনেক অ্যামবিসন আছে!

—জ্যাঠামশাই, প্লীজ! ওসব ভুলে যান।

—ভুলেছিলুম তো। তুমি আবার মনে করিয়ে দিলে! চলো, এগনো যাক।

—আজ থাক বরং। জমি তো উঠে পালাচ্ছে না। কাল যাব বরং।

দয়াময় আমার দিকে কেমন দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—ও, আচ্ছা! তাহলে তুমি এখানে বসে বসে অশ্রুপাত করো। আমি বরং দেখি দু-একটা তিতির পাই নাকি।

বলেই উনি বড়ো বড়ো পা ফেলে চলে গেলেন। বিশাল ওই মানুষ, পায়ে গামবুট, কাঁধে বন্দুক ও কার্তুজের ঝোলা, মাথায় টুপি। বাঁয়ে ঘুরে চরে নামলেন। কিছুক্ষণ নদীর তলায় হারিয়ে রইলেন। তারপর ওপারে বাঁধে বিরাট আকাশের গায়ে তাঁকে আবার দেখতে পেলুম। অমন একলা ওঁকে কখনো এর

আগে মনে হয়নি। এখন একটু ভয় হলো। চারদিকে ওঁর শত্রু। এভাবে একটা বন্দুক নিয়ে কি আত্মরক্ষা করতে পারবেন? এলাকায় তিনজন জোতদার ইতিমধ্যে খুন হয়েছেন। উনিও যে-কোনো সময় খুন হতে পারেন। তখন লালীর মা বলবেন, অমিতই ষড়যন্ত্র করে ওঁকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিসে বলবে, তাই তো! হঠাৎ এই ছোকরা আচমকা শহর থেকে বাবার সম্পত্তি দেখার ছলে গ্রামে এল এবং…

বুক টিপটিপ করে উঠল। তারপর বাঁ-চোখের কোণ দিয়ে যেন লালীকেই দেখতে পেলুম।—কী অমিত, কেমন আছ?

—তুমি ভালো আছ তো লালী? মৃত্যুর পরপারে জায়গাটা কেমন বল তো? প্রেমিক পেয়েছ কি এখানকার মতো? কথায় কথায় তাদের সঙ্গে কি শুয়ে পড়া এখনো সহজ? লালী, আমি কিন্তু সেদিক থেকে এখনো ব্যর্থ!

—তুমি যে ভীতু! মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারো না। অথচ, তোমার সারা দেহে তীব্র কামনা পোকার মতো কিলবিল করে। অমিত, তোমাকে তাই পোশাক খুলতে বলেছিলুম, মনে পড়ছে তো? ওই ওখানটায় জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে তুমি হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলে আমি উলঙ্গ, আর বলেছিলে—এ কী লালী! তোমার শাড়ি কোথায়? আমি বলেছিলুম—কেড়ে নিয়েছে। তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে—কে? কে? সেই সময় বৃষ্টি আর বাতাস বেড়ে গেল। আমার জবাব তুমি শুনতে পেলে না!

—কী বলেছিলে লালী?

—বলেছিলুম, যে কাড়বার সেই কেড়েছে। এতদিনে আমার সম্পূর্ণতা। এবার তাই ভেসে গেলুম। বিদায়, অমিত! বিদায়!

—আর বলেছিলে, হাসতে হাসতে বলেছিলে, তুমিও প্যান্টটা খুলে ফেল। পারিনি। আমার সাঁতার দিতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু জলের তলায় সভ্যতাকে বাঁচাতে চাইলাম!

—অথচ…

—অথচ কী লালী?

—অথচ পোশাক খুলে ফেললেই কত সহজে মানুষ সম্পূর্ণতা পায়।

—সে কী লালী, সম্পূর্ণতাটা কী?

—তার নাম স্বাধীনতা।…

স্বাধীনতা! আমার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে উঠল। লালী খুব ছেলেবেলা

থেকেই তাহলে আমাকে এই স্বাধীনতার দিকে ডেকেছিল ! তখন বুঝতুম না। পরেও কোনোদিন বুঝিনি ! নাটাকাঁটা কুঁচফলের ঝাওড়াঝোপের গুহার ছায়ায় নির্জনে শুয়ে পড়ার মানে আরেক জন্মের দিকে লক্ষীন্দরের মতো ভেসে যাওয়া —শিহরে বেহুলা। জানতুম না। পদ্মশালুকফোটা ঝিলের জলে সেই স্বাধীনতার ডাক ছিল। চৈত্রের নির্জন মাঠে সেই স্বাধীনতার হাওয়া ছিল। নদীর চড়ায় জ্যোৎস্নায় গা এলিয়ে পড়ে থাকতো সেই সোনালী-রূপালী স্বাধীনতা। কী বোকা ছিলুম এতদিন।

আমি ভালোবাসতুম ব্রিজে শব্দকারী রেলগাড়ি, গলায় নীলরুমাল জড়ানো দাড়িওলা ফায়ারম্যান, পাহাড়ের চূড়ার ওদিকে ব্লাস্ট ফার্নেসের ছটা, সবুজ ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়ি, রাতের আকাশে এরোপ্লেন আর গালিভারস ট্রাভেল এক এক খণ্ড। ভালোবাসতুম পুরনোকালের সাহিত্য, কিংবা পিকাসো আর দালির ছবি, রবি ঠাকুরের ঘরে বাইরে, হেনরি মুরের ভাস্কর্য। ক্লাসিকে-রোমান্টিকে মাখামাখি এক বিরাট সভ্যতাকে জানতুম শ্রেয় ও প্রেয়। সভ্যতার কয়েক হাজার বছর আমার মগজে ঢুকে পড়েছিল।

আর লালী ভালোবাসত কুঁচ ফল, বিষাক্ত ধুঁদুল, লালপোকা নীলপোকা, নির্জন বালিয়াড়ির পাখি, জ্যোৎস্নারাতে পরীর নাচ, মাঠের বিশালতা।

দুইয়ে কোনো মিল ছিল না। আমি শহর থেকে নিয়ে যেতুম জঁ৷ পল সার্ত্রের অস্তিত্বমূলক গল্প। লালি কুড়িয়ে আনতো মাঠের নিঃসঙ্গ চাষা ইবাজ সেখের রূপকথা। লালী গাইতো প্রাচীন লোকসঙ্গীত, আমি আওড়াতুম আধুনিক কবিতা। কোনো মিল ছিল না, কোনো মিল !

অথচ লালীকে দয়াময় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ক'বছর দিব্যি আধুনিক মেয়ে সেজে সে মফঃস্বল শহরের কলেজে বাসে যাতায়াত করতো।

একদা লালী নদীর ধারে জামবনে আমাকে বলেছিল—তোর সঙ্গে একটা ভারি দরকারী কথা আছে, অমিত।

বলেছিলুম—কী কথা রে ? এক্ষুনি বল্ না।

হঠাৎ চাপা গলায় ও বলেছিল—এখন বলা যাবে না। বলব'খন।

এই ছিল লালীর স্বভাব। কৌতূহলকে ফুটিয়ে দিয়েই নিঃশব্দে হেসে চলে যেত। তখন তাকে মনে হতো সবে ফুল ফুটবে, এমন টানটান শাখা-প্রশাখার উত্তেজনা নিয়ে সে চলে যাচ্ছে। এবং তার ওই না বলা কথাটা আমাকে তারপর কতদিন উত্যক্ত করছিল বলায় নয়। ভাবতুম—কী কথা বলবে লালী ? কোনো

গুরুতর শরীর বিষয়ক, নাকি তার আর সব উদ্ভট কথামালার অন্তর্গত? সে কি বলবে তার হাঁটুর নিচে অঁকুর গজাচ্ছে উদ্ভিদের? তবু শরীরে কোথাও ফুল ফোটবার ষড়যন্ত্র চলেছে, সেই গূঢ় খবর জানাবে?

মাঝে মাঝে ওকে দেখতুম কত সহজে মিশে যাচ্ছে উদ্ভিদের রাজ্যে। জড়িয়ে পড়ছে দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক সব খেলাধুলায়। কেন যে চলতে চলতে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল মাঠে এবং দৌড়তে শুরু করলো দিগন্তের দিকে, বুঝতেই পারতুম না।

ওর কাছে ছিল গভীর অথৈ কোনো জলজগতের খবর, যেখানে মানুষেরা মৃত্যুর পর ঝিনুক হয়ে যায়। ও শোনাতো, পাহাড়ের ওপর কোথায় আছে ডাকিনীর গুহা, যেখানে ঘণ্টা বাজলেই পৃথিবীতে রাত্রি আসে।

লালী একদিন বলেছিল, গ্রামের এই নদীর চড়ায় দেবদূত নেমেছিল। কেমন তার চেহারা? তাও সে বর্ণনা করেছিল। গলায় রেশমী রুমাল, নীল চোখ, হলুদ দুই ডানা কাঁধে, লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর সেই দেবদূত লালীকে কী একটা ভালো খবর দিয়েই কেটে পড়েছিল। এ খবরটা অনেক পরে বলেছিল লালী। রাঙাবৌদির অর্থাৎ দয়াময়ের ভাইপো সুধাকান্ত, সে সেটলমেণ্টের বড়ো অফিসার, তার বৌয়ের ছেলে হবে।

এই সুধাকান্ত সারাক্ষণ আমাকে লালীর ব্যাপারে সন্দেহ করতো। সে সেই বন্যার পর শহরে চলে গেছে। আর সে গ্রামে আসবে না। কারণ, লালীকে পাহারা দেবার দরকার ফুরিয়ে গেছে। লালীকে সভ্যতার দিকে টানতে তারই কারচুপি ছিল। দয়াময়কে ফুসলে বদলে ফেলেছিল। অথচ দয়াময়ের ইচ্ছে ছিল, লালীকে তিনি খাঁটি মেয়ে-জোতদার করে ছাড়বেন। অল্পস্বল্প লেখাপড়াই সেজন্য যথেষ্ট।

দেখতে দেখতে লালী বড়ো হলো। কিন্তু তবু তার ওই বন্যতা গেল না। সভ্যতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সে ঘুরে বেড়াতো বিষাক্ত ধুঁধুল লালপোকা নীলপোকা পাখি প্রজাপতি কুঁচফলের পৃথিবীতে। আমাদের এই পাড়াগাঁর পাশে কাঁচা রাস্তাটায় ইতিমধ্যে পিচ পড়েছিল। মাঠে বিশাল ফ্রেমে টাঙানো হয়েছিল বিদ্যুতের ভারী তার। ফ্রেমের গায়ে লাল ফলকে সাদা মড়ার মাথা ও দুটো আড়াআড়ি হাড় আঁকা ছিল। তাতে নাকি লেখা ছিল : সভ্যতা। অতএব সাবধান।

অবশ্য এ কথা লালীর। আমি পড়তুম এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান। ও পড়ে বলতো—সভ্যতা। অতএব সাবধান।

একদিন লালী বলেছিল—কেন আমার পিছনে ঘুরঘুর করিস বল্ তো?

তখন সে নদীর ধারের বাঁধে যেতে যেতে হঠাৎ জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। আমি তার পিছু ছাড়িনি। জারুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে ওই প্রশ্নটা করেছিল। জবাবে চোখ বুঁজে বলে ফেলেছিলাম—আমি তোকে চাই, লালী।

লালী বাঁকা ঠোঁটে হেসে বলেছিল—সে আবার কী রে?

—না লালী। বল, কেমন করে তোকে পাব।

—আমাকে পেতে হলে তোকে দেউড় বাঁশের জঙ্গল পেরোতে হবে।

—তার মানে?

লালী বলেছিল—ওটা আমার শর্ত। ওই যে বাঁওড়ের মুখে কাঁটাভরা বাঁশের জঙ্গল আছে, ওটার পুবধারে তোর জন্য অপেক্ষা করব। তুই পশ্চিম থেকে ঢুকবি। পেরিয়ে গেলেই আমাকে পেয়ে যাবি।

—বেশ, তাই হবে।

অস্থির হয়ে বাঁওড়ের দিকে হেঁটে গিয়েছিলুম। কথামতো লালী পুবে চলে গেল। আমি গেলুম পশ্চিমে। তারপর সে এক অনাছিষ্টি কাণ্ড! হাঁটু না ভাঁজ করে বাঁশবনটায় ঢোকা যায় না। কোথাও বুকে হাঁটতেও হলো। চার পাশে শুধু থরে থরে তীক্ষ্ণ কাঁটা। কেটে ছড়ে একাকার হলো কপাল, চিবুক, হাতের তালু! জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়ল। স্যাঁতসেতে মাটির কালো রসে সব বিচ্ছিরি হয়ে গেল। তারপর যত এগোই, তত শরীর শিউরে ওঠে। এ কোথায় চলে এসেছি? হাল্কা নীলচে অন্ধকার। এক জগত যেখানে সরীসৃপদের রাজত্ব। পোকামাকড় ব্যাঙ খরগোস জলজলে চোখে তাকিয়ে আমাকে দেখছে। সাপের খোলস ছত্রাক শ্যাওলা আমার বুকের তলায় জমে উঠেছে। মাকড়সার ঝুল আমার সারা মুখে জড়িয়ে গেছে, দেখতে দেখতে ক্রমশ বদলে যাচ্ছি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা—অতি ঠাণ্ডা সবুজ সাপ আমাকে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে কোথায়। আমি বদলাচ্ছি। নিজেকে দেখতে পাচ্ছি এক হলদে-ধূসর-নীল-লালে বিচিত্র এক এক গিরগিটি, সারা গায়ে শিহরণের কাঁটা শক্ত আর খসখসে। ভাঙা ডিমের খোলস মাড়িয়ে আমি কোথায় চলেছি, কোন আদিমতম পৃথিবীর দিকে? ক্রমশ আমার পোশাক অসম্ভব ভারী হয়ে এল। ছায়া হতে থাকল ঘনতর। তারপর অন্ধকারে বুকে হেঁটে যেতে যেতে, রক্ত ঝরার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা পেতে পেতে চিৎকার করে উঠেছিলুম—লালী! লালী! মনে হলো, কোথাও লালীর খিল খিল হাসি শোনা গেল। তারপর সে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। শব্দটা অনুমান করে

এগোলুম, তবু অন্ধকার শেষ হলো না। কতক্ষণ কেটে গেল ; সময়ের অস্তিত্ব বলতে কিছু আর রইল না। সেই গভীর প্রাকৃতিক চেতনার অন্ধকারে পথ হারিয়ে আমি ক্রমশ অবশ হয়ে পড়লুম।…

সেবার লালী খবর দিয়ে লোকজন এনে আমাকে খুঁজে বের করেছিল। উদ্ধার করার পর সবাই প্রশ্ন করেছিল—কেন ওখানে ঢুকতে গেলে তুমি ? কোনো যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে পারিনি। লালীর ব্যাপারে আমাদের প্রচলিত যুক্তির বালাই থাকতে পারে না। শুধু বলেছিলুম—এমনি।

এবং এই ছিল লালীর স্বভাব।

সেই 'দরকারী কথার' ব্যাপারটা ধরা যাক না কেন। আমার কৈশোর থেকে যৌবনে সে ওই না-বলা কথাটার জোরে বিভ্রান্ত রেখেছিল। তারপর তো কলেজে পড়তে গেলুম। মাঝে মাঝে ছুটিতে গ্রামে আসতুম। দেখতুম, লালী যেমন ছিল তেমনি আছে।

সময় হু হু করে চলে যাচ্ছিল। প্রতিশ্রুতি থাক বা না থাক, লালীকে আমার চাই-ই, এই গূঢ় প্রতিজ্ঞায় তবু স্থির থেকে গেলুম। তারপর এক পুজোর ছুটিতে গ্রামে আসার পরই হঠাৎ নদীর বাঁধ ভেঙে প্রচণ্ড বন্যা শুরু হলো।

বৃষ্টি পড়ছিল কদিন থেকে। নদীর জল ব্রিজের কাছে বিপদসীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল। তারপর এক শেষ রাতে গ্রামে জল ঢুকতে থাকল। সে এক ভয়ঙ্কর দিন এল গ্রামে। ঘরবাড়ি ধসে পড়ল। পালিত পশু-পাখিরা ভেসে গেল। কিছু মানুষও বেপাত্তা হয়ে গেল। আমাদের মাটির বাড়িটা ধসে গেলে পরিবারের সবাই দয়াময়ের একতালার ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিল। বন্যা এলে দয়াময় তাঁর নিষ্ঠুরতাকে কদিনের জন্যে ছুটি দিয়েছিলেন।

তখন বিকেল। রিলিফের নৌকো আসতে শুরু করেছে। দয়াময়ের একতালা চার পাঁচটা ঘরের ছাদ থেকে আশ্রিতরা নৌকোয় চলে যাচ্ছে। আমি লালীকেই খুঁজছি। কোথায় গেল সে ?

দয়াময় ক'বার জিগ্যেস করলেন—লালীকে দেখেছ অমিত ?

—না তো !

—আশ্চর্য ! সকাল থেকে তার পাত্তা নেই। শুনলাম, বাঁধের দিকে গিয়েছিল—খুব খোঁজা হলো, পাওয়া গেল না।

—তাহলে আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে নৌকোয় চলে গেছে।

দয়াময় মাথা নাড়লেন—নাঃ!

লালী বাঁধের দিকে যাচ্ছিল? আমার মধ্যে একটা তীব্র উত্তেজনা জাগল। এক ফাঁকে নিচে নামলুম। কেউ আমাকে কোনো প্রশ্ন করল না—কোথায় যাচ্ছি! প্রশ্ন করার এটা সময় নয়।

উঠোনে জল এক বুক। তীব্র স্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। বেরিয়ে যেতেই রাস্তায় জল বেড়ে গেল। সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকে। নদীর বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলুম। চিতসাঁতার দিচ্ছিলুম। স্রোতের সপক্ষে ভেসে যেতে যেতে যখন একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছলুম, টের পেলুম, বাঁধের এই অংশটাই যা টিঁকে আছে। জায়গাটা আন্দাজ কুড়ি ফুট-ছ' ফুট এবং লম্বাটে। তার গায়ে অনেক জড়াজড়ি গাছ। তার নিচে ঝোপগুলো ডুবে গেছে। দ্রুত সন্ধ্যা আসছিল। আমি উথাল পাথাল জলের শব্দের ওপর তীব্র তীক্ষ্ণ কিছু শব্দ ছুঁড়ে দিলুম—লালী! লালী!

পরক্ষণেই খুব কাছে সাড়া পাওয়া গেল—আছি!

আশ্চর্য, লালী আমার খুব কাছেই একটা হিজল গাছের ছড়ানো ডালে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। ভিজে শাড়িটা গায়ে জড়ানো। শেষ আলোয় ওকে দেখে মনে হলো এক প্রাগৈতিহাসিক কোনো সত্তা—হয়তো প্রাণী নয়, অন্য কিছু—মানুষের ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না।

লালী! ওখানে কী করছ?

লালী হাত তুলে ডাকল।—চলে এস অমিত!

শশব্যস্তে গাছে উঠে যেই তার দিকে এগিয়েছি, ও লাফ দিয়ে জলে পড়ল। মুহূর্তের ঝোঁকে আমিও ঝাঁপ দিলুম। ও দ্রুত এগোচ্ছিল, ওকে অনুসরণ করলুম। আর সেই সময় আবার বৃষ্টি নামল, আরো ধূসর হয়ে গেল সব কিছু। তবু মরীয়া হয়ে ওকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ডাকলুম—লালী! এই লালী!

লালী বারবার সাড়া দিয়ে গেল।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ হাতে কী একটা শক্ত ঠেকল। অমনি সেটা ধরলুম। মনে হলো একটা প্রকাণ্ড লোহার রেলিং। সেটার ওপর পা রেখে উঠে বসলুম। তারপর শুনলুম লালীর কণ্ঠস্বর।—অমিত!

—লালী!

লালীকে রেলিঙের অন্যপ্রান্ত দিয়ে উঠতে দেখলুম। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যার আবছায়ায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে কাছে এসে বলল—সাঁকোটা

উপড়ে গেছে দেখছ ? এখানে এসে আটকেছে !

আমরা পাশাপাশি বসে আছি। হঠাৎ লালী বলে উঠল—এই অমিত, আজ তোমাকে সেই পুরনো কথাটা বলব।

আমি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেই প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললুম—একি লালী! তোমার কাপড়চোপড় কোথায় গেল ?

—সাঁতার দেওয়া যায় না। তাই ফেলে দিয়েছি। তুমিও সব ফেলে দাও।

সেই রাতে পৃথিবী আমাদের দুজনকে শোবার মতো একটুও জায়গা দেয়নি। তা পেলে আমরা দুটি প্রাচীন সরীসৃপের মতো অন্ধ ভালোবাসায় ঘনীভূত হতে পারতুম।

আমরা সেই রেলিঙে অতিকষ্টে বসে থাকলুম—অনেক অনেকক্ষণ। কথা খুঁজলুম এবং এক অদ্ভুত বন্য গন্ধে আমাদের শরীরের ভিতরে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কিছু ফুল ফুটল। নাকি আমাদের দুই সভ্যতাবর্জিত নগ্ন শরীর থেকে অজস্র আকুঁর গজাল শেকড়বাকড়ের ষড়যন্ত্রে ? তাই তখন দরকার ছিল একটুকরো মাটি। অথচ কোথাও তখন মাটি নেই।

এক সময় বললুম—লালী, তোমার সেই কথাটা ?

—হ্যাঁ, কথা।

বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুব আস্তে বলল—কথাটা হয়তো ফুরিয়ে গেছে। নেই আর।

—লালী, হেঁয়ালি করো না!

হঠাৎ সে হেসে উঠল।—কথাটা ফুরিয়েছে। তবু কথা আরো থাকে, অমিত। সে কথা শুনতে হলে আরো দূরে যেতে হবে। চলে এস।

সে তক্ষুনি অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দিল জলে। চেঁচিয়ে উঠলুম—লালী!

লালীর ডাক শোনা গেল।—চলে এস!

অসম্ভব। এই দুর্যোগে আর ঝাঁপ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। পারলুম না। কাকুতি মিনতি করে ওকে ডাকতে থাকলুম। ও শুধু দূর থেকে দূরে যেতে যেতে বলল—চলে এস!

আমি রাগ উত্তেজনা দুঃখে অস্থির হয়ে বসে থাকলুম। ওই ডাকে সাড়া দিয়ে এগোবার সাহস আর শক্তিও আমার ছিল না।···

এখন বুঝতে পারি, ওই ছিল লালীর মুখে স্বাধীনতার ডাক। যে স্বাধীনতায়

অতিক্রান্ত হয় দিনরাত্রি, সূর্য ওঠে, চাঁদ জ্যোৎস্না দেয়, এই ব্রহ্মাণ্ড চলে যেতে থাকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের ভেগা নক্ষত্রের দিকে, বুদ্বুদের মতো প্রসারিত হয় স্পেস, সময় হয়ে ওঠে গতিবান—আর যে স্বাধীনতায় মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদ আসে, ফুল ফোটে, প্রাণীরা জন্ম নেয়, লালী সেই খাঁটি স্বাধীনতাকে জেনেছিল। তার দিকে চলে যাচ্ছিল আমৃত্যু। ওই যাওয়াই তার জীবন।

হায়, সেই স্বাধীনতার ডাক কেউ শোনে, কেউ জানে—অনেকে শোনে না, অনেকেই জানে না! জন্মের পরই ইতিহাস চোখে পরিয়ে দেয় সভ্যতার ঠুলি।

লালী ছিল আমারই স্বাধীনতার টান। আমি ভাসতে পারিনি। সভ্যতায় আটকে আছি। পোশাকে কার্পেটে ফুলদানিতে, পিকাসো রবিঠাকুরে।

—এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।

যেন দয়াময় আবার পুব পাশ থেকে বলে উঠলেন। আবার আমি ঝোপটা দেখতে থাকলুম। দেখলুম, কালো বিষ পিঁপড়ে লালপোকা নীলপোকা মাকড়সার জাল ছত্রাক সাপের খোলস শ্যাওলা ভাঙা ডিম গিরগিটি সবুজ সাপের ছায়াধূসর স্যাঁতসেতে উর্বর পৃথিবীতে আলুথালু চুলে লালী শুয়ে আছে। ভাঁড়ুলে গাছের নিটোল গুঁড়ির মতো খয়েরি দুই উরু, 'শঙ্খের মতন করুণ যোনি', তার ধূসর দুই স্তনের বোঁটায় হাজার লক্ষ বছরের মানুষের শৈশব জটিল হরফে লেখা। ফিসফিস করে ডাকলুম—লালী।

আর বাঁধের দিকে পরপর দুবার বন্দুকের শব্দ হলো। চমকে উঠে দেখলুম দয়াময় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছেন। ঝাঁকটা ভয় পেয়ে আমার মাথার ওপর এসে পড়তেই আমিও ভয়ে মাথা নামালুম। তারপর আড়চোখে দেখি দয়াময় এদিকে বন্দুক তুলেছেন। পাখিগুলো দূরে চলে গেল। কাঠ হয়ে বসে আছি। তারপর দয়াময়ের জুতোর শব্দ হলো।—এখনো বসে আছ দেখছি!

—না। ফিরব। আপনি এরই মধ্যে ফিরলেন যে!

—ফিরলাম। তোমাকে একটা কথা বলতে বাকি ছিল।

—বলুন।

—নদীর ধারে সবজি চাষ করতো একটা লোক। ওই ওখানটায়। তোমার মনে পড়ে।

—হ্যাঁ। গণেশ রাজবংশী। সে নাকি জ্যোৎস্নায় চরে পরী নামতে দেখেছিল।

—তার ছেলেকে মনে পড়ে?

—খুউব। কী যেন নাম ছিল—

—সীতু।

—হ্যাঁ, সীতু। পাঠশালায় আমাদের সঙ্গে পড়েছিল।

দয়াময় ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলেন।—সে রাতে লালী কোথায় যাচ্ছিল জানো? সীতুর কাছে।

আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে।

—সীতুরা থাকতো ওখানেই। আর লালী তাদের খবর নিতে যাচ্ছিল। তাছাড়া আর কী বলব?

—কেন?

বুঝতে পারছ না কেন? দয়াময় জ্বলে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হলো। তারপর বললেন—খুব ছেলেবেলা থেকে এটা চলছিল। একটুও তলিয়ে ভাবিনি। ওই শুয়োরের বাচ্চাটা লালীকে নষ্ট করেছিল। লালীকে সে…

অনেক কষ্ট পাচ্ছেন দয়াময়, তাই কথা আটকে গেল। চোখমুখ লাল হয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে আবার বললেন—পরে গণেশ বলেছিল আমাকে। লালী বন্যার রাতে ওদের কুঁড়েয় যায়। তখন ছোঁড়াটা ছিল না। রিলিফের নৌকো ডাকতে গিয়েছিল গ্রামের দিকে। ওর বাবা গাছের ডালে বসেছিল। অন্ধকারেও ওর চোখে কিছু এড়ায়নি। ও লালীকে টের পেয়েছিল। খুব বকাবকিও করেছিল। কেন এই দুর্যোগে এভাবে এসেছে, তারপর ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে এ কি সর্বনেশে কীর্তি। তারপর ঘোড়ার মতো মুখ তুলে হাসলেন দয়াময়।

—তারপর?

—তারপর লালী আবার ভেসে যায়। বুড়ো আর ওকে দেখতে পায়নি।

—তারপর পথে এই ঝোপের মধ্যে…

কথা কেড়ে দয়াময় বললেন—কী ঘটেছিল আমি জানি না। হয়তো কাপড় আটকে গিয়েছিল।

—না। ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল তখন।

দয়াময় আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকালেন।

—আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় ওর দেখা হয়। তারপর ও সাঁতার কেটে ওদিকে চলে গিয়েছিল।

—তুমি জানো, সীতু ছোঁড়াটাকে কী শাস্তি দিয়েছি ?

—খুন করেছেন ?

—এই ঝোপের তলায় মাটির অনেক নিচে তাকে লালীর জন্যে অপেক্ষা করতে পাঠিয়েছি।

—আর গণেশ বুড়ো ?

—তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে তার কাছে যাই, লালীর কথা শুনতে। লালীর আরেকটা জীবন ছিল। ও জানতো, আমি জানতুম না।

—আমি একবার যাব বুড়োর কাছে।

—যেও। তবে কষ্ট পাবে। আমি বাবা। অনেক কষ্ট পাই। হয়তো কষ্ট পেতেই যাই। তুমি কি কষ্ট পেতে চাইবে লালীর জন্যে ? তোমাকে তো ও ভালোই বাসেনি !

বলে দয়াময় কেমন একটু হাসলেন। তারপর কিছু না বলে হনহন করে মাঠের দিকে এগোতে থাকলেন…

তাহলে সীতুর জন্যেই লালী…আমার গলায় কী আটকে গেল। তাই নিয়ে গণেশ রাজবংশীর কুঁড়েঘরটার দিকে চললুম। আমি এখন লালীর অন্য জীবনের কথা শুনব, যা আমার আজো শোনা হয়নি। সবুজ তেজি উদ্ভিদের ভেতরে এখন বুড়ো চাষা হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। আমাকে দেখলে বেরিয়ে এসে ঘামে ভিজে ধুলোয় ধূসর শরীর ছায়ায় এলিয়ে রেখে ফ্যাকাসে চোখে পৃথিবীর একটা পুরনো গল্প শুরু করবে। সেই গল্পের কোনো শেষ নেই। কারণ সেই গল্প লালী নামে এক মেয়ের—যে স্বাধীনতা জেনেছিল।…

মাঝে মাঝে মনে হয় খবরের কাগজগুলো সব এক ধরনের দুষ্টু ছেলে—দুষ্টুমি করে আমাদের গা খামচায়, কাতুকুতু দেয়, চুল টানে, এমনকি দাড়িও ওপড়ায়। তারা মাঝে মাঝে বুক পকেট পাশ পকেট থেকে দ্রব্য তুলে নেবার মতো করে আবেগ ক্ষোভ হর্ষ বিহ্বলতা ত্রাস বিষাদ টেনে বাইরে ফেলে দেয়, নিয়ে পালায়—কখনও কোত্থেকে কীসব অকেজো দ্রব্য চুপিসাড়ে রেখে যায়। যা পরে কুট কুট করতে পারে, জ্বালা দিতেও পটু। শুঁয়োপোকা, বারুদের টুকরো বা পটকা, জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি···

আমার বিরক্তি এক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের হেতু। এবং সে-কারণে 'কান্দী মহকুমা বিশবাঁও জলের নীচে' আমি দেখেও দেখিনি। সে অঞ্চলে 'হিজল' নামক এক সময়ের তৃণভূমির বুকে নতুন আবাদ পত্তন ও রোমাঞ্চকর ফসলের মাঠ মত্তমাতাল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে—এই দুঃসংবাদকে অবলম্বন করে 'হিজলকন্যা ভেসে গেল' শীর্ষক উৎকৃষ্ট রিপোর্টাজও আমার টিকি ধরে টানেনি।

কিন্তু যখন মায়ের চিঠি পেলাম—ঠিক দিন বিশেক পরে, আমার মনে হলো, একালে সর্বনাশের ঘণ্টা যারা একমাত্র বাজাতে পারে, তাদের ছোট করে দেখেছি। ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্যকিছু আমাকে নিরুৎসাহ রাখে—এই ব্যাধি যে কত ভয়ানক, এমন করে টের কোনোদিন পাইনি।

উল্লিখিত অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপিত হবার পর তবে মায়ের চিঠি পৌঁচেছে! সুতরাং এতদিনে আমাদের যে কাজলী গাই ও তার এঁড়ে বাছুর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল—তাদের অবলুপ্তির জন্য শেয়াল ও শকুনের অভাব ঘটেনি।

আমার মন কাঁদছিল। ওই কাজলী গাইটির নাম ছিল কুসুম। তার মানে কুসুম বেদেনী আমার শৈশবে দুধের কারবার করতো। এবং তার দুধ খেয়েই আমি বেড়ে উঠেছিলাম। পরে কুসুম বেদেনী আমাকে স্নেহবশত তার একটি যুবতী গোরু মাত্র পাঁচ টাকায় দান করেছিল। তারপর সে পাঁচ টাকা মূল্যের চুড়ি-সাবান-তেল নিয়ে মনোহারীওয়ালী বনে যায়। অবশ্য লোকে তাকে ডাকে

কুসুম চুড়িওয়ালী! এখন মায়ের চিঠির মধ্যে ওই বার্তা সাংকেতিক আঘাতের সৃষ্টি করল। আমার সারা শৈশব মুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠল। আমি তখনই রওনা হলাম।

কুসুম বলল—তা ছোটবাবু, এ কী বানবন্যা দেখলে! আমি যা দেখেছি, এ তো তার কাছে এক গুণ্ডুস জল মাত্তর। হা হা হা হা কালদত্যি ঝড় আসছে আকাশ কালো করে: আর সে কী বিষ্টি, বিষ্টি··কোথা দিন কোথা রাত্তির, ছেলে যুবো হলো, যুবোটা হলো বিদ্ধ, সোনার যৈবন কখন জাগন্ত চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। চোখ খুললে দেখি, কখন ভেসে গেছি, কখন আবার পচা পাঁকের চড়ায় আটকেছি। দেখে গা ঘিন ঘিন, নরক, শুধু নরক···কুগন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে—আর ছোটবাবু সব্বোহারা মানুষ ত্যাখন বুক কপাল চাপরে হু হু করে কাঁদছে। সব শেষ, শেষ এক্কেবারে, কিচ্ছু নাই। না যৈবন, না ইচ্ছে বাসনা, না জেবন। মড়া, একেবারে মড়ার অধিক, ছোটবাবু। আমাকে মড়া করে সে পালিয়েছে।···

কুসুম ওই রকম করে কথা বলে। সে ফোঁস ফোঁস করে দুবার নাক ঝেড়ে ফের বলতে লাগল!—হ্যাঁ, সেবারে আমি পেথম চুড়ির ব্যবসা ধরেছি। পাঁচ টাকার পুঁজি মাত্তর। কিন্তু ওই যে বলে, সোনার যৈবন—সোনার না রূপোর জানি নে, কিন্তু যৈবন তো বটে···তা আমার এসেছিল।

নাতি-দিদিমা সম্পর্ক থাকায় এ দুঃখকথার মধ্যেও রসিকতার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম—মিথ্যে বলো না কুসুমদি, তোমার মতো রূপসী তখন এ তল্লাটে কোথাও ছিল না। আমি শুনেছি।

—শুনেছিস? ফোকলা মুখে একবার হাসবার চেষ্টা করে হঠাৎ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকল কুসুম। তার কালস্পৃষ্ট বেখাসঙ্কুল মুখমণ্ডলে একটা অতর্কিত অসহায় শব্দহীন আর্তনাদ—যেন পাথরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনির মতো কেঁপে কেঁপে ফের মিলিয়ে গেল। সে বলল—ছিল রে, আমার দেহতে ওই রকম একটা পিতিমা ছিল। পুজোর ধুম পড়ে যেত যখন-ত্যাখন। বলিদানের ঘটা কম ছিল না। ছোটবাবু, তুই সিংহবাহিনীর মন্দিরটা দেখেছিস! মস্তো বটগাছ গজিয়ে ফাটিয়ে-ফুটিয়ে অত সুন্দর মন্দিরখানার দশা কী করেছে, তাও দেখেছিস ভাই।

—দেখেছি।

—অই; অই সে কালের কাণ্ড। অথচ কেমন করে এটা হয়, আমি জানি।···

একদিন এক কাকপক্ষী কোত্থেকে এল উড়তে উড়তে, নেদে দিয়ে গেল একটুখানি, ব্যস্‌···অই, অই, সেই কালবীজ! আর আমার সোনার যৈবনে অমনি করে উড়ন্ত কাকপক্ষীটি এসে কালবীজ নেদে দিয়ে গেল, ব্যস···

—তুমি বানের কথা বলছিলে কুসুমদি।

—অ।

—কে তোমাকে মড়া করে পালিয়েছে, বলছিলে।

—বলছিলাম নাকি?

—হ্যাঁ, সেই পাঁচ টাকার পুঁজি···

—ঠিক বলেছিস। পাঁচ টাকার পুঁজি মাত্তর। লোকে আগে বলতো, কুসুম দুধওয়ালী। অই পোড়ামুখো রঘু চক্কোত্তি যখন-ত্যাখন পথ আটকে ফিসফিস করে শুধোত—অ কুসুম, দুধ দিবি?···তা ছোটবাবু, বড় নাজের কথা, একলা-দোকলা পথে-ঘাটে পেলে নাগরেরা দুধ চায়···আম্মো বাবা কুসুম-বেদেনী—মহরম বেদের মেয়ে, পিতা-পুরুষ কালসপ্প ধরে কাল কাটালে—আম্মো কম যাইনে তো! ছেলেবেলা থেকে শিয়রে সাপ, পাশে সাপ, বুকের 'পরে সাপ···

—বুকের উপর?

—শুনছিস কী তাইলে? উঠন্ত কিশোরী মেয়ে বাপের পাশে সুখে নিদ্রা যাচ্ছি। সন্ধেবেলা তারু সেকদারের রান্নাঘর থেকে তাজা গোখরো ধরে এনে মাটির তেলোয় ঢাকনা দিয়ে রেখেছিল বাপ। কখন ঘুমের ঘোরে পা লেগে তেলোটা গড়িয়ে গেছে আর বেরিয়ে পড়েছে স্বয়ম্‌ মহাকাল। আমার বুকের উপর বসেছে এসে রসিক নাগর পোড়ারমুখো···

—তারপর, তারপর?

—না নড়লে ডংশায় না। আমি বেদের মেয়ে—ঘুম ভাঙতে দেরি হয়নি। কাঠ হয়ে শুয়ে আছি—খানিক পরে বাপের গলা শুনলাম—কুসুম, তুই নড়িস না বাছা, বুকের 'পরে কাল···বাপও টের পেয়ে গেছে কেমন করে। ধরে ফেললে তক্ষুনি···

—ইস্‌—স্‌!

—ভয় পাস্‌ নে। বিষদাঁত ভাঙা ছিল। ডংশালেও মরতাম না।

—তবু গোখরো তো!

—হ্যাঁ, বিষ থাক আর নাই থাক্‌, গোখরো। জানিস্‌ ছোটবাবু, অই ভয় সকলেরই ছিল। কুসুমের বিষ থাক্‌ আর নাই থাক্‌, সে গোখরো। চোখের

সামনে রূপযৌবন ঘুরছে-ফিরছে, কথা বলছে, আর মুখে তার মধুর হাসি, তবু সাধ্যি নাই একবার পর্শ করে।

কুসুম হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললাম—তাহলে কি খুশি হতে তুমি?

—মস্করা করছিস? তা সত্যি বলতে গেলে, ওই রকম ইচ্ছে ছিল যেন পোষা। ছোটবাবু, কত মানুষ এমনি করে ঘুরঘুর করেছে, তারা ভিখিরি, ভীতু,—আমার মনে দুঃখ বই সুখ ছিল না এতে। কই, কোথা সে ডাকাবুকো পুরুষ, যেমন অই মত্তমাতাল বান, পাহাড়গলানো সোঁত, সব্বনেশে জলের ডাকা··কুসুম পাঁচ টাকার পুঁজি নিয়ে চুড়িওলী হলো। বৌঝির হাতে চুড়ি পরায়। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘোরে। কিন্তু সুখ কই মনে? কী আশা তার? সেই যে বাউলগানে আছে—মনের মানুষ খুঁজে ফিরি···

—বানের কথা বলছিলে।

—অ। বানবন্যা হিজলদেশে তো সতীন মেয়ে। মাঝে মাঝে রাগ করে বাপের বাড়ি যায়। আবার ফেরে। চুলোচুলি খিস্তিখেউড় আর হাঁড়িচুলোর ধর্মঘট দু'বেলা ফের একটানা—সোয়ামী বেচারা চোখের জল পাছায় মুছতে মুছতে হুই বাঁধের 'পরে গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ।···পষ্টাপষ্টিই শোন্ ছোটবাবু। হিজলের ঘরে ঘরে সোনার সংসার—তবুও সুখ নাই, সোয়াস্তি নাই, কখন পশ্চিমে পাহাড়ের ওপর লক লক করে চিকুর হানল, কালো মেঘ ফুঁসে উঠল, শাল-সেগুনের জঙ্গল ধুয়ে গিরিমাটি গলিয়ে জল এল সোনালী মোষের মতন গাঁক গাঁক করে শিং নাড়তে নাড়তে···কোথা বাঁধ কোথা ঘর হা পুত্র হা কন্যা ···অই, অই তরাস মনে পোষা সারাক্ষণ। বাঁধ তো মানুষের হাতের গড়া ছোটবাবু, কালের গোদা পায়ের ছোঁয়াটিও সয় না। তারপর পড়ে রইল ফাঁকা ঘাসের মাঠ, ব্যানার জঙ্গল, বালিয়াড়ি···তুই তো দেখেছিস রে!

—একটু একটু মনে পড়ে। বিরাট খড়ের মাঠ ছিল একটা।

—ত্যাখন কুসুম চুড়িওলী সেই মাঠ পেরিয়ে দুর-দুরান্তের গাঁয়ে ফিরি কত্তে যায়। বয়স জোর বাইশ কি চব্বিশ। সোমত্ত যোবতী, থমথম যৈবন, নিজের পানে নিজে তাকালে গা ছমছম করে—অ মা গো, এ কী আগুনের ডেলা দিলি গায়ে ঘষে, ছল্‌কে ছল্‌কে আগুন উপচায় যেন।···সেই ঘাসের বনে যখন একা হেঁটে যাই, মনে হয় সব ঘাসের বন অতবড় মাঠ ধোঁয়াচ্ছে তাত লেগে—আগুন জ্বলে যাবে।···অই, অই রকম লাগে নিজের কাছে নিজেকে। তাই তরাসে বুকখানি কি কাঁপে না? কাঁপে। সাপধরাদের মেয়েই হই, আর স্বয়ম্ সাপিনীই

হুই, মেয়ে তো বটে—নিতান্ত মেয়েমানুষ। নিজের বৈরী নিজের সঙ্গে ছায়া হয়ে ঘোরে। যেন নিজের পানেই লকলকে জিভ, ফণা তুলে ছোবল দেবার সাধ···কী বলছিলাম যেন?

—ঘাসের মাঠ পেরিয়ে একা চুড়ি বেচতে যাচ্ছো···

—যাচ্ছি বটে। খরার রোদ লি লি করে কাঁপছে তেপান্তরে। কাছে-পিঠে কোথাও মাথা বাঁচানো ছায়া নেই যে দু-দণ্ড জিরিয়ে লিই। শুধু ঘাসের বন অব্দি ঢাকে—কাশকুশব্যানার রুক্ষু গা থেকে ফড়িং ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। কান পাতলে চারপাশে তাদের ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁ ঝাঁ চিক্ চিক্ ডাক শোনা যাচ্ছে। হাওয়া দিচ্ছে দমকে দমকে। খড়ের বন শরশর করে কাঁপছে। ব্যস, অই যতরকম আওয়াজ, আর কিছু নাই—না মনিষ্যি, না কেউ। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা জমি, তা' পরে ফের সেই ঘাসের জঙ্গল—এক চিলতে পায়ে হাঁটা পথ তার মধ্যিতে। সেই পথে চলতে চলতে হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ—

ঘোলাটে চোখে ক'মুহূর্ত নিষ্পলক তাকাল কুসুম। ফের বলতে লাগল—কী ভাবছিলাম আজ মনে করার সাধ্যি নাই। কিন্তু ছোটবাবু, ঘাসের মাঠে তুই তো গেছিস—অই নানারকম আওয়াজ শুনতে কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো লাগে না আওয়াজগুলো?

—লাগে। ঘাসফড়িং, শুকনো খড়, ফাঁকা মাঠের বাতাস···

কুসুম হাসল—থাম, বলতে দে।

—বলো।

—সেই জন্যেই পেছনে অই শব্দ কানে চটাস্ করে বাজল। বুনোশুয়োর গুলবাঘাদের তো সে যুগে রাজত্ব ছিল হিজলের মাঠে, তাই এই তরাস। বুক কেঁপে গা শিউরে তটস্থ। ওম্মা, পেছন ফিরে দেখি—

—কী, কী দেখলে?

—মানুষ। কিন্তু কী মানুষ, হাসি না ডর পাই, ডর পাই না হাসি,···মস্তো লম্বা, তেমনি চওড়া, ভূষকালো আধন্যাংটো এক মিনসে, গালময় কালো কুচকুচে খোঁচামারা গোঁফদাড়ি—ছোট্ট একফালি ন্যাকড়ায় মাত্তর তলপেট থেকে আ-জায়গা অব্দি কোনোরকমে ঢেকেছে, পাছা হনুমানের মতো কেলে-হাঁড়ির ঘষাখাওয়া তলা···তা' পরে সেই আবাং পোড়ারমুখো আবার পেছন ফিরতে দেখে ফিক্ করে হাসছে। বড়ো বড়ো হলুদ দাঁত, লাল মাড়ি। আর হাতে একটা কাস্তে ছিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে পিঠের দাদ চুলকোচ্ছে বোধ করি···

—হুঁ।

—হুঁ কী রে? ঠিক যেন ঘাস কাটতে কাটতে আমাকে দেখে উঠে এসেছে।

—তারপর?

—ভূতের গল্প শুনেছিস তো ছোটবাবু? সেই যে একলা-দোকলা মানুষ যাচ্ছে, সঙ্গে খাবার—দুধ-তেল কি সন্দেশ, ভূত পিছু নিয়ে নাকি সুরে বলে—এঁকটু দেঁ,...

হাসলাম।—শুনেছি।

—যদ্দুর যাবি, অই করে পিছু পিছু যাবে। শুধু দেঁ দেঁ রব। কিন্তু বুদ্ধিমান মনিষ্যি দেয় না। বলে, আর এট্টুখানি আয়, দিচ্ছি। দেব দেব করে গাঁয়ে ঢুকে পড়ে। বেঁচে যায়। ভূত তখন আফশোষে দাঁত কড়মড় করে ফিরে যায়।

—কী মুশকিল, তোমাকেও দে বলল নাকি?

—ফক্কুরি করিস না। এ বড়ো দুঃখের কথা রে ছোটবাবু। আহা, মনিষ্যি তো বটে, বিধাতাপুরুষ নানারকম ক্ষিদেতেষ্টা দিয়েছে তাকে। রূপপুরের কুসুম চুড়িওলীকে তখন একবার পাবার জন্যে তল্লাটের সেরা মানুষগুলো ধনসম্পদের লোভ দেখাচ্ছে, গায়ের জোর দেখাতে আসছে—আর এ কী ভূতুড়ে লোক, পেছন পেছন আসে আর লাল মাড়ি হলুদ দাঁত বের করে হেসে, শুধু বলে—দে! গায়ের জোর দেখায় না, মিনতি করে না, শুধু দে...দে ..দে...দে...

—অ মা! বুকে হাত চেপে কুসুম যেন দম নিল।

—কী হলো?

—কিছু না। কুসুম ফের একটু হেসে বলতে লাগল।—এ ডাক তো দুধের বাচ্চার ডাক ছোটবাবু! খুঁ খুঁ করে নাকি সুরে হায়ের পিছু পিছু ঘাটের বাগে যায়—শুধু অই স্বর: দে...তা আমি তাকে গাল দিলাম মা-মাসি তুলে। ফুঁসে দাঁড়ালাম। তেড়ে গেলাম। সে খানিক থমকে দাঁড়ায়। পিছু হটে। শুধু হাসে। তা' পরে সেই আমতা হাসিও ঠোঁটের কোণটিতে মিলিয়ে যাওয়া পষ্ট দেখতে পাই। ফের হাঁটি। ফের অই—অই, দে!...ছোটবাবু তোকে বলতে লাজ নাই—সেরকম কঠিন সমিস্যিতে আমি জেবনে পড়িনি রে! দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম—চারিদিক ফাঁকা, ঘাসের বনে ফড়িং তাড়ানো হাওয়া, মাথার ওপর নীলবন্ন গনগনে আকাশ, একলা একলা হাটিটি পাখি উড়ে উড়ে ডাকে টি টি টি...বল্ তো আমি কি করি? লাথি মারলে পা জড়িয়ে ধরে থাকে বোবার মতো, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—আর সে-তাকানো দেখে গায়ের ঘাম গা থেকে শুকিয়ে

যায়, কেমন লিদ্বুষী সরল চোখদুটি—কেমন চাহনিটি, যেন রূপকথার রাজপুরীর দেউড়িতে উঁকি মেরে সব দেখছে প্যাট প্যাট করে, আর মেলাখেলার দোকানে সোন্দর রঙিন দব্য দেখে যেমন বাচ্চা ছেলে চাই চাই চোখে তাকায়··বিশ্বেস কচ্ছিস না ?

—করছি। তুমি বলো।

—না, করবি না। উঠতি বয়েস থেকে দেশচরা মেয়ে আমি, হাজার পুরুষের চোখের চাহনি আমি চিনি। মানে বুঝতে পারি। কিন্তু তেমন চোখ আমি কোনোদিন দেখিনি ছোটবাবু। যদি বলিস্, মাত্তর অই মন্দ ক্ষিদেটিই সার—তাহলে সে অত বড়ো যোয়ান পুরুষমানুষ, ফাঁকা মাঠে আমাকে গায়ের জোর দেখালে তো সহজেই কাবু হতাম ! ··তাই আমার মনে তরাস হলো। শুধোলাম—পষ্টাপষ্টি বল বে ডাকাবুকো, কী দেব তোকে, কী লিবি তুই ?

—বললে ?

—বললাম বৈকি। প্রথমে রেগে চেঁচামেচি করে বললাম। শেষে বললাম কাঁদতে কাঁদতে। চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। এমন যন্তন্নায় তো কোনোদিন পড়িনি। এমন করে মান চাইতে কেউ তো আসেনি। নারীর যৈবন—দেহের ভিতরে সোনার কৌটোয় রাখা প্রাণ-ভোমরা সেইটি যেন চাইছে হাত বাড়িয়ে—দে !···যদি দিই, কী আর থাকে আমার ! আমি ডাক ছেড়ে কাঁদলাম—ওরে ডাকাত, ওরে রাক্কস,···

একটু থেমে কুসুম ফের বলল—সন্দ ততক্ষণে বেশ দানা বেঁধেছে মনে। ফাঁকা তেপান্তর মাঠ, একা রূপসী যুবো মেয়ে। অথচ রাগে দুঃখে হয়ে গেছি পাগল আস্তে আস্তে। দেড় ক্রোশ পথ হাঁটছি, পেছনে অই রাক্ষস। যতবার ভাবি, কান দেব না—পারি নে। ভয় হয়। যেন সেই সুযোগে সব কেড়ে নেবে। পেছন ফিরে চেঁচামেচি করি তবু শোনে না। তারপর আর সামলাতে পারলাম না, ছোটবাবু। আর নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। হাঁফাতে হাঁফাতে চুড়ির ডালা ঘাসের পরে রাখলাম। তা' পরে হঠাৎ একটানে পরনের কাপড় খুলে ফেললাম, বেলাউস খুলে দিলাম—পটাপট সায়ার দড়ি ছিঁড়ে একেবারে ন্যাংটো হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম—লে, এই লে যা খুশী লিয়ে যা···

আমি মুখ ফিরিয়ে বললাম—হুঁ।

কুসুমের কুঞ্চিত ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল।—সন্দ অনেক আগেই হয়েছিল। উলঙ্গ যুবতী মেয়ে চোখ বুঝেছি—সারা দেহ থথর করে কাঁপছে,

বানবন্যা বইছে যেন মধ্যিখানে—তারপর সে ছুঁলে : থ্যাবড়া বড়ো বড়ো হাতের থাবা পড়ল গায়ের 'পরে। কাল শুনছি কাঁপতে কাঁপতে। আর চোখ বুজে বুঝতে পারছি আকাশ কালো করে মেঘ এল, ঝড় ছুটল হা হা হা হা, যেন কালদত্যি লাথির ঘায়ে সব ওপড়ায়, তারপর সে-কী বিষ্টি, বিষ্টি, বিষ্টি · সারা হিজল জুড়ে কোত্থেকে ছলছল গমগম পাহাড়-ধোওয়া মত্তমাতাল জলের সোঁত বইল ··দিন না রাত্তির, রাত্তির না দিন, কোথা ভাসতে ভাসতে যাই, কোথা ঘর, সাধ-আহ্লাদ···তারপর শুধু কুগন্ধ, পচা পাঁক, তখন চোখ খুলি। অবাক মানি। লাজ পাই। ফাঁকা মাঠ, একা উলঙ্গ যোবতী মেয়ে ঘাসের উপব শুয়ে আছি, পায়ের নীচে জামাকাপড পড়ে আছে। আর সে কই ? কোথা সে ?

—সে কি !

—কেউ নাই। যেদিকে তাকাই, লি লি করে মাঠে রোদ কাঁপছে, কাশকুশে ফড়িং উড়ে উড়ে ডাকছে, হাওয়া বাজছে চড় চড শব্দে শুকনো ব্যানাখড়ের জঙ্গলে, মাথার উপর লীলবন্ন দেবতা, আর সেই হট্টি ট পাখি ডাকে কেঁদে কেঁদে—ট্রি·· ট্রি···ট্রি···

—ভূতপ্রেত ? হেসে ফেললাম।

কুসুম জবাব দিল না সে-কথার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

—তুমি তো বানের কথা বলেছিলে। সে তোমাকে মড়া করে পালিয়েছে, বলছিলে না ?

কুসুম আমার দিকে ঘুরল। তার বিবর্ণ ধূসর চোখের চাহনিতে কী-একটা ছিল, যেন কান্না, যেন তিরস্কার—স্পষ্ট করে বলতে পারি নে, আমি কৌতুকে ফেটে পড়তে পারলাম না। সে আস্তে আস্তে বলল—আজ আমি বুড়ি হয়েছি, চুলে পাক ধরেছে, দাঁত পড়ে গেছে—দেহ ফাটিয়ে কালবীজের চাবা উঠছে ; কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি, কালপক্ষী এসে নেদে নিয়ে গেল ! ছোটবাবু, তারপর সাত-সাতটা পুরুষের ঘর করেছি আমি। কিন্তু যে এসেছিল, যেমন করে এসেছিল, যেমন ভাবে 'দে' বলেছিল, অই আসা অই ডাকটি আর শুনিনি। নারীর যৈবনের পিছু পিছু একদিন সে অমনি করে আসে, দে দে বলে ডাকে, কেউ কান করে না। আমার শুধু ভুল হলো, আমি সারা জেবন মাথা ঠুকে মরি—কালবীজের নাদি গতরে লিয়ে সুখের স্বাদটি আর জুটল না। আমি মড়ার বাঁচা বেঁচে আছি, ছোটবাবু। চিরকাল অই বাঁচাই বাঁচলাম।

আরেক গাছের গল্প

এই রকম গাছের কথা আমি অনেক গল্পে লিখেছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কিছুতেই লেখা হয়ে ওঠেনি। এর কারণ, বরাবর ওই একটাই দোষ—চরিত্র বলতে খালি চেহারা স্বভাব আর পরিবেশগত কিছু খুঁটিনাটির দিক নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে ভিতরের যা কিছু, চোখ এড়িয়ে যায়।

হুঁ, একটা গাছেরও চরিত্র থাকে। আর চরিত্র তাই, যা নিজের জোরে একটা নিজস্ব পরিবেশ ও আবহমণ্ডল গড়ে তোলে। ধরা যাক্ আমার কলকাতার ঘরের কাছে সেই শিমূল গাছটার কথা—যেটা সম্প্রতি কাটা হলো এবং আমিও যা নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে খবরের কাগজে লিখেছিলাম কয়েক প্যারা রিপোর্টাজ। সেই গাছটার কাঁধ বরাবর ছড়ানো মোটা একটা ডাল ছিল। মসৃণ নিটোল ওই ডালটায় যখনই ওপরের পাতার আড়াল থেকে ঝুপ করে নেমে আসতো একটা বুলবুলি কিংবা, কাঠঠোকরা, গাছটা পলকে দেখতাম অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ত শহরের বেলা দশটা হয়ে উঠতো। বাদবাকি সময় সে শুধু নিছক উদ্ভিদ, বড়োজোর একটা প্রাকৃতিক বিষয় কিংবা একটা নির্জন গ্রামের প্রতীক। একটা অলস কুকুর। নয়তো একটা পোড়ো বাড়ি।

অবশ্য গাছ নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই। আমি বা পাঠক কেউই আপাতত বোটানি নিয়ে বসিনি। আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত মানুষ। তার মানে, গাছের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে নিলেই হয়তো একটা উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কি সহজ কিছু? গাছে উঠে খেলা দেখা হয়, গাছতলায় নাপিত বা মুচি কিংবা ভিখিরিরা বসেন, রোদের মধ্যে অগত্যা একটা গাছ পেলেও অনেকসময় মাথা বাঁচে—যদিও মেঘ ডাকাডাকির সময় খবর্দার কেউ ভুলেও গাছতলায় যাবেন না!

তত্রাচ গাছে-মানুষে এই ঘনিষ্ঠতাকে আমি কিছুতেই মিলিয়ে দেওয়া বা মিলে যাওয়া বলব না। সে-মিল টের পেতে হলে আমি সেইসব গ্রামীন নির্জন গাছের কথা বলতে চাই, যাদের বর্ণনা অনেক গল্পে দিয়েছি।

বিলাঞ্চলের নিচু মাটিতেই একরকম অদ্ভুত গাছ দেখা যায়, যার পিছনে কিছু-না-কিছু আজগুবি কিংবদন্তী থাকবেই, থাকবে কিছু ভুতুড়ে গল্পসল্প, কিছু গ্রাম্য প্রেম ও যৌনতার লোকগাথা, যেমন ধরুন, কাপাসখালির মাঠের এইরকম অচেনা গাছের কথা—লোকে বলে, সেটা কামরূপকামাখ্যা থেকে উড়িয়ে এনেছিল কোনো এলোচুল সুন্দরী ডাকিনী এবং কালক্রমে কোনো চাষাপুরুষের সঙ্গে প্রেমে যৌনতায় লিপ্ত হবার ফলে ছেলেপুলের মা হয়ে একসময় নাতিপুতির কোলে মাথা রেখে মারা যায়। এদিকে গাছটা কিন্তু রয়ে গেল বছরের পর বছর। বিশাল ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তেনু সেখ এক গাঁওবুড়ো। সে ওই মাঠের নিচু জমিতে সারারাত একা বোরোধানের ক্ষেতে জল ছেঁচতো। সে আমাকে বলেছিল—ডাকিনী তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল! বলে গেল, যাব আর আসব। গেল সে মনের মানুষের কাছে—কিন্তু আর তার ফেরা হলো না। হায় রে হায়, সে যে আবেক মায়া—বিষম মায়া! জীবনের মায়া। ডাকিনী জীবনের টগবগে কড়াইয়ে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। জ্যান্ত সেদ্ধ হতে থাকল। আর তার উদ্ধার হলো না। এদিকে গাছটা উসখুস করে প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে তার ক্ষুধার্ত শেকড়গুলো বিদেশী মাটির রস টানতে টানতে গভীরে চলে গেল। হায়, তাদেরও আর ফেরা হলো না! গাছ এখন ওড়েন কেমন করে? নিচের টান ওপরের টান—তিনি ছটফট করেন মাঝখানটিতে। তুমি কাছে গিয়ে দেখো—ওই ছটফটানি টের পাবে। তাঁর গা-ময় চোখ, চারদিক থেকে তিনি তাকিয়ে আছেন আর তাকিয়ে আছেন যদি কোনোদিন রমণী ফিরে আসেন! যদি কোনোদিন ফিরে আসেন সুন্দরী, তো কী বিপদের কথা বলো! তবে তিনিও আর ফিরতে পারেননি, ইনিও আটকে থাকলেন। এ মহা 'সমিস্যে'!

সত্যি বলতে কী, এইসব শুনে আমার গা শিরশির করতো অস্বস্তিতে। অনেক নির্জন দুপুরে মাঠে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াতাম। আরে তাই তো! এ কাকে দেখছি? এ এক অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক আদিম সত্তা—হাজার হাজার চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। পাতায় পাতায় পাখির গু, খড়কুটোর বাসা, সাপের খোলস—ডালে ডালে কয়েকজাতের পাখি (তার মধ্যে বকই বেশি), কিছু শামুকখোল আর কদাচিৎ ডজনখানেক শকুন। তাদের দলের মোড়ল-শকুনটার মাথায় লাল ফেট্টি, গলায় লাল মাফলার। সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেই বুকে দম আটকে যেত।

তলায় ঘাস ঝোপঝাড়গুলো পাংশু—তবে সকাল-বিকেল দু'বেলা তলাটা

রোদ পায় বলে তারা গজাতে পেরেছিল। সেখানে একবার একটা মরা শেয়ালকে নিয়ে মহাভোজ হতে দেখেছিলাম। সেবার কালবোশেখির মরশুমে আচমকা এক বিকেলে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির ফলে শেয়ালটা বেঘোরে মারা পড়ে। তারপর তাকে টানতে টানতে আরো শেয়াল রাতারাতি ওখানটায় তোলে। তারপর কিছুদিন মরা চিমসে গন্ধে গাছটার ত্রিসীমানায় যাওয়া কঠিন ছিল।

গাছটার ওপর অত্যাচার অনেক হয়েছিল। তবে চরম কষ্ট দিয়েছিল একটা কুচুটে মেঘ। মাথার ওপর এসে হঠাৎ কী বেমক্কা ওপর থেকে ফুটপাতে পিক ফেলার মতো বদ্‌খেয়াল হলো তার, একটুকরো বাজ ছুঁড়ে দিলে চড়াৎ করে! ব্যস! গাছের ডগার ছড়ানো টানা ডাল বরাবর ছাল ছাড়িয়ে নেমে গেল বাজটা। কিছু আগুন জ্বলতে দেখল দূরে গ্রামের লোকেরা। সবাই ভাবল, অভিশাপ ফলল এতদিনে ফেরারী আসামীর বরাতে। কিন্তু আশ্চর্য, গাছটার তেমন কিছু হলো না।

এই গাছটার কাছে যাওয়া আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। শহরে চাকরি-বাকরির জন্যে হন্যে হয়ে গ্রামে কাটাচ্ছি তখন। কাজ নেই, দিনমান টো টো ঘুরি। ঠিক দুপুরবেলা চলে যাই গাছটার তলায়। কিছু দুর্বোধ্য ভাব মাথায় আসে, যা মানুষের ভাষা বা কোনো আর্টফর্মে প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু মনে হয়, এটা গাছ নয়—অন্য কিছু। প্রকৃতির একটা অভিধান খুলে যায় সামনে, পরিচিত শব্দাবলীর অনেক মানে ও ব্যাকরণ দেওয়া আছে যাতে, কিন্তু বুঝতে পারি নে। হু হু হাওয়া বয় খোলামেলা বিলের আকাশে। গাছের পাতাগুলো সরসর করে। সরু সরু কাঠি ভেঙে পড়ে পাখিদের পায়ের চাপে। পাখিরা ডাকাডাকি করে। ক্রমাগত যেন একটা পুরনো জংধরা ভারি কপাট খুলে যাবার ব্যাপার ঘটে। আমার চোখে নিষ্পলক হতে হতে গুরুতর অন্ধকার ঘেরে দৃষ্টি-পাতের সবটুকু পরিসর। কী যেন আছে ভিতরে, কে যেন আছেই, কোনো মহামহিম সম্রাট—সাপের খোলসে যার জয়পতাকা ওড়ে, মাথায় যার ঘূর্ণি হাওয়ার খড়কুটোখচিত মুকুট, প্রাকৃতিক ধ্বনিসমূহে চাপা কণ্ঠস্বরে যাঁর নিরন্তর আদেশ শোনা যায় এবং সঙ্গে স্থাবর জঙ্গমে তা পালিত হতে থাকে।...

সেই গাছটার তলায় বসে অন্যমনস্কভাবে আমি আমার সামাজিক আইডেনটিটি কার্ড নাড়াচাড়া করতাম। কার্ডে লেখা ছিল: শিক্ষিত বেকার! কার্ডটা দুমড়ে মুচড়ে যেত অজ্ঞাতসারে। তাকে হাস্যকর করে তোলা হতো চারিদিক থেকে। গাছের গোড়ায় লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে ঝুরোঝুরো মাটির স্তূপ জড়ো করে রেখেছিল

—তারা পাতাল-নগরী বানাতে ব্যস্ত সারাক্ষণ। সন্ধ্যার দিকে ধূর্ত মাকড়সারা তার ওপর জাল বুনে আড়ালে ওৎ পেতে বসে থাকতো। লালপোকা নীলপোকা-প্রমুখ কীটজগতের সুন্দর-সুন্দরীদের পদস্খলন হতো মধ্যে মধ্যে এবং চরম পরিণতিও ঘটতো। কখনো ধূর্ত মাকড়সাকে পিঁপড়েদের হাতে বন্দী দেখতে পেতাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতাম, কেউ বসে নেই কোথাও—আমি বাদে। আমাকে ফেলে রেখে প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুজগত এগিয়ে চলেছে নিজের নিজের কাজের পথে। কেউ চুপ করে বসে নেই। বাতাস, মেঘ, রোদ, গাছপালা। মাটিও তৈরি হচ্ছে অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে। আমি শুধু তৈরি নই—কারণ, আমি যেন প্রয়োজনহীন বিশ্বজগতের কাছে। এবং এই তুচ্ছতা ও অসহায়তার বোধ আমাকে শূন্যতার মধ্যে চুবিয়ে নীল করে তুললে, কালক্রমে, এক নির্জন দুপুরে গাছটায় উঠে বসলাম।

হুঁ, আমি মরতে চাইলাম। এ ছাড়া আর কাজের মতো কাজ কী-ই বা ছিল! পরে ভাবলাম, হয়তো এটাই আমার একমাত্র কাজ এবং পৃথিবী এটাই আমাকে দিয়ে করাতে চায়। বস্তুত, কিছুই তো অকারণ নয়—নিষ্ফল কিছু ঘটে না কোথাও। মানুষের আত্মহত্যাও এই পৃথিবীর অর্কেস্ট্রায় অবশ্য-প্রয়োজনীয় সুর তো বটেই। তাই কাকেও না কাকেও আত্মহত্যা করতেই হয়। যার যা ভূমিকা। আমি একজন আত্মহত্যাকারী হয়ে যাই না কেন? অতএব ধীরে-সুস্থে একটা উপযুক্ত ডাল বেছে নিয়ে বসলাম।

সেইসময় নিচে কাছাকাছি কোথাও কাদের কথাবার্তার আবছা শব্দ কানে এল। কারা কথা বলতে বলতে এই গাছটার দিকেই আসছে হয়তো। ঘন পাতার আড়ালে থাকায় তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু একটু পরেই যখন আমার ঠিক নিচে তারা এসে গেল, দেখতে পেলাম।

গ্রামের এইসব অন্ত্যজশ্রেণীর মেয়েরা মাঠ-খাল-বিল-নদী থেকে পাখি বা জীবজন্তুর মতো খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। এরা খবর রাখে, কোথায় কি-সব খাদ্য পাওয়া যায়। কোন মরশুমে শেয়াকুল, বৈঁচি, কুল বা 'আঁশটে' নামক লিচুর মতো এক ধরনের ফল ধরে। কোন জলায় সেরা জাতের কাঁকড়া আছে। কোথায় শালুক ফুলের 'ভাঁটা' বা ফল তৈরি হয়ে রয়েছে। কোনখানে 'মাখনা', 'লেকা', 'পদ্মচাকার' অঢেল ভাণ্ডার।

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিল তার ছেলে দুটো। দুটোই ন্যাংটা, কালো কালো দুটি ক্ষুদে প্রাণী, দারুণ ছটফটে, তেজি আর গোঁয়ার।

কারণ তারা মায়ের শাসন না মেনে খুব লাফালাফি করছিল।

তিনটি আদিম মানুষ গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো।

তারপর মেয়েটি বসে পড়ল সামনে পা-দুটো ছড়িয়ে। তার খালি ঝুড়িটা পাশে পড়ে রইল। সে অন্যমনস্কভাবে চুল থেকে উকুন বাছতে ব্যস্ত হলো। আর বাচ্চা দুটো মায়ের দু-পাশে ঘুরে ঘুরে খেলা করতে লাগল। পরস্পরকে ছুঁয়ে কেবলমাত্র তারা খিলখিল করে হেসে উঠছিল। মাঝে মাঝে তাদের মা ধমক দিয়ে শান্ত হতে বলছিল কিন্তু তারা গ্রাহ্যও করল না।

ক্রমশ বাচ্চাদুটোর খেলার গণ্ডী বাড়তে থাকল। এবার তারা মাকে ছেড়ে গাছটাকেই বুড়ি করল। লুকোচুরি খেলার মতো ঝোপঝাড় অনেক রয়েছে। মা তাদের সাবধান করে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে—'পোকামাকড় আছে!' কখনো চেঁচিয়ে উঠছিল সে—'কাঁটা ফুটবে!' তারা কানে নিলে তো!

চৈত্রের দুপুরবেলায় তখন চারপাশের মাঠে নাতিশীতোষ্ণ রোদ, আর কোণাকুণি ছুটে যাচ্ছে খড়কুটোর মুকুট-পরা ছোট ছোট ঘূর্ণি বাতাস। কোথাও কয়েক পোঁচ সবুজ রঙ—তিলের জমি, কোথাও ধু ধু শূন্য সাদা মাটি চষা ক্ষেত, কোনখানে বাদামী ও কালো ধানগাছের 'মুড়ো'—কেটে নেওয়া ধানের গোড়াগুলো দাবার ছকের মতো প্রসারিত। গোল দিগন্তরেখায় ধূসর গ্রামগুলোকে তখন খুব অবাস্তব দেখাচ্ছিল।

বাচ্চাদুটো একইভাবে খেলতে থাকল। এদিকে তার মা নিঃসঙ্কোচে বুকের কাপড় সরিয়ে স্তনের চারদিকে ঘামাচি গালতে মন দিল। দু-খণ্ড বেঢপ মাংস থেকে কীভাবে বাচ্চাদুটোর খাদ্য যোগানো হয়েছে ভাবতে আমার তাক লেগে গেল। সে তার একটা মাংসখণ্ড তুলে তলার দিকে স্ফোটকগুলো নখে আঁচড়াতে থাকলে আমি চোখ ঘুরিয়ে বাচ্চাদুটোর দিকে নিয়ে গেলাম ফের।

কিন্তু তাদের দেখতে পেলাম না। কোনো সাড়াও পাচ্ছিলাম না। আমার বুক ছাঁৎ করে উঠল অজানা ত্রাসে। এই বুড়ো শয়তান গাছটা তাদের গাপ করে ফেলল না তো?

হঠাৎ একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল তাদের একজন। তার মাথায় একটা লতাপাতার মুকুট। তারপর অন্য একটা ঝোপ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরলো তার ভাই। তার হাতে-একটা লালচে রঙ সরু সরু ফুলে ভরা ঝুপসি ডাল। দুটি মুখেই জোরালো হাসি। আমার অস্বস্তিটা কেটে গেল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম তৃপ্তিতে—আঃ!

অমনি মনে হলো, বাইরে চারদিকে রোদ, মাঠ এবং এখানে এই কিংবদন্তীর গাছটাও আমার তৃপ্তির ও দীর্ঘশ্বাসের চাপা শব্দ বিশালভাবে বাড়িয়ে দিল। খুশিখুশি নাচানাচি চলতে থাকল পাতায়, রোদের হাত ধরাধরি ছুটোছুটি শুরু করল চৈত্রের বাতাস, সারা আকাশ মাথার ওপর থেকে নিঃশব্দে হেসে তাকিয়ে রইল নিচের এই ঘটনার দিকে।

তখন ক্ষুদে মানুষদুটির অন্য মূর্তি। লতাপাতার মুকুট পরে একজন নাচ জুড়েছে—অন্যজন সেই ফুল ও ডালটা দুলিয়ে মুখে ঢাকের বোল বাজাচ্ছে: উর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্ ঢ্যাঙ্ ঢ্যাঙাঢ্যাঙ্ ড্যাডাং ঢ্যাঙ্…

মা একবার ঘাড ঘুরিয়ে দেখল তাদের। তারপর একটু হেসে ফের ঘামাচি গালতে লাগল। তারপর সে তার নাভির কাপড় সরিয়ে তলপেটের সাদা দাগগুলোয় পরম যত্নে আঙুল বোলালো। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম।

ছায়ায় ঘুরে ঘুরে দুটি ছোট্ট মানুষ খুব আদিম ধরনের একটা স্ফূর্তির আসর জমিয়েছে সন্দেহ নেই। তারা মাতাল মানুষের টলে-পড়ার ভঙ্গিটিও নকল করছিল মাঝে মাঝে। খুব সহজে তারা ক্লান্ত হবে বলে মনে হচ্ছিল না।

হঠাৎ তাদের মা ডেকে বসল।…'আয় রে! বেলা হলো, ইবারে যাব!'

অমনি বাচ্চাদুটো দৌড়ে এল কাছে। তারপর দুটি চঞ্চল ছাগলছানার মতো মায়ের দুদিকে বসে স্তন দুটো ভাগ করে নিল। দুজনেই অনেকটা কাত হয়ে রইল মাটিতে এবং খুব জোরে জোরে টান দিতে থাকল। মা কপট রাগে একজনের পিঠে থাপ্পড় কষে ধমকাল, 'আঃ! অত টানে না!' সেই বাচ্চাটা বোঁটা থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে হাসিমুখে দুষ্টুমির দৃষ্টি ছুঁড়ল একবার, তারপর ফের টানতে ব্যস্ত হলো।

মা দুটির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে দূরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, সে কোনখানে যাবে তার মতলব ভাঁজছে। তার কুঁচকে যাওয়া ভুরু, ছোট্ট কপালের কয়েকটি রেখা আর রুক্ষু চুলগুলো মিলে একটা অনিশ্চয়তাকে ফুটিয়ে তুলছিল। তার দুটি আনমনা চোখে আশা-নিরাশার রঙ যুগপৎ ঝিলিক দিতে দেখছিলাম। তারপর সে আস্তে আস্তে ঠোঁট ফাঁক করল।…'আজ' শব্দটা উচ্চারণ করেই সে একবার থামল। তারপর ফের শুরু করল, 'বিলের দিকে আজ যাব না রে, দেরি হবে। ডাইনীর খালেই নামি! আলুপুড়ী বলছিল, খুব গুগলি হচ্ছে উদিকে। গুগলির ঝোল রান্না করব। কেমন?'

বাচ্চাদুটো স্তন ছেড়ে স্যাঁৎ করে উঠে দাঁড়ালো। দু-হাত তুলে নাচতে নাচতে বলল, 'কী মজা, কী মজা!'

'ট্যাংরা মাছও পাওয়া যায় উখানে—আলুপুড়ী বলছিল'।

'কী মজা, কী মজা!'

'এ্যাই বড়ো কাঁকড়া ধরেছিল আলুপুড়ী। একটা-দুটো আমিও কি পাব না?'

'কী মজা, কী মজা!'

একবার করে মন্ত্রপাঠের মতো অন্যমনস্ক আশা-নিরাশাসঙ্কুল উচ্চারণ আর ওই উল্লাসের ধুয়া গাছতলাটা সুখে ও দুঃখে, ভাবনা ও স্বপ্নে ভরিয়ে দিতে থাকল। তারপর মা উঠল। বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে বাছারা ইখানে খেলা করো। কেমন? রোদ্দুরে ঝলসে যাবে, মাণিকরা! ছেঁয়াতে দু-ভায়ে খেলো। এসে ডেকে নোব। যাব, আর আসব!...না, না—যায় না! লুকিয়ে লুকিয়ে খালে নামব যে! তোরা থাকলে মিনসেদের চোখ যাবে। তাড়া করলে তোদের সামলাব, না পালাব? লক্ষি সোনারা আমার।'

বুঝলাম, ডাইনীর খাল ইজারা করে দেওয়া হয়েছে। মাছ ধরে নেবে বলে ইজারাদার কাকেও নামতে দেয় না। মেয়েটি লুকিয়ে নামবে। তাই কি এখানে এতক্ষণ ওৎ পেতে সুযোগ খুঁজছিল সে?

ডাইনীর খাল সামান্য দূরে। একটা নালা বা কাঁদর সেটা। বিল থেকে বেরিয়ে মাঠ দু-ভাগ করে দূরে নদীতে গিয়ে মিশেছে। সেদিকে কোথাও কোনো লোক দেখতে পেলাম না।

বাচ্চাদুটি জড়োসড়ো ও মনমরা হয়ে তাঁদের মায়ের চলে যাওয়া দেখতে থাকল। যতক্ষণ না তার মায়ের মূর্তি অস্পষ্ট হয়ে এল, তারা ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আমি উঁচুতে থাকায় মেয়েটিকে মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকাতে দেখছিলাম।

এবার ক্ষুদে প্রাণীদ্বয় সরে দাঁড়াল পরস্পরের কাছ থেকে। খেলতে শুরু করল আগের মতো। কিছুক্ষণের জন্য বাতাস একটু থেমেছিল। সেই সুযোগে আমার কাছাকাছি কোথায় একটা ঘুঘু ডাকতে থাকল। গুঁড়ির একটু ওপরে একটা কাঠঠোকরা বুকে হেঁটে এগিয়ে চাপা ঠকঠক ঠোকরাতে ব্যস্ত হলো। খানিক পরে ডেকে উঠল টানা সুরে ঝিঁঝিঁ পোকা। ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা পেয়ে বসল আমাকে। শুধু আমাকেও নয়, এই বুড়ো গাছটাকে এবং পরিবেশকেও। সেই ঘোর গাঢ় হলে নিচের প্রাণীদুটিও দেখি অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছে। পাশাপাশি

দুটিতে জড়োসড়ো ঘুমোচ্ছিল। সেই সময় চিনতে পারলাম, ভাইদুটি যমজ।

এই বিশাল প্রকৃতিতে দুটি ছোট্ট ন্যাংটা মানুষকে ঘুমোতে দেখে আমার মনে হলো, ওরা এত অসহায়! যদি এসময় ওদের মাকে ইজারাদার ধরে থানায় নিয়ে যায়, কিংবা কাঁকড়ার গর্তে হাত ভরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা পড়ে! নানারকম উদ্ভট অথবা স্বাভাবিক আশঙ্কায় আমি অস্থির হচ্ছিলাম। কারণ, প্রকৃতিতে মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোনো বিবেক দাঁড় করানো নেই—সেখানে কোনো অনুশোচনা নেই, নেই কোনো সুখ-দুঃখবোধ বা ভালো-মন্দর সংজ্ঞা। সবই সেখানে কার্যকারণ পরম্পরা, প্রতিটি ঘটনাই পৃথক পৃথক ঘটনার জন্য একেকটি চাবি—সেই চাবি টেপা চাই-ই, নয়তো অন্যগুলো ঘটবে না। এবং এভাবেই অনাদিকাল থেকে জগদ্ব্যাপার বলে একটা কিছু চলছে।

আমার আরো আশঙ্কা হলো, বিষপিঁপড়ে, পোকামাকড়, কাঁকড়াবিছে কিংবা সাপের রাজত্ব জায়গাটা। যদি এই ছোট্ট অসহায় মানুষদুটির কোনো বিপদ ঘটে যায়, মানুষ হিসাবে নিজের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব?

আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে কেন ওভাবে গাছের ডালে উঠে বসেছি! আত্মহত্যার ব্যাপারটা তিনটি মানুষ এসে পড়ামাত্র কোথায় লুকিয়ে পড়েছিল। আমি 'আত্মহত্যা'কে এখন খুঁজে দেখলাম। সে কি গিরগিটির মতো ক্যামোফ্লেজ করে ওৎ পেতে আছে কোথাও? তার টিকিও খুঁজে পাওয়া গেল না।

গাছের নিচের ঘুমন্ত মানুষদুটো আমাকে টানতে থাকল। কিন্তু পাছে ওরা চমকে বা ভয় পেয়ে না যায়, খুব সাবধানে নেমে গেলাম।

গুঁড়ির কাছাকাছি ধবধবে মাটিতে ওরা শুয়ে আছে। আমি একটু তফাতে বসে ওদের দেখছিলাম। ঠোঁটগুলো একটু ফাঁক করে ওরা ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটগুলো মাইটানার অভ্যাসে নড়ছে তালে তালে—মাঝে মাঝে। ওরা কি স্বপ্ন দেখছে এখন? কী কী স্বপ্ন ওদের পক্ষে দেখা সম্ভব? ওরা নিশ্চয় রেলগাড়ি, মঞ্চসেতু, কারখানার অভ্যন্তরভাগ, স্কাইক্র্যাপার বা ফোয়ারার স্বপ্ন দেখছে না—যা লক্ষাধিক টাকায় রাজধানীর কেন্দ্রে তৈরি। ওরা নিশ্চয় দেখছে না শতাব্দীর মহান স্থপতি ও কারিগরদের—দেখতে পাচ্ছে কি মহামতি আইনস্টাইনকে, যাঁর সাদা চুলের নিচে মহাবিশ্বের স্থান-কাল-সমন্বিত চতুর্মাত্রিক আয়তের বোধ, ওরা কি দেখতে পাচ্ছে লোভেল-আর্মস্ট্রংদের চাঁদের পিঠে, কিংবা সোয়ুজ কিংবা স্কাইল্যাব? ওরা কি শুনতে পাচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, বড়েগোলাম আলির ঠুংরি, রবিশঙ্করের সেতার?

…ওরা দেখছে লতাপাতার মুকুট, ফুল ও একটু টুকরো ডাল, একটা ধূসর ঘুঘু পাখি, একটা ঝিঁঝিঁ পোকা, একটা হন্যে হওয়া ক্ষুধার্ত কাঠঠোকরা! হয়তো দেখছে, ঘাসের বুক থেকে ডিগবাজি খাচ্ছে একটা সবুজ ঘাসফড়িং, ঘাসফুলের মাথায় উড়ন্ত একটা প্রজাপতি, নীলচুল কোন শেয়াল, কিছু সকাল-দুপুর-সন্ধেবেলা ও রাত্রি, জোনাকিজ্বলা অন্ধকার, পেঁচার ডাক, জ্যোৎস্নায় উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস। ওরা তাদের ডানার শব্দ শুনে জলপরীদের কথা ভাবছে—যাদের রূপকথা মা শুনিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা।

হঠাৎ একটা বাচ্চা উঠে বসল হাউমাউ করে কেঁদে—সে মাকে ডাকতে ডাকতে চোখ কচলাতে থাকে। পরক্ষণে তার জুটিও কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসল। আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। তক্ষুনি এগিয়ে ওদের দু-হাতে ধরে ফেললাম—'কী হলো, কী হলো?'

ওরা আচমকা আমাকে দেখে ভড়কে গেল নিঃসন্দেহে! বিকট চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আবার। আমি দুটি প্রাণীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাদের বাগ মানানো গেল না। আরো ভয় পেয়ে তারা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করল।

তখন বেমক্কা আমি গান গেয়ে উঠলাম। এটাই শেষ চেষ্টা মনে হয়েছিল। এছাড়া আর কী করা যেতে পারে, মাথায় আসছিলও না।

দেখলাম, তাতে কাজ হলো। আমি একটা পুরনো লোকসঙ্গীত গাইছিলাম। বেশ কিছু কমিক্যাল ব্যাপার তাতে ছিল। ভাঁড়ামির জোরালো নমুনা এটি। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের কাছে অবশ্য এর কোনো আবেদনই নেই বলে এখানে উদ্ধৃত করতে চাইনে। তাতে এক গ্রাম্য ভাঁড় কোনো এক বাজারে গিয়ে কীসব বিদঘুটে ব্যাপার দেখেছিল, তার নমুনা আছে।

ছেলেদুটি এবার বশ মানল। শুধু তাই নয়, খুব রসগ্রাহী শ্রোতার মতো হাসিমুখে সপ্রশংস তাকাল। শেষে আমি নাচও জুড়ে দিলাম। অঙ্গভঙ্গি করে জোর জমিয়ে তুললাম।

তখন আর তারা থাকতে পারল না। তারাও নাচতে শুরু করল। আমরা তিনটি মানুষ এমনভাবে এই নাচগানের আসর জমিয়ে তুললাম যেন পৃথিবীকে আমরা থোড়াই পরোয়া করি। আমি থেমে গেলে ওরা তাগিদ দিচ্ছিল। তিনটি মানুষ এক হয়ে ক্রমশ হাত ধরাধরি করে গাছটাকে ঘিরে এক ধরনের আদিম উৎসবে মেতে গেলাম।…

তারপর ?

তারপর আর কী ! ওদের মা আসার আগেই বিদায় নিয়ে চলে আসি। ওরা দুটিতে বিষণ্ণমনে আমার চলে যাওয়া দেখে। মা ফিরে এলে নিশ্চয় এসব ঘটনা বলে থাকবে। তখন গ্রামীন সরলচেতা স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় ভেবে থাকবে যে কোনো দেবতা এসে ওর বাচ্চা দুটোর সঙ্গে ফুর্তি করে গেছেন। খুব অবাক হয়ে এবং পরম বিশ্বাসে সে সেই মহান দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্য ইত্যাদি প্রার্থনা নিশ্চয় করেছিল। সে নিশ্চয় তার বাচ্চাদের নামে ধনসম্পদ ও দুধে-ভাতে থাকার বর চেয়ে মাথা কুটেছিল।

তার দুর্ভাগ্য, কিছুই ঘটেনি বরাতে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের বিধবা স্ত্রী হিসেবে তাকে একদা শহরের ফুটপাতে এসে জুটতেও দেখলে অবাক হব না।

আমি কিন্তু কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। কারণ, এখন আমি তো জীবনে (!) প্রতিষ্ঠিত মানুষ। সুন্দরী স্ত্রীলোক, সুরম্য ঘর ও সভ্যতার প্রচুর ব্যাপারে মোটামুটি স্বচ্ছন্দ সচ্ছল। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আর এই সাজানো সংসারের দিকে সুখী-ভোগী চোখদুটি তুলে তাকাই। অমনি মনে পড়ে যায়, সেই গাছটার কথা ! টের পাই, এই বেঁচে থাকার সুখ আমি পেতাম না—যদি সেই চৈত্রের দুপুরে একটা ভুল করতে গিয়ে থমকে না দাঁড়াতাম এবং থমকে দাঁড়ানোর মূলে ছিল তিনটি গ্রাম্য সামান্য মানুষ—তিনটি ক্ষুধার্ত প্রাণী মাত্র ! অথচ তারা আমাকে জীবনের গোপন তাৎপর্য টের পাইয়ে দিয়েছিল।

আমি তো অনেক কিছু পেলাম। কিন্তু তারা কী পেল ?

এই প্রশ্ন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে দেখি সেই কিংবদন্তীর বিশাল গাছটা আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে। তার নখওয়ালা শেকড়গুলো কি তলায় তলায়, গভীরে, নিঃশব্দে বাড়তে বাড়তে এগিয়ে আসছে এই নিশ্চিন্ত সুখের তলায় ? তার ডালপালা কি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে ঢেকে ফেলছে চারদিকের আকাশ ? আমি থরথর করে কেঁপে তার উদ্দেশ্যে নতজানু হয়ে বলি—ক্ষমা করো ! হায়, প্রকৃতিতে কিন্তু ক্ষমা বলে কোনো শব্দই যে নেই !

সূর্যমুখী

এ মেয়ে সেই মেয়ে। নবীন খুবই চেনে। পাড়াগাঁয়ের পথে দুপুরবেলার ভিড়ে অনেক সোনামুখ রাঙামুখ ঢলঢলেমুখের এক মুখ। কত নামে নবীন তাদের ডাকে। মুখের নামে ডাকে। আর এই মেয়েই তো বলে, 'কাপুড়ে'র মনে যেন নামের লিস্টি নেকা আছে গো!

হুঁ, এই সেই মেয়ে। কিন্তু কোন্ গাঁয়ের পথে চেনাচিনি ঠিক মনে পড়ে না। কবে কিছু কিনেছিল কিনা—রাঙা ব্লাউস কিংবা সাদা লেসের নকশা-কাটা সুনীল সায়া, অথবা বোনের জন্যে রঙ ঝিলমিল ফ্রক, ভায়ের জন্যে ডোরাকাটা পেণ্টুল—বলতে পারে না নবীন। কতজনে তো কেনেই না। শুধু হাত বুলিয়ে রঙ ছোঁয়, নরমতার স্বাদ নেয় টিকলো আঙুলে—আর কত হাতে শাঁখা-নোয়া, কত হাতে বেলোয়ারি চুড়ি, কত হাত শূন্য ধূসর ও বিষাদময়।

এ মেয়ে কি কিছু কিনেছিল কোনোদিন? দু-চারবার খুঁজে ছেড়ে দেয় নবীন। হাতের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয়। সধবার হাত। মুখের দিকে একবার আলগোছে ঘুরে তাকিয়ে নেয়। বিকেলের নিস্তেজ রোদ্দুর উরুলিঝুরুলি রুক্ষু চুলের ওপর আচমকা হু হু ফেটে পড়ে এবং জলে যায়। ঘোর লাল আর মারমূর্তি সিঁদুরটা তেড়ে আসে নবীনকে। সে চোখ নামায় পথের মাটিতে। কী নামে ডেকেছিল এই মেয়েকে? সোনামুখী না রাঙামুখী, ঢলঢলমুখী? নামের লিস্টিতে কত নাম নেকা আছে নবীনের। ডেকেছিল শশীমুখী, বিধুমুখী, হাসিমুখী—নাকি মধুমুখী? নিশ্চয় একটা কিছু বলে ডেকেছিল। মনে নেই, মনে পড়ে না। ছটফট করে মনে মনে। এলোমেলো পা পড়ে তার। ধুলোয় ধূসর স্যাণ্ডেল দুটো সরু চিকন খটখটে আলপথে চাপা আওয়াজ তোলে। তারপর আর মন মানে না নবীনের। এই অগাধ নির্জনতা, সুবিশাল মাঠ, এই শান্ত বিকেল—তার মন ছটফট করে।

কী হলো 'কাপুড়ে'? দাঁড়ালে ক্যানে গো?…পিছন থেকে পাখি স্বরে কথা বলে ওঠে মেয়েটি।

একটা কথা।···বলে নবীন কাপুড়ে ঘোরে। খিকখিক করে একটু হাসে। বনকাপাসি—নাকি ঝাঁপুইহাটিতে দেখেছিলাম ?

মেয়েটি হাসে। ভুরু কুঁচকে বলে, উঁহু—হলোই না।

চণ্ডীতলা ?

মরণ আমার! সব থাকতে ওই গাঁয়ে ? কথায় বলে—'এ গাঁয়ে ভাতার নাই তো নগাঁসিঙাড়' !*

কী ঠোঁটকাটা মেয়ে রে বাবা! এই অবেলায় ধু ধু মাঠ—মানুষ নেই জন নেই গাছ নেই পালা নেই, গায়ে পায়ে ঢলঢল যৌবন এবং পরপুরুষ। নবীন বিবেচনা করে। সে বিব্রতমুখে বলে, শানকিভাঙা ?

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে মেয়েটি খিলখিল করে হাসে।···হলো না হলোই না।

আমপাড়া ?

চোখ পাকিয়ে সে জবাব দেয়, হুঁ—আর কাজ ছিল না। স্যাখের গাঁয়ে জম্মো নিয়েছিলাম।

তাও বটে।···বলে নবীন পা বাড়ায়। আমপাড়ায় তো সবাই মুসলমান। পিঠের বোঁচকাটায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সে কুঁজো হয়ে হাঁটে।

পিছন থেকে মেয়েটি বলে, তাহলে পারলে না তো ?

নাঃ, পারলাম না।

হট্ মানছ ?

মানছি।

নবীন কাপুড়ে একটু বিরক্ত হয়েছে। হয়তো নিজের ওপর, হয়তো মেয়েটির ওপর। কিন্তু এদিকে কী এক জ্বালায় পড়া গেছে। পিছনে কী টান, কী টান! এ মাঠ যেন মাঠ নয়—নদী। উজানে যেতে বড়ো কষ্ট হয়। বগলের ফাঁক দিয়ে বাঁধা বোঁচকাটা পিঠের ওপর চেপে বসছে আস্তে আস্তে। একটা চাপা কষ্ট শরীরে আর মনে গরগর করছে। নবীনের ঘাম হচ্ছে। কোথায় দেখেছিল—অনেক অনেক বার দেখা, দরাদরি, ব্লাউস কিংবা সায়া কিংবা ফ্রক কিংবা পেন্টুল, খুব চেনা মুখ—অথচ মনেই পড়ল না। যেন মনে পড়লে কিছু একটা ঘটে যায়।

কাপুড়ে!

* মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রবাদ। লালবাগ মহকুমায় একটা থানা নবগ্রাম বা নগাঁ। তার পাশেই সিঙাড় নামে একটা গ্রাম আছে। কেন এ প্রবাদ চালু জানা নেই। কোনকালে বুঝি ওখানে প্রচুর বর কিংবা স্বামী সুলভ ছিল!—লেখক।

হুঁ, বলো।

কী বলে ডেকেছিলে মনে নাই ?

না তো। খুঁজছি।

তাও ভুলে বসেছ! কী মানুষ রে বাবা!···পিছনে মেয়েটি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে, তা নবীন অবিকল দেখতে পায়।

নবীন বিরক্ত হয়েই বলে, কত গাঁয়ে ঘুরি—কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। অত কি মনে থাকে ?

তবে যে খুব চেনা বললে ?

হ্যাঁ—বললাম। আমাদের এমন হয়। চেহারা দেখে চেনা লাগে—ওটুকুনই।

মেয়েটি যেন নিরাশ হলো। হাসল একটু। কিন্তু কেমন দুঃখিত হাসি।··· কপাল আমার! নিত্যিকার চেনা মানুষ দেখে দৌড়ে এসে সঙ্গ নিলাম, তো এ কী বুলি মানুষের! জানো কাপুড়ে, আজ আমার আসাই হতো না—তোমাকে না দেখতে পেলে ? পিসি একা একা ছাড়তো ভেবেছ ? যা তা লয় বাবা, ধুল্লোউড়ির মাঠ—বুক ফাটিয়ে চ্যাঁচালেও কেউ আসবে না।

মুখ তুলে মাঠটা একবার দেখে নবীন। সামনে পুবে দূরে—অনেক দূরে ধূসর গ্রাম পিছনের পড়ন্ত সূর্যের লালচে রোদ্দুর মুছে ফেলছে গা থেকে। শূন্য ক্ষেতে বন-চড়ুই শালিখ পায়রার ঝাঁক শস্যদানা থেকে ঠোঁট তুলে অন্যমনস্ক তাকাচ্ছে। দূরে আল কেটে কেটে তৈরি মরশুমী গাড়িচলা পথে ছইঢাকা একটা গোরুরগাড়ি চাকায় চাকায় ধুলো উড়িয়ে চলেছে। আরো দূরে ঘরে-ফেরা গোরু-বাছুরের ক্ষুরের চাপে উড়ন্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ধুলোর ধোঁওয়া ভাসছে। এই মাঠে চৈত্র থেকেই ধুলো ওড়ে দিনরাত। যেতে যেতে নখের আঁচড়ে মুঠো মুঠো ধুলো ওড়ায় হাওয়া। ধুলোয় ধুলোয় ঘূর্ণি বয়ে যায় অগ্নিকোণ থেকে বায়ুকোণে—মাথায় তাদের খড়কুটো, পাখির পালক, শুকনো পাতা আর সাপের খোলস দিয়ে গড়া অদ্ভুত 'মটুক'। এ মাঠ তাই 'ধুল্লোউড়ির মাঠ', দুপুরে এ মাঠে সোনালী ঝড়ের ছবি আঁকা থাকে। থরথর করে সেই ছবিখানা কাঁপে। আর উদাস নিঃঝুম পাড়াগেঁয়ে দুপুরে কাঁথা সেলাই করতে করতে মেয়েরা গুনগুন করে গায় :

'ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই
রোদ ঝনঝন করে।
পানের সখার সঙ্গে দেখা
বেলা দুপহরে।'······

…'আর যাব না আর যাব না
ধুল্লোউড়ির মাঠে।
একলা পেয়ে গায়ে-গতরে
ডংশালে কালসাপে॥'
…'ও ছুঁড়ি তোর পিঠে কী
মর্ চোখখাকী তোর তা কী,
ধুল্লোউড়ির মাঠে
বসতে ধুলো শুতে ধুলো
আমি করব কী॥'…

তবে কিনা নবীন কাপুড়ে ফেরিওলা মানুষ। সূর্যকে পিছনে নিজের ছায়া সামনে রেখে সে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে গাঁওয়ালে যায়, আবার সূর্যকে পিছনে নিজের ছায়া সামনে নিয়ে সে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে ঘরে ফেরে। সূর্যটি তখন যেমন মাটি ছুঁইছুঁই, ফেরার সময়ও তেমনি মাটি ছুঁইছুঁই—রঙ ঘোর লাল, ডিমের কুসুম। তখন যেমন নবীনের ছায়াটি লম্বা, এখনো তেমনি লম্বা। ধুলোউড়ির মাঠের সোনালী ধুলোমাটির ওপর সে দু-বেলায় শুধু বেড়ে যায় আর বেড়ে যায়। নবীন পিঠের বোঝাটির চাপে একটু ঝুঁকে শুধু ছায়াটিকেই দেখতে দেখতে হাঁটে। নিজের চেয়ে ছায়াটি বেড়ে যায়, কেবলই বড়ো হতে থাকে—এ এক আশ্চর্য বটে।

আজ অন্য রকম। তার ছায়ার ওপর আরেক ছায়া। ধুলোউড়ির মাঠের ওপর আজ আরেক ধুলোউড়ির মাঠ এসে পড়েছে। বিকেলের ওপর দুপুরের উৎপাত—সেই সোনালী ঝড়ের ছবি। আর ধুলোউড়ির মাঠটি এখন কাঁসর ঘণ্টা। একটু ছুঁলেই ঢঙঢঙ্ করে বেজে উঠবে ভয় আছে। নবীন সাবধানে হাঁটে। কী কথা বলে বসল মুখরা মেয়েটি, গা বাজে নবীন কাপুড়ের। যা তা নয় বাবা, ধুল্লোউড়ির মাঠ—বুক ফাটিয়ে চ্যাঁচালেও কেউ আসবে না।

কী একটা হয় নবীনের। গুরগুর করে কোথাও কী চাপা আওয়াজ ফোটে নাকি? যেমন কিনা সারা আকাশ খালি, অথচ দিগন্তের কোথায় চুপি চুপি ঝিলিকি, থমথমে ভাব, সামান্য আবছা ওদিকটা, কোথাও কোনো দূরের দেশে নাকি ঝড় চলেছে—ঠিক সেই রকম লাগে।

তখনই শনশন করে একটা হাওয়া এল গায়ে। চুলগুলো দুলতে লাগল। কিছু ধুলো উড়ে গেল সামনে দিয়ে।…কাপুড়ে, তাহলে বুঝলে তো?…হাঁটুর

ওপরটা ঢাকতে ঢাকতে মেয়েটি বলল।

হুঁ।

চেনা মুখের সাহসে সাহস। তাইতে আসতে দিলে পিসি। কিন্তু ওম্মা!··· আবার খিলখিল করে সে হাসে।···এসে দেখি, কাপুড়ে বলছে কি না—আমাদের অমন হয়। কী হয়, কেমন হয় শুনি? হ্যাঁ গো কাপুড়ে, তা হলেও বাপু কথা আছে। কাকেও-কাকেও তো মনে পড়বে? সব্বাই তো এক ছাঁচে গড়া লয়। না কী?

নবীন ঘোঁৎ ঘেঁৎ করে বলে, পড়ছে বই কি মনে।

ছাই পড়ছে। আমাকে তুমি কী বলে ডেকেছিলে, শুনবে? সুজ্জমুখী।

নবীন দাঁড়ায়। পিছনে ঘুরে বলে, সূর্যমুখী?

হুঁ, সুজ্জমুখী।

অন্যমনস্ক নবীন বলে, ক্যানে?

মরণ। তা তুমিই জানো ক্যানে বলেছিলে।

নবীন আবার হাঁটতে থাকে। উরু দুটো ভারি লাগে তার। বুকের ভিতর হাতুড়ি পড়তে থাকে। কেন এমন হচ্ছে সে বুঝতে পারে না। একটু পরে সে বলে, তুমি আগে যাও না বাপু। পিঠে ভার নিয়ে ঘুরতে অসুবিধে হচ্ছে। আগে আগে চলো, সোজামুখে কথা বলতে বলতে যাই।

উঁহু।···মাথা দোলায় সে।···বেশ তো যাচ্ছি।

নবীন আবার দাঁড়ায়। শুকনো হেসে বলে, কাজের কথা নয়। এস, এগোও। কথায় বলে, পিছের মানুষকেই পোকায় (সাপে) কাটে।

আর আগে গেলে যে বাঘে খায় তার বেলা?···সে চাপা হাসে। নবীন একটু সাধে।···আহা শোনই না কথাটা। পিছনে একটা কিছু হলে জানতেই পারব না।

ভুরু কুঁচকে তাকায় মেয়েটি। নাকের ফুটো মৃদু কাঁপে। নাকছাবিটা ধু ধু জ্বলে।··কী হবে, শুনি?

কথার কথা। আগে আগে যেতে হয় মেয়েছেলেদের।

রূপ দেখতে দেখতে যাবে নাকি? ও কাপুড়ে!···বাঁকা ঠোঁটে হাসে সে।

মলোচ্ছাই!··ফের বিরক্ত হয়ে নবীন পা বাড়ায়।···সূর্যমুখীর মুখ কি পিঠের দিকে নাকি? বলে সে একটু জোরেই হাঁটে।

ধুপ ধুপ শব্দ ওঠে পিছনে।···একটু আস্তে চলো, বাপু। অত রাগ ক্যানে

তোমার ? কাপড় গছাবার সময় তো দেখি না—তখন মুখে মধু ঝরে যেন।

নবীন রা কাড়ে না। সেই চাপা গুরগুর আওয়াজটা মন দিয়ে শোনে। একবার করে মুখ তুলে আদিগন্ত বিশাল ব্যাপকতা মেপে নেয়। নির্জন ধু-ধু ধুলোউড়ির মাঠ। মাথার ওপর বালিহাঁসের ঝাঁক চলে যায় শনশন শব্দে। ফিনফিনে রেশমী রোদ্দুরটাও কিছুক্ষণ কেঁপে ওঠে কুচি কুচি ছায়ার আঁচড়ে।

হ্যাঁ কাপুড়ে, সেদিন সেই জামাটা দেখলাম—সামান্য দু-আনার জন্যে দিলে না, মনে পড়ছে না ? বেচে দিয়েছ, না আছে গো ? হুঁ, কাপুড়ের রাগ হয়েছে।

পিঠের ওপর কণ্ঠস্বর, যেন দু-কানে এসে শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝাপটানি লাগে—নবীন চমকায়। তবু কথা বলে না। কী জানি, অমর্ত ফুলের ঘ্রাণে আত্মা কোটরে সাপের মতো নড়ে ওঠে।

চপলতা করে সে পিছনে। একবার তোমার বুলিটা শোনাও না বাপু। ফক-সায়া-বেলাউস ! ফক-সায়া-বেলাউস।

পিছনে অদৃশ্য ফুলের বনে ঝড় বইছে। ফুলের বনে এখন সোনালী ঝড়ের ছবি—ধুলোউড়ির মাঠে একটা দুপুর থরথর করে কাঁপছে। নবীন দরদর করে ঘামে। কোনো কথা বলে না।

আর কী বলো যেন ?···'নীলাম নীলাম। কী নিলাম ?' 'পছন্দ !' 'নীলাম নীলাম। কি নিলাম !' 'পয়সা !' পাখির বুলি শিখেছ বাপু ! আহা, বলোই না একবার, ও কাপুড়ে ! 'নিলাম পয়সা, দিলাম কী ?' তারপর কী বলো যেন ? ছাই, মনে পড়ছে না। নিলাম পয়সা, কী দিলাম ··ও কাপুড়ে, কী দাও বলো না ?

নবীন হঠাৎ মুখটা ঘোরায়, চোখ দুটো কাঁপে—বলে, নিলাম পয়সা দিলাম রূপ-যৌবন।

পলকে লজ্জায় রাঙা 'সূর্যমুখী' মুখ নামায়।···যাঃ !

হাঁ, তাই তো দিই।

তুমি বড্ড কী যেন। যাও !

নবীন বলে, সেই জামাটা দেখবে না ?

এখন পয়সা নেই সঙ্গে।···মুখ নামিয়ে সে পা বাড়ায়। কণ্ঠস্বরও কাঁপছিল।

পয়সা পরের কথা।···নবীনের কণ্ঠস্বরও কাঁপে। অমন জিনিস কখন কোথায় কার হাতে চলে যাবে, ঠিক নেই। কোন প্যাঁচামুখীর ময়লা গতরে। ছ্যা, ছ্যা ! কেন মনে খেদ থেকে যাবে—সূর্যমুখী বলে ডেকেছি। এস, ছাখো।

নবীন বোঁচকাটা আলের ওপর ঝকঝকে কঠিন মাটিতে ধুপ করে ফেলে দেয়। পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে। ছোট্ট আকন্দ ঝাড়ের কাছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেছে। আলতারাঙা পায়ের আঙুলে শুকনো ঘাস টানে সে। ঘাস দেখে। চিবুক বুকে বিঁধে থাকে। খোঁপা সামান্য টলে পড়ে চৈত্রের হাওয়ায়। রুক্ষ উরুলিঝুরুলি কিছু চুল ওড়ে কানের পাশে, কপালের ওপর। নাকের ডগায় ঘামের ফোঁটা টলটল করে। নাকছাবিটা হু হু জলে যেতে থাকে। দুটো বাহু এসে তলপেটের নিচে মিলে থাকে, আঙুলে আঙুলে জড়ানো। কী বাহু, নাকি দুটো লাজুকতাময় নরম প্রতিরোধ। কী বুক, ওঠে পড়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসে পুষ্পের ঘ্রাণ, অসামান্য সুখবৃক্ষর দুটি স্বাদু ফল। আর নবীনের মনে হয়, ওখানে কোথাও জল দাঁড়ায় না, রেশমি ব্লাউস পিছলে খসে পড়ে যায়। আর রক্তে কাতর হতে থাকে নবীন কাপুড়ে, মাংসে ছটফট করে তার ফেরিওলার আত্মাটা। সে বলে, হাঁ, দেখ—দেখতে দোষ নেই। সব—সব দেখ, যা পছন্দ হয়। এইটে, এইটে···কিংবা এইটে···। একটার পর একটা রঙিন ব্লাউস বের করে তুলে ধরে সে। দাঁতে হাসি চকচক করে তার।···কী হলো? সূর্যমুখী বলে ডেকেছিলাম, তুমিই বললে। তাই ডাকছি সূর্যমুখী, রাগ করলে নাকি? আর লজ্জাই বা কিসের? ধুলোউড়ির মাঠের এ বাজারে আর তো কেউ নাই। শুধু দুজনা—তাই না সূর্যমুখী? তুমি একলা খদ্দের, আমি একলা দোকানদার। কী বলো···ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসে নবীন।

আড়চোখে তাকিয়ে আছে সূর্যমুখী, নবীন টের পায়। নবীন 'কাপুড়ে-মানুষ' বলেই মেয়েমানুষের কত কিছু টের পায়। একটা করে ভাঁজ খোলে, পড়ন্ত বেলায় রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, লাল রঙের আগুন জ্বলে, নীল রঙের আগুন জ্বলে। সূর্যমুখীর সরম সংকোচ ভীরুতা জড়তার ওপর অতি প্রযত্নে আঁচ বোলাতে থাকে নবীন। বুক ঢিপঢিপ করে তার। টেরচা চোখে তাকিয়ে ধুলোউড়ির নির্জনতা বার বার দেখতে ভোলে না। তার এমন হয়, এক দেহ ঊর্ধ্বমুখে কিছু প্রার্থনা করে চলে—আরেক দেহ পায়ের তলে বসে অস্থির আর মিটিমিটি চোখে প্রার্থনা দেখে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো প্রতীক্ষায়।

সূর্যমুখী এবার ঠোঁট কামড়ায় একবার। তারপর অস্ফুটে বলে, সেইটে কই?

নবীনের নাভিমূল থেকে প্রচণ্ড চিৎকারটা ঠোঁটে এসে মৃদু হয়, স্খলিত পাতার মতো সামান্য খসখস করে মাত্র।···কোনটা, কোনটা গো সূর্যমুখী?

দু-পা এগিয়ে সূর্যমুখী অল্প হেসে বলে, সেইটে—সেদিন যেটা দেখেছিলাম।

নবীন দু-হাতে জামাগুলো ওলট-পালট করতে করতে বলে, কী রঙ? হাত-কাটা, না গোটা হাতা? সাইজ কত?

হাঁটু দুমড়ে নিঃসঙ্কোচে বোঁচকার ওপরে বসে পড়ে সূর্যমুখী।···হাতকাটা গো, হাতকাটা। ওই তো পরছে সবাই আজকাল। বেশ দগদগে জবাফুলের মতো রঙ।···আলতো আঙুলে একটা করে ওলট-পালট করে সেও, ঠোঁট বাঁকা, তাচ্ছিল্যের ভ্রূভঙ্গি।

নবীন ছটফট করে একটা মোড়ক প্রায় ছিঁড়ে ফেলে। রুদ্ধশ্বাসে বলে, এই হচ্ছে গে সবচেয়ে সরেস মাল। বাবুবাড়ির মেয়েদের জন্যে রাখা। দেখছ কী জিনিস! কী চেবন মিহি সুতো। জেল্লাখানা দেখ। ম্লান রোদে একটা ব্লাউস তুলে ধরে সে। প্রজাপতি যেন ফটফট করে হাতে-ধরা। প্রচণ্ড আশায় ফুলে ওঠে নবীন।

সূর্যমুখীও তাকিয়ে থাকে। একবার ছোঁয়। তারপর ফের বোঁচকার বিশৃঙ্খল রঙের বাগানে ঢুকে পড়ে। ছোট্ট কপালে লালচে রোদ সুখে খেলা করতে থাকে। কাচপোকার কালো টিপ ঝলমল করে।

নবীন আফশোসে বলে, এতেও মন ভরল না? সূর্যমুখী. তোমার চোখ নেই, তুমি কানা।···এবং নবীনের মনে রাগ ফুঁসে ওঠে। ছোটলোকের মেয়ে! তুই কী বুঝবি এর মর্ম মাগী। তোকে ফুল শোঁকানোও যা, গু-গোবর শোঁকালেও তাই। তোর কাছে সব সমান।

সূর্যমুখী সব ওলট-পালট করে দিচ্ছে। কখনো কোনো একটা ব্লাউস তুলে বুকের ওপর ধরে রাখছে। ফেলে দিচ্ছে অবহেলায়। তার চোখে তীব্র অনুসন্ধান টলটল করছে, দেখতে পায় নবীন। ফের একটা তুলে বুকের ওপর মেলে ধরলে নবীন তার দু-কাঁধের ওপর আঙুল চেপে বলে ওঠে, আহা! টানটান করে ধরো। তবেই তো সাইজ বোঝা যাবে।

ইচ্ছে করেই ব্লাউসটা ফেলে দেয় সূর্যমুখী। ঝাঁঝে বলে, খুব হয়েছে!··· তারপর দেখে নবীন তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুনি চকিতে বুকের কাপড় ঠিকঠাক করে সে তেড়ে ওঠে, এই কাপুড়ে! কী দেখা হচ্ছে, শুনি?

সাইজ। তোমার চৌত্রিশ লাগবে।···নবীন অপ্রস্তুত হাসে।

কিন্তু সেই জামাটা কই? সেদিন যেটা দেখেছিলাম?

এতগুলোর কোনটাতেও মন উঠল না?

নাঃ।

আবার বলো তো, কী রঙ ? হাতকাটা ?

হাতকাটা জবাফুলের মতো দগদগে রঙ।

এইটে ?

নাঃ।

এইটে।

না, না।

নিশ্চয় এইটে।

না, না, না।

নবীন কাপুড়ের হাতে রক্তলাল হাতকাটা চৌত্রিশ ব্লাউস এক প্রচণ্ড সোনালী ঝড়ের দাপটে থরথর করে কাঁপে। দু'চোখে করুণ কামনা টলটল করে। রক্ত-মাংসে ছটফট করে সে। একটু ঝুঁকে আসে। ফিসফিস করে বলে, নাও। দাম নেবে না নবীন। তুমি নাও। এটাই নাও।

মুখ নামিয়ে নাকছাবি খোঁটে সূর্যমুখী। মাথাটা সামান্য দোলায়। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ক্যানে ? এমনি এমনি দেবে ক্যানে ?

ক্যানে ?···নবীন জবাব খুঁজে পায় না। তার মুঠো শক্ত হয়ে যায়। জামা-গুলো ঘামে ভেজে। এই বিরাট পৃথিবীতে নবীন কাপুড়ের জীবনটা কী ব্যর্থ, আজও তার নারীসঙ্গ হয়নি, সে স্বভাবত ভীতু, দুর্বলচেতা, নির্বান্ধব আর কৃপণ মানুষ। গ্রামের একপ্রান্তে একা থাকে সে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সবাই জানে, ভীষণ বদমেজাজী আর হাড়ে হাড়ে কৃপণতা আছে নবীনের। সামান্য পুঁজি নিয়ে গাঁওয়ালে কাপড় বেচে বেড়ানো পেশা যার, তাকে কোনো বাপ মেয়ে দিতে চায়নি। সব বাপই বলেছে, ওর পাল্লায় পড়লে মেয়ে আমার না খেয়ে মরবে। প্রাণে ধরে দু-মুঠো খেতে-পরতে দেবার লোক নাকি ও ? দ্যাখো না, ঘরের চাল ফুটো—বর্ষায় জল পড়ে মেঝেয়। তাও পয়সা খরচের ভয়ে সারাতে চায় না ব্যাটা। উঠোনে আগাছার বন। সবখানে মাকড়সার ঝুল, চামচিকের নাদি, টিকটিকি ডিম পাড়ে। তবু কি হুঁশ আছে লোকটার ? শুধু পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনলেই না সংসারে। কখন দাঁতকপাটি খেয়ে পড়ে থাকবি ঘরে, তখন দেখবি—পয়সা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিস নাকি !

এত বেরসিক বদমেজাজী নবীন কাপুড়ে গাঁওয়ালে গিয়ে কিন্তু অন্যরকম। তার বুলি শুনলে অবাক লাগে। কিন্তু সেও তো চালাকি তার। পয়সার জন্যে ওটুকু না করলেই নয়। বোঁচকা বেঁধে ফেরার পথে মুখখানা দেখলেই চমকে

উঠতে হয়। এ মানুষ কি সেই মানুষ? এই তিরিক্ষি ভুরু বাঁকানো নিস্পৃহ মুখই আসল মুখ নবীনের।

আজ হঠাৎ এতদিন পরে ধুলোউড়ির মাঠে একটা বিকেল সেই নবীন কাপুড়েকে গুরুতরভাবে বদলে দিয়েছে। পিছনে আচমকা ধুপধুপ শব্দ শুনে মুখ ফেরামাত্র সে শুনছে—ও কাপুড়ে দাঁড়াও দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আর মুহূর্তে নবীন বদলে গেছে। ধুলোউড়ির বিশাল নির্জন মাঠ, পড়ন্ত বিকেল, এই ঢলঢলে ডাগর মেয়ে।···

আবার নবীন হাঁসফাঁস করে বলে, ক্যানে? সূর্যমুখী, তা কি কষ্ট করে বলতে পারি? পারি না। আমার মন বললে, সূর্যমুখী বলে যাকে ডেকেছি—তাকে বিনি দামেই দিই। তোমার দিব্যি তোমাকে বিনি দামে দিলেই যেন সার্থক হই। হ্যাঁ, মন বললে এ কথা।

পা-দুটো শুকনো ঘাসে একটু দুলিয়ে এবার হঠাৎ ফিক করে হেসে ওঠে সূর্যমুখী।···দেবে যদি, সেইটে দাও। আমার পছন্দ সেটা।

ভাঙা গলায় নবীন বলে, সেটা—সেটা হয়তো নাই। সেটা যে নাই!

তা হলে আর কী? ওঠ, বেলা পড়ে এল।···বলে সে উঠে দাঁড়ায়। দু-হাত মাথার ওপর তুলে একবার আড় ভেঙে নেয় দেহের। আবার বলে, কই ওঠ কাপুড়ে!

নবীন ব্যস্ত চোখে মাঠের চারদিকটা দেখে নেয়। এ কী হতে লাগল—হঠকারী প্রাকৃতিক উপদ্রব। শান্ত নিঃসাড় তার ভীতু যৌবন বিকেলের ধুলোউড়ির মাঠের মতো চুপচাপ শুয়ে ছিল এতদিন। ফেটেফুটে একটা উগ্র দুপুর বেরিয়ে এল। ঝাঁঝাল লু হাওয়া বইতে লাগল। সোনালী ধুলোর ঘূর্ণি এল একটার পর একটা—মাথায় তাদের খড়কুটো, শুকনো পাতা, পাখির পালক আর সাপের খোলসের রহস্যময় 'মটুক'। জরজর নবীন কাপুড়ে আবার তাকাল মেয়েটির দিকে। ও ঠোঁট কামড়াচ্ছে। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। নাকছাবিটা জ্বলছে। সিঁদুরটা ভয়ঙ্কর ধু ধু ধোঁয়াচ্ছে। আর বুকে এক সোনালী ঝড়ের ঝাপটানি লেগে সুখ-বৃক্ষের দুটি স্বাদু ফল দুলছে, দুলছে। আর দেহে ওর নাগিনীছন্দ। ধুলোউড়ির মাঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে চৈত্র বিকেলের মরমী হাওয়া।

নবীন ওঠে। পায়ের নিচে রঙের বাজারে আজ চড়া নীলামের ওলট-পালট। নবীন একবার জামা তুলে পেট চুলকোয়। একটা ব্লাউজ ভুল গাঁয়ে চলে গেছে

—কোন গাঁয়ে কোন অন্যমনস্ক দুপুরবেলায়। সেই ব্লাউসটার জন্যে আক্ষেপে গলায় বোবা ধবে। হায়, অজানতে বিকিয়ে গেছে তার জীবন যৌবনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদ! যদি জানতো নবীন তা হলে ধুলোউড়ির মাঠের এই বিকেলের জন্যে মজুত রেখে দিত। নবীন কাপুড়ে গলা ঝেড়ে বলে, সেইটে থাকলে নিতে?

নিতাম বইকি।

বিনি দামেই নিতে?

নিতাম। তুমি দিতে চাইছ বড়ো মুখ করে, আর আমি নেব না? অত ছোট মন নই, কাপুড়ে।

নবীনের চোখ জলে। নাক মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোয়।···সেটার বদলে যদি এইগুলো—যা আছে, সব—সব দিই?···চাপা ফিসফিস আওয়াজ আসে তার গলা থেকে।···নেবে, নেবে সূর্যমুখী?

না!···ভুরু কুঁচকে সাঁৎ করে ফণা তোলে ধুলোউড়ি মাঠের মোহিনী সাপ। হু হু করে ধুলোর ঘূর্ণি চলে যায় গায়ের ওপর দিয়ে। খোঁপা খসে পড়ে। রুক্ষ চুল ওড়ে। শাড়ি সরে লাল শায়ার দেয়াল দেখা যায়। তারপর সে নবীনের নীলামের বাজার এবং নবীনকে রেখে হনহন করে এগিয়ে যায়।

নবীন ভারি গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চলে যাওয়া দেখে। তারপর দুর্বল কাঁপা হাতে বোঁচকাটা গুছিয়ে নেয়। এত ওজন বেড়ে গেছে বোঝাটার! পিঠে ফেলাতে কষ্ট হয়। তখন সে উঁচু আল থেকে ক্ষেতে নামে। অনেক কষ্টে বগলের ফাঁক গলিয়ে পিঠে নেয়। হাঁচড়-পাঁচড় করে আহত জন্তুর মতো হাঁফাতে হাঁফাতে আলপথে উঠে দাঁড়ায়। পা বাড়ায় নবীন কাপুড়ে।

সেই সময় হঠাৎ কোত্থেকে অবেলায় নিম ফুলের গন্ধ ভেসে এল।

সে নাক উঁচু করে শোঁকে। ধুলোউড়ির মাঠে গাছ নেই পালা নেই, কোত্থেকে এল এই উপদ্রব? এ কি মিথ্যে নিম ফুলের গন্ধ—নাকি সত্যিকার নিম ফুলের গন্ধ? তার গা শিউরে ওঠে। অপার নিরালায় চিকন মিহি রোদ। চৈত্রের হাওয়া বয়ে যায়। ধুলো ওড়ে মৃদু মৃদু। দূরে ধূসর হয়ে যায় সূর্যমুখী। সেই কি রেখে গেল এই গন্ধটা?

ক্লান্ত বিষণ্ণ নবীন কাপুড়ে আবার নাক উঁচু করে অসম্ভব নিম ফুলের গন্ধটা হাতড়াতে হাতড়াতে ধুলোর মাঠ পেরোতে থাকে।

…'ধুলোউড়ির মাঠে রে ভাই রোদ ঝিলমিল করে।
নিম ফুলের গন্ধে আমার মন চনমন করে॥'
…'আর যাব না আর যাব না ধুলোউড়ির মাঠে।
কানের সোনা হারিয়ে এলাম মুখদেখাব কাকে॥'

আবার বয়ে যায় অন্যমনস্ক হাওয়া। আবার খড়কুটো পাখির পালক শুকনো পাতা আর সাপের খোলসের 'মটুক'-পরা ঘূর্ণি আসে ছুটে। ধুলোমাখা ছেঁড়া জুটো স্যাণ্ডেলের বিষণ্ণ শব্দ ওঠে দিনশেষে।

মৃত্যুর ঘোড়া

আমার বয়স যখন ন'বছর, একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখি ঘরের দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে—মুখটি লাল আর ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ভিজে। মা অনবরত ফোঁসফোঁস করে হলুদের ছোপ লাগা আঁচলে নাক মুছছে। বারান্দায়—দরজার পাশেই মোড়ায় বসে আছে একটা লোক। লোকটার পরনে ডোবাকাটা লুঙ্গি, গায়ে ভীষণ ময়লা সাদা হাফশার্ট গোছের, যেটার কাঁধের দিকে কোনো কলার নেই। তার পায়ে কোনো জুতো ছিল না। থ্যাবড়া হলদে আর বাঁকাচোরা পায়ের আঙুলগুলো। ফাটা হাজাধরা বিচ্ছিরি পা-দুটো দেখেই আমার সামান্য অভিজ্ঞতা বলে দিল, এই লোকটা নির্ঘাত মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে জলকাদায় দিনের পর দিন হেঁটেছে। আঙুলে আঙুলে আঁকড়ানো হাত দুটোও তেমনি বিচ্ছিরি হলদে, ভীষণ পুরু আর খসখসে। প্রচণ্ড বাধা পার হতে হতে যে জিনিসটিকে এগোতে হয়—সম্ভবত সেই জিনিসটিকে চালিয়ে বা ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে তার হাত দুটোর এ দশা হয়ে থাকবে। কারণ, ওই বয়স থেকেই একরকমের ক্ষমতা আমার ছিল, যা দিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে পারতাম, বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারতাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার এ চেষ্টা সত্যের কাছে পৌঁছে দিত আমায়। এই যে লোকটির হাত-পা দেখছিলাম, তার সঙ্গে সহজেই ইতিহাসের ভোলানাথবাবুর হাত-পায়ের তুলনা করা গেছে। চকের হালকা রঙলাগা আঙুল, বেশ লম্বা আর হালকা, ডিমের মতো সাদা চেটো—তাতে শিরাগুলো অর্থাৎ কররেখা খুবই স্পষ্ট আর গোলাপী—বিশেষ করে ওঁর হাতের চাপ সময়ে আমায় অনুভব করতেও হয়েছে—যাতে টের পেয়েছি খুবই নরম। ওঁর হাত দুটো এবং সময়ে পা-দুটো টেবিলে তুলে দিলেও একই রকম ধারণা করা গেছে। তাছাড়া লাস্ট পিরিয়ডে সেদিন ইতিহাসের ক্লাস ছিল।

বাদামী কোঁচকানো শিরাবহুল দেহ নিয়ে যে লোকটি মোড়ায় বসে রয়েছে, তার চিবুক-গাল সাদাকালো দাড়িতে ভরা, কেবল গোঁফটা যত্ন করে কামানো। তার মাথায় জালের মতো ঝাঁঝরা গোল—কতকটা ওল্টানো বাটির সাইজ, একটা

কালো টুপি। পরে ওর সঙ্গে যখন যেতে হচ্ছিল, জেনে নিয়েছিলাম, ওই টুপিটা তালগাছের বাগড়ার নীচে যে জালের মতো জটিল শক্ত শিরাগুলো থাকে, তাই দিয়ে সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। লোকটির আশ্চর্য ক্ষমতায় আমার তাক লেগে গিয়েছিল। যেতে যেতে তারপর আরো যা সব শোনাচ্ছিল, চারপাশের পাড়াগেঁয়ে সেই পৃথিবীর খুঁটিনাটি জিনিসে কত সব রহস্য, কি মজার ব্যাপার রয়ে গেছে—আমি তো ওকে মনে মনে আমার মাস্টারমশায়দের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক মহৎ, অনেক শক্তিমান বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম, প্রতিটি পদক্ষেপে লোকটি জানিয়ে দিচ্ছিল যে, পৃথিবীতে মোটামুটি দু' জাতেরই মানুষ আছে—এক জাতের মানুষ সে নিজে এবং অন্য জাতের মানুষ হচ্ছেন ইতিহাসের ভোলানাথবাবু। আমি কোন জাতের, তা জানতে চাইলে নির্ঘাত সে জবাব দিত, তুমি এখনও খুব ছোট তো—তাই তোমায় মানুষ বলা ঠিক হবে না।

খুব গোলমাল করে ফেললাম কি? আগে অনেকগুলো দিন ভাবতে হয়েছে, ঠিকঠাক পূর্বপরম্পরা গোছানোর চেষ্টা করতে হয়েছে; কিন্তু লিখতে গিয়েই সব আমার বড়ো মুশকিল, এই গল্পটা লিখবার পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও সরলতা আমি হারিয়ে ফেলতে বসেছি।

এর কারণ কিন্তু একটাই। স্মৃতি ভীষণ দুশমন। স্মৃতি বড়ো ঈর্ষাকাতর। স্মৃতি কলহপ্রিয়। বদমেজাজী খিটখিটে কটুভাষী। তাকে আমি বলব একটা রোগা হাড্ডিসার রোঁয়া-ওঠা নেড়িকুত্তা—যে আমার কত কিছু নিয়ে আগলে বসে আছে, ঈশপের গল্পের দি ডগ ইন দি ম্যানগার—নিজেও খাবে না, আমায়ও খেতে দেবে না।

বারান্দায় উঠতে গিয়ে সেদিন আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। সচরাচর এই গড়নের বা চেহারার কোনো লোককে এত খাতির পেতে দেখিনি। ওকে দস্তুরমতো একটা মোড়া দেওয়া হয়েছে! একটু খুলে বলতে হয়। আমার দাদু মুসলিম সমাজের এক ধর্মগুরু। ইসলামধর্মে যদিও বা জাতিবর্ণভেদ নেই, সব মুসলমানই মানুষ হিসেবে সমান, বাদশাহের পাশের আসনে পথের ভিখিরিও বসার অধিকার পায়—অনুশাসনের সঙ্গে প্রথার কিন্তু ফারাক আছে অসামান্য। কালগুণে সব ধর্মের মতো ইসলামের একদা হাজার বছর পরে প্রথাকে খুব বড়ো করে দেখা হচ্ছিল। ফলে অভিজাত নিম্নজাত মানুষরা চিহ্নিত হতে থাকল পৃথক পৃথক চিহ্নে। আমাদের বংশধারা অভিজাত। যার দরুন আমায়ও পাড়াগেঁয়ে সমাজে লোকেরা খুব সম্মান দেখাতো। বিশেষত আমার দাদু ধর্মগুরু মৌলানা। আর ব্যাখ্যার

দরকার হবে কি ? তা হলে তো গল্পটা আর লেখা হয়ে ওঠে না !

…অথচ আমরা ছিলাম, সত্যি বলতে কী, ভীষণ গরীব পরিবার। যতদূর জানতাম, এই গরীব থাকার প্রকৃত কারণ আমার দাদুর আচরণ। কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি তাঁর ছিল। কিন্তু একে যাযাবর চরিত্র (দাদু বলতেন, আমরা এসেছি পারস্যের খোরাসান থেকে), তায় ভীষণ অমিতব্যয়ী এবং আবেগপ্রবণ। তাঁর বাবা উত্তর বাংলায় এক শিষ্যবাড়ি থেকে মারা যান। দাদুর বয়স তখন পনেরো। ফলে, নিজের বউ নিজেই খুঁজে নিয়েছিলেন তিনি। এই বন্ধ্যা মেয়েটি কী কারণে আত্মহত্যা করেছিল। দাদু তারপর হয়ে উঠলেন আরব্য উপন্যাসের সেই বাদশাহ শাহরিয়ারের মতো—যে রাতের পর রাত বিয়ে করে আর প্রতি প্রত্যূষে তাকে হত্যা করে ফেলে—নারীজাতির প্রতি ক্রোধপরবশ হয়ে। না, অতটা সম্ভব ছিল না দাদুর পক্ষে। কারণ, তিনি বাদশাহ নন এবং সেটা ছিল ইংরেজ রাজত্ব। মুসলিম ধর্মমতে একই সঙ্গে চারটে বউ রাখা যায়। দাদু চারটে হিসেবে দুবার, দুটো একবার এবং পরিশেষে মাত্র একজনকেই বিয়ে করেছিলেন। এই শেষ বউটি ছাড়া সকলেই বিদ্‌ঘুটে রোগে মারা গিয়েছিল। সেকালে সামান্য জ্বরজারিরই ওষুধ ছিল না ভালো, অতি সহজে মানুষ গরম গায়ে শুয়ে পড়তো আর ঠাণ্ডা বসে যেত। আমার ঠাকমা দাদুর শেষ বউ। খুব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার মতো ক্ষমতা ছেলেবেলায় না থাকলে আমি তো জানতেই পারতাম না যে, আমার এই ঠাকমাটি এক নিম্নবংশীয় হিন্দুর মেয়ে—যাকে যুবতী বয়সেই ডাইনী বলে গাঁয়ের লোকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। লোকের অপরাধ আমি খুঁজি না। সে যুগে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগ যত বেশীই থাক না কেন, তারা প্রকৃতিকে ভীষণ অমঙ্গুলে আর রহস্যময় বলে মনে করতো। এখন, এই মেয়েটির সঙ্গে নাকি প্রকৃতির যোগাযোগ ছিল একটু ভিন্ন রকমের। সে সাধারণত রাত্রিচারিণী ছিল—গভীর রাত্রে বনেবাদাড়ে তাকে চুপি চুপি হাঁটতে, গাছপালা-পাখি-জন্তু-জানোয়ার পোকামাকড়ের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লক্ষ্য করা গেছে ; কেউ দেখেছে সে মাথায় বাতি নিয়ে অন্ধকারে ফাঁকা মাঠে পিছু হেঁটে অর্থাৎ পিছোতে পিছোতে কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে ছিল বিধবা—তাদের জাতে সাঙা বা পুনর্বিবাহের প্রথা ছিল। কিন্তু সে আর পুরুষ যাচেনি। একটা গাইগোরু, দুটো ছাগল, কয়েকটা হাঁসমুরগি (মুরগিও সে-জাতের মানুষ পুষতো) আর উঠানের সবজির মাচা কি দু-চারটে ফলমাকড়ের গাছ নিয়ে ছিল তার সংসার। হ্যাঁ, একটা ডাহুক পাখির বাচ্চা একবার বাঁশবনে কুড়িয়ে পেয়েছিল সে। বড়ো মায়ায়

ডাকে পুষেছিল। পাশের গাঁয়ের হাট থেকে খাঁচা কিনে এনেছিল। ডাহুকটা বেশ বড়ো হলো একদিন। গভীর রাতে নিশ্চয় সে ডাকতো—কুব্…কুব্…কুব্…কুব্!…উফ্, ঠাকমার পাশে শুয়ে এইসব গল্প শুনতে শুনতে আমি সব স্পষ্ট দেখতে পেতাম, শুনতে পেতাম এবং কেন কে জানে, কুব্… কুব্…কুব্…কুব্ ডাকটা অনুমান করলেই মনে হতো, কে-যেন নিযুতি রাতে আচমকা এসে আমার বুকের ভিতর আঙুল গলিয়ে কলজেয় খোঁচা দিচ্ছে এবং…না না! যন্ত্রণা নয়, ভীষণ কাতুকুতু পেয়ে হিহি করে বেদম হাসছি। ঠাকুমা বলতেন, তুই হাসছিস খোকা, কেন রে?…এখন বুঝি সে ছিল ঠাকমার দুঃখের গল্প। কারণ, আমার হাসি দেখে ঠাকমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলতেন, ঘুমো। রাত হয়েছে।

তারপর কী যেন ঘটেছিল। সেই গাঁয়ের কোনো বড়োবাবু না ছোটবাবুর ছেলের রঙ ছিল দুধের মতো সাদা। একটা লাউ বেচতে গিয়ে রহস্যময়ী যুবতীটি আর লোভ সংবরণ করতে পারেনি। উঠোনে ধুলোয় খেলতে বসা খোকাটিকে কোলে তুলে বলেছিল, আহা হা, মানিক সোনা, তোর দিকে কারুর মন নেই রে! তুই কি ধুলোয় খেলবার ধন? তুই থাকবি কি-না বাবুমশায়ের খাটপালঙ্কের শোভা…সন্ধ্যার দিকে সাদা খোকাবাবুটি হঠাৎ নীল হয়ে জুড়িয়ে যেতেই ওদের মনে পড়ল কুসুমের কথা! বাংলা দেশের সেই সময়টা অজপাড়াগাঁয় যা জঘন্য না ছিল! ভাগ্যিস দাদু সেদিন সেখ মুসলমানপাড়ায় শিষ্যবাড়ি আস্তানা গড়েছেন। আহত যুবতীটিকে উদ্ধার করবার জন্যে ছোটখাটো রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ঘটে গিয়েছিল। মামলা হলো দাদুকে মূল আসামী করে—শুধু দাঙ্গার দরুন নয়, এক হিন্দু যুবতীর প্রতি লাম্পট্যের দরুনও বটে এবং আশ্চর্য, একটু ভুল নিশ্চয় করা হয়েছিল বাদীপক্ষে—যুবতীটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলে দিল…উফ্, হাসতে হাসতে পেটে খিলে ধরে যায়—যুবতীটি বলল কি জানেন? বলল, ধর্মাবতার—মৌলানা আমার ইচ্ছানুসারে আমায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন এবং সাদি করেছেন…আদালতসুদ্ধ তো বটেই, আমার দাদুর চক্ষু নিশ্চয়ই ছানাবড়া হয়ে থাকবে!

এখন বুঝি, এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না ঠাকমার। তারপর আর কী! নতুন বউ সঙ্গে নিয়ে সদলবলে জাঁকিয়ে বাড়ি ফিরলেন দাদু। কুসুম হলো কুলসুম। শূন্য ঘর ভরে উঠল এতদিনে। ঘাসের উঠোনে পড়ল রাঙামাটির লেপন। চাঁপাগাছে চাঁপা ফুটল। শিউলি গাছে শিউলি।

কথায় বলে, হিন্দুদের বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি। দুটো যেখানে এক হয়,

সেখানের ব্যাপারটা কল্পনা করুন। দাদুর নোংরা বাড়িটা রাতারাতি সুন্দর হয়ে উঠল। উঠোনে ফুল-ফলের গাছ, ঝকঝকে রাঙামাটির লেপন সবখানে। যেখানে খুশি গা গড়ানো যায়। সূচ পড়লেও চোখ এড়ায় না। ঝকঝকে বাসনকোসন, ছিমছাম রান্না, রাতে শুয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঘুমনো যায়। তবে রান্নার ব্যাপারে—হ্যাঁ, ঠাকমার ট্রেনিঙের দরকার ছিল। মাসখানেক থেকে গেলেন দাদুর বোন। ননদ যত্ন করে শেখালেন পোলাও-কোর্মা-কালিয়া-কোপ্তা-কাবাব তৈরি, কারণ দাদুর ভোজনবিলাসের কোনো মাত্রা ছিল না, তা ছাড়া শেখালেন আরবী ফারসী কেতাব পড়তে, শেখালেন কোরান পাঠ এবং নমাজ ইত্যাদি অবশ্য-পালনীয় ধর্মাচরণ, বোঝালেন হাদিস অর্থাৎ অনুশাসনের সূত্রাবলী। আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ঠাকমার! কিছুদিন পরেই, যখন দাদু ঘরে নেই, আকস্মিক জরুরি কোনো ব্যাপারে মামলা অর্থাৎ অনুশাসনের বিধিটা কী জানবার জন্যে লোকে বিবিসায়েবার কাছে মতামত নিতে আসে!

আর একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে। দাদুর বয়স তখন বাহান্ন কি পঞ্চান্ন, ঠাকমার বয়স বড়োজোর তেইশ কি পঁচিশ—এই দাম্পত্য প্রেমের রহস্য কী? আমি জানি না, বুঝি না। তাঁরা কি অসুখী ছিলেন পরস্পর? বলা দুঃসাধ্য। ওই ন' বছর বয়স অবধি যতটা স্মৃতির থাকার ফাঁকে ঠাহর করি, কোনোদিন কোনো দাম্পত্য কলহের প্রসঙ্গ তাতে দেখি না। খুবই বিনীত নম্র আচরণ ছিল তাঁর। শিষ্যবাড়ি সফর শেষে দাদু ফিরলে ঠাকমা যেভাবে সবার সামনে তাঁর পা-দুটোয় চুমু (অর্থাৎ কদমবুসি) খেতেন—তাতে মনে হতো, উনি আগের হিন্দু জীবনের ভাষায় বলতে চান, তুমিই আমার দেবতা।

ঠাকমা মরে যাবার পর দাদু একরকম বাড়ি আসা ছেড়েই দিয়েছিলেন। পুরো একটি বছর আর তাঁর দেখা নাই! তবে মাঝে মাঝে তাঁর মুরীদ অর্থাৎ শিষ্যবাড়ি থেকে লোক আসতো এক কলসী গুড় কিংবা কয়েক সের ছোলা-মুসুরি কি দুটো নারকোল নিয়ে। মা দাদুর ওপর খাপ্পা ছিল—কারণ, দাদুর কোনো আয়ই আমরা আর পাইনে। বাবা দাদুর মতো মৌলানা না হয়ে নিজের চেষ্টায় স্কুলে পড়েছিলেন। এনট্রান্স পাস করে তিনি বিদেশে চাকরি করেন। মাসে মাসে যে টাকা আসে তা দিয়ে আমাদের কোনোরকমে চলে যায়।

সেই এক বছরে অনেকবার দাদু আমায় দেখতে চেয়েছেন—মা পাঠাতে রাজী হননি। আমার খুব ইচ্ছে করতো যেতে। বিশেষ করে দাদু চলে যাবার

পর মাঝে মাঝে পোলাও কোর্মা খাবার চমৎকার সময়গুলো আর আসছিল না। দাদুর ঘরের ছাদ থেকে টাঙানো শিকগুলোতে শূন্য এনামেলের হাঁড়ি লক্ষ্য করে রাগে ক্ষোভে ঢিল ছুঁড়তাম। একসময় হাঁড়িগুলো কোনো-না-কোনো সুখাদ্যে পূর্ণ থেকেছে। দাদু ভীষণ ভোজনবিলাসী ছিলেন কি না!

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে লোকটাকে দেখে আমার খুব খুশী হওয়া উচিত ছিল—কেন না, এতে নিশ্চয় কোনো গুড় নারকোল কিংবা সুন্দর উপহার আশা করব। কিন্তু খুশী হওয়াকে চেপে ধরেছিল বিস্ময়। লোকটি মোড়ায় বসার উপযুক্ত নয়—এবং মা কাঁদছে দরজার আড়ালে! কী ঘটেছে?

আমি এগিয়ে যেতেই মা আমায় দু-হাতে বুকে ধরল। তারপর চাপা স্বরে বলল, খোকা, তোমার দাদু মারা গেছেন।

মারা গেছেন! সত্যি বলতে কী মারা যাওয়া সম্পর্কে তখন এক অদ্ভুত ধারণা আমি পোষণ করি। আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল, যেহেতু আমরা মৌলানা এবং কুলগুরুদের ঘর—আমাদের কারুরই মারা যাওয়ার উপায় নেই। তার মানে আমরা—আমি বাবা দাদু মা ও ঠাকমা ছাড়া দুনিয়ার সবাই তো শিষ্য বা মুরীদ মানুষ। ওরা সাধারণ. আমরা অসাধারণ। তা না হলে কেনই বা লোকে আমার মতো ক্ষুদে লোকটিকেও এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে! কাজেই আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব। ঠাকমাকে মরতে দেখেও এ বিশ্বাস ঘোচেনি। কারণ, ঠাকমা তো হিন্দু ছিলেন!

মায়ের কথাটা শুনে তাই আমি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলে উঠলাম, যাঃ! কে বলেছে?

মা বলল, ওই লোকটি খবর এনেছে।

অস্ফুট চেঁচিয়ে বললাম, ও মিথ্যাবাদী।

বলার সময় লোকটির দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিলাম। দেখি, সে যেন হাসবার চেষ্টা করল—মাথাটা দোলাল—তারপর আফশোসে জিভে চুকচুক শব্দ করল মাত্র।

মা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, চুপ, চুপ। বলতে নেই। খোকা, তোমার দাদু সত্যি মারা গেছেন। তোমার বাবার এদিকে কোনো খবর পাচ্ছি নে—মাসের গোড়ায় মানিঅর্ডার এসেছে—তাতে কুপনে অল্প একটুখানি চিঠি ছিল। কী হলো, কিছু বুঝতে পারছি নে—তার ওপর এই বিপদ!…

মাকে চুপ করতে দেখে আমি বললাম, ও লোকটা বসে আছে কেন? চলে যেতে বলো না!

মা আমায় টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। পরক্ষণে অবাক হয়ে দু-হাতে আমার মুখটা তুলে ধরে তাকিয়ে রইল। তুই কাঁদছিস খোকা? কাঁদিস নে। এ বড় দুঃসময় আমাদের!

হ্যাঁ, আমি দাদুর জন্যে কাঁদছিলাম না। ওই লোকটির প্রতি আমার রাগ হচ্ছিল। কারণ সেই তো খবর এনে মাকে কাঁদিয়েছে, আমায় তোলপাড় করে ফেলেছে। ওর বসে থাকা দেখে মনে হচ্ছে একটুকরো আস্ত কালকুট্টে মেঘ—ফের দড়াম করে ফেটে যাবে, তার বিদ্যুৎ ঝলকাবে, বাজ পড়বে—উত্তাল আলোড়ন ঘটে যাবে এক্ষুনি এই ছোট্ট বাড়িটাতে!

এবার লোকটা আমার উদ্দেশ্যে মুখ খুলল।···আপনার দাদুসায়েব মরার সময় আপনাকে দেখতে চেয়েছিলেন। আর তেনার ইচ্ছে ছিল, যেন আপনি তেনার কবরে এই ভিটের চাট্টি মাটি দিয়ে আসেন।

ন' বছরের ছেলে আমি। আমায় 'আপনি' বলাটায় অবাক হবার ছিল না। পাড়ার বেশির ভাগ মানুষই আমায়, আপনি বলত। কিন্তু এই লোকটির কথা-গুলো শুনে আমি অবাক হলাম। মায়ের কাছ থেকে সরে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, দাদুর ইচ্ছে!

জী হাঁ। লোকটি সসম্ভ্রমে মুখটা নামাল। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুরসাহেব ইচ্ছের কথাটা আজ ভোরবেলায় জানিয়েছিলেন। তখনই আসা উচিত ছিল। কিন্তু খোদার ইচ্ছে! বড়ো আফশোস—আমার জমির জরুরি কাজ ছিল। ভাবলাম ক্ষেত থেকে ফিরে তারপর বেরিয়ে পড়ব। আপনাকে নিয়ে যাব। তা খোদার ইচ্ছেয়—যখন আমার ক্ষেতের কাজ আধাআধি হয়েছে খবর গেল উনি মারা গেছেন। আমার গোনাহ্ হয়ে গেল, কী করব!

লোকটা কপালে করাঘাত করতে থাকল।

তাহলে আমায় এক্ষুনি ওর সঙ্গে যেতে হবে—সঙ্গে কিছু মাটি নিয়ে। দাদুর কবরে দিতে হবে। তা না হলে নাকি দাদুর আত্মা শান্তি পাবে না! মা সারা গায়ে ভালোমতো কাপড় জড়িয়ে লোকটার পাশ দিয়ে বেরলো। উঠোনের ওপাশে রান্নাঘর। তার লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘরে দাদু থাকতেন। একটা কাটারি দিয়ে খানিক মেঝের মাটি তুলে আঁচলে রাখল মা। তারপর বলল, খোকা—তাক থেকে ওই প্যাঁটরাটা নামা।

প্যাঁটরায় ঠাকমার কিছু কাপড়-চোপড় ছিল। একটা পরিষ্কার সুন্দর রেশমী শাড়ী—ঠাকমা বলতেন, ওর নাম ময়ুরকণ্ঠী শাড়ী, ওঁর বিয়ের উপহার—আমার

চোখের সামনে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলল মা। বিস্ময়ে ক্ষোভে বলে উঠলাম, ছিঁড়ে ফেললে! অমন সুন্দর শাড়িটা?

মা কেমন হাসল। তারপর মাটিগুলো যত্ন করে সেটায় বাঁধল। হাতে তুলে তার ওজন পরখ করলো একবার। আমি নিয়ে যেতে পারব কি না, তাই দেখছিল মা। বললাম, মাটিগুলো দাদুর কবরে দেব। কিন্তু শাড়িটা?

মা চিন্তিতমুখে বলল, ফেলে দিস ওখানে কোথাও। যা ইচ্ছে করিস।

ঠিক এতক্ষণে আমার গল্পটা শুরু হলো।

সময়টা ছিল এমনই শরৎকাল। সবুজ ধানের মাঠ পেরিয়ে ভিজে ঘাসে-ভরা স্যাঁতসেঁতে আলপথে আমার যাত্রা শুরু করলাম। আকাশটা ছিল ঘন উজ্জ্বল নীল আর বৃষ্টিধোয়া। কেবল মাঠের শেষ দিগন্তে ধূসর রঙের কুয়াশা দেখা যাচ্ছিল। বাঁ-পাশে সূর্য রেখে আমরা কোনাকুনি চলেছি। বাতাস বইছে শনশন করে। পায়ের জুতো খুলতে হচ্ছে বারবার—আলে কোথাও কোথাও কাদা জমে আছে। হাঁটুর নীচেটা ঘাসের ফুলে কুটকুট করছে। বারবার হাত বাড়িয়ে ঝাড়তে গিয়ে ধানের গোড়ায় ক্ষেতের কালো জল লক্ষ্য করছি। সেই স্বচ্ছ চমৎকার জলে অজস্র পোকা আর ক্ষুদে মাছ ছোটাছুটি করছে। কোথাও-বা শামুক শুঁড় বাড়িয়ে ঘাসের ডগা স্পর্শ করছে।

মাঝে মাঝে এইসব দেখবার জন্যে দাঁড়াতেই পিছন থেকে লোকটা তাড়া দিচ্ছিল, জলদি চলুন, জলদি। অনেকটা দূর যেতে হবে।

অত বড়ো মাঠটা ঢালু হতে হতে যেখানে পৌছলাম, সেখানে শুধু জল আর জল। ধানের ক্ষেত থেকে বেরোতেই সামনে হঠাৎ বিশাল উজ্জ্বল উত্তরঙ্গ জল—প্রচণ্ড ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। পায়ের কাছে ঢেউয়ে ফেনা আর খড়কুটো দুলছে। কলকল ছলছল আলোড়নকারী ধ্বনিপুঞ্জের কাছে নিজের কণ্ঠস্বর খুবই অসহায় আর অবশ ঠেকল। বলছিলাম, আমরা কোথায়?

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। আমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে তার বড়বড় হলুদ দাঁত খুলে হা হা করে হাসল। বলল, ডর লাগছে? পানি পেরোতে হবে না। আমরা এবার বিলের ধারে ধারে যাব।

বেনা কাশকুশের ছোটবড়ো ঝোপের পাশ দিয়ে উঁচু পগারে আমরা বিলটার সমান্তরালে কিছু দূর হেঁটে গেলাম। কাঁটা ঝোপে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি উড়ছিল। কয়েকবার হাত বাড়ালাম তাদের ধরবার জন্য। একবার শুধু সামান্য

একটুর জন্যে হাত ফসকে পালাল একটা। পরে দেখি আঙুলে গুঁড়ো গুঁড়ো রঙ লেগে রয়েছে তার ডানার। এত ভালো লাগল না! গাঙফড়িংয়ের ডানায় রোদের ঝিকিমিকিতে চোখ দুটো কতবার ধাঁধিয়ে দিল। ঘাসফড়িং উঠে গেল হাঁটুর ফাঁক দিয়ে। একটা নির্ভীক মুখে আমার বুকপকেটে বসে রইল। ইচ্ছে করেই তাকে বিরক্ত করলাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে সাপ চলে যাচ্ছিল কিলবিল করে—চমকে উঠছিলাম। আর পিছন থেকে লোকটা বলে উঠছিল—ওর বিষ নাই, পা চালান।

ততক্ষণে খুব আলগোছে আমার মাথায় নানারকম ভাবনা এসে জুটেছে। এইসব পোকামাকড় প্রজাপতি গাঙফড়িং ঘাসফড়িং সাপ আর জলের দুনিয়ায় আর কতক্ষণ আমায় হেঁটে যেতে হবে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমায়? প্রবল অবিশ্বাসে আড়চোখে পিছনে লক্ষ্য রাখছিলাম। শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম ওর থ্যাবড়া হাজাধরা হলদে পা-দুটো—বিচ্ছিরি বাঁকাচোরা মোটা কয়েকটা আঙুল! ওই পা-দুটো সারা জীবন—কতদিন ধরে এমন সব বিচ্ছিরি দুর্গম পথ হেঁটেছে এবং আমায়ও কি অমনি করতে হাঁটাতে চায় সে? আর আশ্চর্য, এই পথ এই বিচিত্র দুনিয়া সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র ভীতি নেই, বিস্ময় নেই, আশ্চর্যরকম নির্বিকার সে। চোখ দুটোয় শেষবেলার লালচে রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে—জল থেকে অসম্ভব উজ্জ্বলতা তুলে নিয়ে ওই রোদ দৃষ্টিকে দিচ্ছে ধাঁধিয়ে—অথচ সে ঠিকই পা ফেলছে, আমি টলছি। শেষে স্থির করলাম, বাঁ-পাশে জলের দিকে আর তাকাব না।

ক্রমশ পথ সামনে উঁচুতে উঠে গেল। একটু পরেই দেখি—নদী।

নদী! নদী সেই বয়সে বার তিনেক মাত্র দেখেছি। আমাদের গাঁয়ের পাশে কোনো নদী নেই। পিসির বাড়ির পাশে নদী দেখেছি। সেই নদীটাই তিনবার মাত্র। তারপর নদীর কথা ভূগোলে পড়েছি। সেই নদী পেরোতে হবে যে!

একটা জোড়াবাঁধা তালডোঙায় মাঝি আমাদের পার করে দিল। ওপারে গিয়ে পয়সা চাইলে লোকটি আমার পরিচয় দিল সবিশেষ। দাদুর মৃত্যুসংবাদ জানাল। শুনে মাঝি বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে ডোঙাটা ঠেলে দিল। খুব অবাক লাগল। আমাদের চলায় কেউ কোনো বাধা দিচ্ছে না যেন! সবাই পথ মুক্ত রাখতে সাহায্য করছে।

বেলা শেষ। আবছায়া ঘন করে তুলেছে বিস্তৃত নীলাভ কুয়াশা—ধানের ক্ষেতে, গাছপালায়, গ্রামের ওপর—সবখানে। যেন খুব যত্ন করে কুয়াশা দিয়ে

ঢেকে দেওয়া হচ্ছে দুনিয়াটাকে। কেন? খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার প্রবণতার কথা আগে বলেছি। তাই এটা ছিল আমার নিভৃত সকুণ্ঠ প্রশ্ন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারের রঙ পুরো নীলচে দেখাল। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল আমার। দৃশ্যমান বিরাট দুনিয়া থেকে হঠাৎ সরে গেছি যেন—ভীষণ একলা হয়ে পড়েছি —খুব গভীর সবকিছুর আড়ালে আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা কবরের দিকে, যে কবরের নীচে দাদুর আত্মা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, একমুঠো মাটি তাঁকে আমি দেব···আচমকা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আমার···আমার যেন মনে হলো, অবিকল মৃত্যুর স্বাদ আমি পেয়ে গেছি। মৃতদের গায়ের গন্ধ আমি টের পাচ্ছি। এমনকি, তাদের প্রতীক্ষিত নীল উজ্জ্বল চোখ দুটো আর ধূসর খড়ি খড়ি কেঠো গতরগুলোও স্পষ্ট দেখছি। ওদের মধ্যে যে আমার দাদু সে একটা ভিজে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে—ডাকছে, আয় রে খোকা, আয়!

মৃতরা তো ওইরকমই। কবরের নীচে পোকামাকড় আর প্রজাপতিদের ডিম, উইপোকারা থিকথিক করে, শেয়াল কি খরগোশ গর্ত বানিয়ে নেয়, কাঁকড়া শামুক বা সাপ শীতের শুরুতেই ঘুমোতে চলে যায় মাটির নীচে, এবং এইসবের মধ্যে দাদুরা বিচরণ করেন!···

আমার চুল খাড়া হলো। রোম কাঁটার মতো শক্ত হলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

লোকটা হাত বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুঁল আমায়। আলগোছে তুলে একেবারে কাঁধে বসিয়ে দিল। বলল, আহা হা, আমারই ভুল মিয়াসাব। ব্যস, বসেন—আমার মাথাটা ধরে বসে থাকেন। ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে হাঁটতে লাগি এবার। আহা হা···কচি ছেলে!

কে এই লোকটা! অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে দুলে দুলে যাচ্ছি আর মাঝে মাঝে ওর তালশিরের টুপিটা স্পর্শ করছি। গা শিউরে উঠছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ও হাঁটছিল—তারপর আস্তে আস্তে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাচ্ছিলাম। ও একটা সত্যিকার ঘোড়ার মতো দৌড়তে শুরু করেছে। যতদূর পথ আমরা এসেছি, সবাই আমাদের সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছে—সরে গেছে। এবার আরো দ্রুত দু-পাশে সরে যেতে থাকল—যেন জীবজগৎটা পথ পরিষ্কার করে দিল একেবারে।

তারপর অন্ধকার রাতের মাঠ কুয়াশা পথ গ্রাম পেরিয়ে—কত দূর-দুরান্তর পাড়ি দিয়ে ও এগিয়ে যাচ্ছিল একটা কবরের উদ্দেশ্যে. ক্রমে সব একাকার হয়ে

যাচ্ছিল। দৃশ্যহীন কালো দুনিয়ায় কেবল চিৎকার করছিল কিছু পেঁচা, কতিপয় শেয়াল আর হাজার লক্ষ কোটি—সংখ্যাহীন পোকামাকড়েরা। কিছুক্ষণ পরেই মাথার ওপর নক্ষত্রময় আকাশটাও ঢেকে গেল। তখন যেন একটা অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করলাম আমরা। আমি কেশর-ফোলানো ধাবমান একটা ঘোড়ার গলা জড়িয়ে সেঁটে রইলাম। এক হাতে ঠাকমার রেশমী শাড়ির টুকরোয় বাঁধা দাদুর ভিটের কিছু মাটি। স্যাঁত স্যাঁত করে সারা জীবজগৎ সসম্ভ্রমে দু-পাশে সরে সরে যেতে থাকল।

আমার গল্পের এখানেই শেষ।

তবে কি, কোনো গতিবান যানে—ধরুন ট্রেনে দীর্ঘ ভ্রমণের পর যেমন সেই গতির অনুভব গোপন প্রতিধ্বনির মতো দেহে বা মনে কিংবা দেহ-মনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জেগে থাকে, তার মনে—আপনি স্থির মাটির ওপর দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে থেকেও গতিময় সেই চলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না—আমার হয়ে গেছে সেই দশা!

অনেক সময় হয়তো বা ভুলে থাকি—মানুষের ভিড়ে বা পরিবারের মধ্যে—কিংবা কাজে ব্যস্ততায় দায়িত্ব পালনে আদর্শবোধে খাওয়া-দাওয়া সামাজিকতা কত কিছুতে। কিন্তু যখনই একলা হয়ে পড়ি, ন'বছর বয়সের এক শরৎরাত্রির সেই অভিযাত্রার শক্তিমান থ্যাবড়া পা-ওয়াল ঘোড়া কিংবা মানুষটার চলার ঝাঁকুনিতে আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমার হাড়মাংস থেঁতলে দলা পাকিয়ে যেতে থাকে। হয়তো নিছক প্রতিধ্বনি—প্রতিধ্বনির মতো প্রতিভাসিক। অথচ আমার ওই দীর্ঘস্থায়ী জ্বর দেখা দেয়। আঁতকে উঠে ভাবি, আমি কোথায় চলেছি? আরে, আরে! কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমায়—এই অন্ধকারে কুয়াশায় শিশিরে? রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, যখন হঠাৎ স্মৃতি ফিসফিসিয়ে ওঠে—তোমার যাত্রা তোমার পূর্বপুরুষের কবরাভিমুখে! আর চোখ খুলতেই দেখি, চরাচরের সব বর্ণময় উজ্জ্বলতা ক্রমান্বয়ে ঢেকে যাচ্ছে মাকড়সার জালের মতো নীল ধুসর ব্যাপক কুয়াশায়—স্যাঁত স্যাঁত করে সসম্ভ্রমে দু-পাশে সরে যাচ্ছে জীবজগৎটা, আর প্রসারমান বিশাল অন্ধকারের দেশে আমি চলে গেলাম—তারপর মাথার ওপর সকল নক্ষত্রকেও প্রায় নিঃশব্দে ঢেকে ফেলা হলো। পাছে মুঠো আলগা হয়ে যায়, যা নিয়ে চলেছি তা খুলে পড়ে, ঠাণ্ডা মুঠোটা অধিকতর শক্ত হতে থাকে। আমি প্রস্তুত হই কী এক পবিত্র দায়িত্ব পালনে।···

তা হলে বলা যায়, ওই ন' বছর বয়সেই জীবন ও মৃত্যুর পারস্পরিক সম্পর্কটা আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম।